প্রথম প্রকাশ
নাথ পাবলিশিং রজতজয়ন্তী বর্ষ
জুন ১৯৬০

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা-৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

মুদ্রক
শান্তিরাম দত্ত
মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস
৭০ ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

তিস্তা-করলার স্মৃতিতে **টুটুলকে**

আর সেই সঙ্গে **কল্যাণকেও**—

কিছু কিছু শব্দের অর্থ অভিধান দেখেও সঠিকভাবে সুস্পষ্ট হয় না। প্রেম বা ভালোবাসাকে অতি সহজেই এই পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। আসলে প্রেম এক আশ্চর্য অনুভূতি, দেহ ও মনের এক সুনিবিড় আর্তি যা ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো আচমকা সাড়া জাগিয়ে লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে কোনো সুপরিকল্পিত জীবনের সমস্ত রূপরেখা। প্রেমকে কেউ বলেছেন 'লাইফ ফোর্স', কেউ বা বলেছেন 'সুস্থ মনের সাময়িক উন্মত্ততা'। কিন্তু কোনো রকম জটিলতার মধ্যে না গিয়েও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে শুধুমাত্র প্রেমকে অবলম্বন করে যুগে যুগে দেশে দেশে যতো অপরূপ কাব্যকাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে, তার সংখ্যাধিক্য সার্থক সাহিত্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে ঈর্ষনীয়।

না, প্রেমের সংজ্ঞা নির্ণয় করা কিংবা প্রেম সম্পর্কে কোনো বিতর্কমূলক আলোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো গল্প-সঙ্কলনের মুখবন্ধ লেখা সম্ভবত নিরর্থক। তবু প্রসঙ্গটা স্পর্শ করে যাবার কারণ, এই সঙ্কলনের প্রতিটি গল্পই প্রেমের এবং হয়তো প্রতিটি কাহিনীই খানিকটা অস্বাভাবিক। আসলে প্রেমের গতি ভারি বিচিত্র—প্রেম লজ্জা-ভয়, ধর্ম-সংস্কার, নিষেধ-বিভেদ কিছুই মানে না এবং মমের লেখা অসংখ্য ছোটো গল্প বা উপন্যাসে আমরা বারবার তার অকপট প্রকাশ দেখতে পেয়েছি।

উইলিয়াম সমারসেট মমের জন্ম ১৮৭৪ সালে ফ্রান্সের পারী শহরে। শৈশবের দশটা বছর তাঁর ওই শহরেই কেটে গেছে। শিক্ষালাভ করেছেন ক্যান্টারবেরির কিংস স্কুল আর জার্মানীর হাইডেলবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপর চিকিৎসক হবার বাসনায় কিছুদিন তিনি সেন্ট টমাস হাসপাতালেও পড়াশুনো করেন। কিন্তু ১৮৯৭ সালে প্রথম উপন্যাস 'লিজা অফ ল্যামবেথ' প্রকাশিত হবার পর সাহিত্যকেই তিনি জীবনের অবলম্বন হিসেবে বেছে নেন। 'অফ হিউম্যান বন্ডেজ', 'দ্য মুন অ্যান্ড দ্য সিক্স পেন্স' এবং আরও অনেক সফল গল্প-উপন্যাসের লেখক সমারসেট সাহিত্যের প্রতিটি শাখাতেই সব্যসাচীর মতো বিচরণ করেছেন। ইউরোপ থেকে লাতিন আমেরিকা, বার্মা-মালয় থেকে তাহিতি-নিউগিনি—সর্বত্র অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে ঘুরে ঘুরে তিনি অসংখ্য মানুষ দেখেছেন। তাই প্রেম, প্রতিহিংসা, ব্যভিচার, রিরংসা, বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মত্যাগ—সবই মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর আশ্চর্য লেখনীতে। তাঁর জীবননিষ্ঠ রচনায় আমরা এমন অনেক চরিত্রের সন্ধান পাই যারা বাসনার তীব্র বিষে জর্জরিত, ব্যথায় বিধুর, হিংসায় উন্মাদ। মাঝে মাঝে এদের বিকৃত মানসিকতা আমাদের বিমূঢ় করে তোলে।

মমের গল্পে আমরা দেখতে পাই আধুনিক জন-জীবনের জটিল মানসিকতা, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের কুটিল প্রভাব, প্রাচীন মূল্যবোধকে ধ্বংস করে ফেলার

দানবীয় প্রবৃত্তি অথচ বাস্তবকে পুরোপুরি মেনে নিতে না পারার নিদারুণ দুঃখবোধ।

মমের অধিকাংশ গল্পই চরিত্র প্রধান। কোনো বিশেষ চরিত্রের কোনো বিশেষ দিককে আলোকিত করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি গল্পের আয়োজন করেন, গড়ে তোলেন প্রয়োজনীয় পরিবেশ আর আকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির। তারপর একটু একটু করে ফুটে ওঠে তীক্ষ্ন শ্লেষের সুতীব্র ঝিলিক আর তারই বিচিত্র আভায় পাঠকের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে পরিচিত মানুষের অন্য এক নতুন পরিচয়—স্বাভাবিক পরিবেশে যা সচরাচর সাধারণের চোখে ধরা পড়ে না। সংস্কারমুক্ত নির্লিপ্ত ঋষির মতো নির্বিকার মন নিয়ে সমারসেট জীবনকে দেখেছেন। তাই কোনো ভুল বা অন্যায় করলেই কোনো মানুষকে তিনি ঘৃণ্যকীট বলে বর্জন করার পক্ষপাতী নন। দোষে গুনে মানুষের জীবন—তাই মোহান্ধ, অস্বাভাবিক, অস্থির, এমন কি ডি. এইচ. লরেন্সের ভাষায় অনেক **morbid** চরিত্রকেও তিনি শাশ্বত করে রেখেছেন তাঁর স্মরণীয় সাহিত্যে। এই সঙ্কলনের গল্পগুলি নিঃসন্দেহে এই উক্তির স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস

ইচ্ছেনদী
বনপথ
আকর্ষণ
একা মেঘ

অনুবাদ

মমের শ্রেষ্ঠ গল্প
লরেন্সের সেরা প্রেমের গল্প
তৃতীয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প
মোরাভিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প
আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ গল্প
মপাসাঁর বাছাই গল্প
মপাসাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প
ও হেনরীর গল্প
ক্রীতদাস / এরিক করডার
রেবেকা / দাফন দ্য মারিয়া
ভ্যালি অফ দ্য ডল্‌স্‌ / জ্যাকলিন সুশান
আনা কারেনিনা / লেভ তলস্তয়
হিচকক নির্বাচিত / এক ডজন
স্পার্ক অফ লাইফ / এরিখ মারিয়া রেমার্ক
হেভেন হ্যাজ্‌ নো ফেভারিট্‌স / ঐ
দ্য আইল্যাণ্ড অফ ডক্টর মোরো / এইচ. জি. ওয়েলস

ক্যাপটেন ব্রেডন সদাশয় মানুষ। কুয়ালা লামপুরের যাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক অ্যাংগাস মনরো যখন তাঁকে বললেন যে তিনি তাঁর নতুন সহকারী নীল ম্যাক অ্যাডামকে সিঙ্গাপুরে পেঁছে ভ্যান ডাইক হোটেলে ওঠার পরামর্শ দিয়েছেন এবং সেখানে থাকাকালীন সামান্য দিন কটিতে ছেলেটি যাতে কোনো রকম ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে ব্রেডনকে একটু খেয়াল রাখতে বললেন, তখন ব্রেডন তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে ছেলেটির জন্যে তিনি তাঁর যথাসাধ্য করবেন। ক্যাপটেনের স্ত্রীটি জাপানী। উনি সুলতান আহমেদ নামে একটা জাহাজের ক্যাপটেন। সিঙ্গাপুরে এলে উনি সর্বদাই ভ্যান ডাইকে গিয়ে ওঠেন। ওখানে তাঁর একখানা ঘর নেওয়া থাকে, ওটাই তাঁর ঘরবাড়ি। বোর্নিয়োর উপকূল ধরে পক্ষকালের সফর থেকে ফিরে আসতেই হোটেলের ওলন্দাজ ম্যানেজারটি তাঁকে বললো, নীল দুদিন হলো হোটেলে এসে উঠেছে। হোটেলের ধূলিধূসরিত ছোট্ট বাগানে বসে ছেলেটি তখন দ্য স্ট্রেইটস টাইমসের পুরনো সংখ্যাগুলো পড়ছিলো। ক্যাপটেন ব্রেডন প্রথমে ছেলেটিকে ভালোভাবে দেখে নিলেন। তারপর এগিয়ে গিয়ে জিগেস করলেন, 'তুমিই ম্যাক অ্যাডাম, তাই না?'

নীল উঠে দাঁড়ালো। লজ্জায় লাল হয়ে জবাব দিলো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি।'

'আমার নাম ব্রেডন। আমি সুলতান আহমেদের ক্যাপটেন। আসছে মঙ্গলবার তুমি আমার সঙ্গে জাহাজে চাপছো। মনরো আমাকে তোমার দেখা-শুনো করতে বলেছেন। তা একটু স্তেগা হলে কেমন হয়? আশা করি ইতিমধ্যে তুমি শব্দটার অর্থ জেনে গেছো?'

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমি মদ খাই না।'

ছেলেটির কথায় স্কটল্যান্ডের টান প্রচণ্ড প্রকট।

'আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। মদ জিনিসটা এ দেশে বহু লোকের সর্ব-নাশের কারণ।'

চীনে পরিচারকটিকে ডেকে উনি নিজের জন্যে একটা ডাবল হুইস্কি আর একটা ছোটো সোডা আনার হুকুম দিলেন।

'এখানে এসে থেকে কি করলে?'

'ঘুরে বেড়ালাম।'

'সিঙ্গাপুরে দেখার মতো তেমন বিশেষ কিছু নেই।'

'আমি তো অনেক কিছুই দেখলাম।'

সর্বপ্রথম সে যেখানে গিয়েছিলো, সেটা অবশ্যই যাদুঘর। দেশে দেখেনি এমন জিনিস সেখানে কমই আছে। কিন্তু ওই সমস্ত পশুপাখি, সরীসৃপ, মথ,

প্রজাপতি আর পতঙ্গ একেবারে এ দেশের নিজস্ব জিনিস—এই ভাবনাটাই তাকে উত্তেজিত করে তুলেছিলো। বোর্নিয়োর যে অংশের রাজধানী কুয়ালা সোলর, তার ওপরে একটা আলাদা বিভাগ ছিলো। আগামী তিন বছর প্রধানত ওই প্রাণীগুলোই তার কাজের বিষয় হবে বলে ওগুলোকে সে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু সব চাইতে বড়ো রোমাঞ্চ ছিলো বাইরের পথঘাটে। নেহাৎ শান্ত-গম্ভীর স্বভাবের ছেলে না হলে নীল হয়তো খুশিয়াল হাসিতে মুখর হয়ে উঠতো। সমস্ত কিছুই তার কাছে নতুন। পা ব্যথা না হওয়া পর্যন্ত সে ক্রমাগত শুধু হেঁটেছে। কর্মচঞ্চল জনপথের মোড়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছে রিক্সার দীর্ঘ সারি আর রিক্সাগুলোর দুটো ডাণ্ডার মাঝখানে ছোটোখাটো মানুষ-গুলোর নাছোড়ের মতো ছুটে চলা। একটা সাঁকোর ওপরে দাঁড়িয়ে সে দেখেছে, টিনের কৌটোয় রাখা সার্ডিন মাছের মতো খালের জলে শাম্পানগুলো যেন একটার পিঠে একটা গাদাগাদি করে রয়েছে। ভিক্টোরিয়া রোডের চীনে দোকানগুলোতেও সে উঁকি মেরে দেখেছে। নানান ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস বিক্রি হয় ওই দোকানগুলোতে। নিজেদের দোকানের সামনে দাঁড়ানো বস্বের মোটাসোটা উৎসাহী ব্যবসায়ীরা তাকে জোরজার করে রেশমের জিনিস আর টিনের ঝকমকে সস্তা গয়নাগাটি গছাবার চেষ্টা করেছে। ভয় জাগানো ভঙ্গিমায় হেঁটে যাওয়া বিষণ্ণ-নিঃসঙ্গ তামিল এবং অন্যের প্রতি তাচ্ছিল্য আর নিজের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন, মাথায় সাদা টুপি আঁটা, দাড়িওয়ালা আরবদেরও সে লক্ষ্য করেছে। এই সমস্ত বিভিন্ন দৃশ্যাবলীতে সূর্য তখন তীব্র ঝলমলে দীপ্তি ছড়াচ্ছিলো। নীল বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছিলো। তার মনে হয়েছিলো, হরেক রঙা মাত্রাহীন এই নতুন দুনিয়ায় নিজেকে মানিয়ে নিতে তার বোধহয় বেশ কয়েক বছর সময় লেগে যাবে।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর ক্যাপটেন জিগেস করলেন, শহরটা সে একটু ঘুরে-ফিরে দেখতে চায় কি না। বললেন, 'এখানে থাকতে থাকতে এখানকার জীবনটা তোমার একটু দেখে নেওয়া উচিত।'

রিক্সায় চেপে ওরা চীনে পাড়ার দিকে এগিয়ে চললো। সমুদ্রে থাকার সময় ক্যাপটেন কদাচ মদ্যপান করেন না, কিন্তু আজ সারাদিনভর তিনি সেটা পুষিয়ে নিচ্ছিলেন। মেজাজটা দিব্যি শরিফ লাগছিলো তাঁর। গলির মধ্যে একটা বাড়ির সামনে গিয়ে রিক্সা থামলো। টোকা দিতেই দরজা খুলে গেলো, সরু একটা বারান্দা ধরে এগিয়ে গিয়ে ওরা একটা বিশাল ঘরে হাজির হলো। ঘরের মধ্যে লাল মখমলে মোড়া অনেকগুলো বেঞ্চি। ফরাসী, ইতালিয়, মার্কিন—বেশ কয়েকটি মেয়েছেলে বসে আছে সেখানে। একটা যান্ত্রিক পিয়ানো একটানা কর্কশ সুর উগরে চলেছে আর কয়েকটি যুগল তার সঙ্গে নাচছে। ক্যাপটেন ব্রেডন পানীয় আনার ফরমাশ দিলেন। আমন্ত্রণের প্রতীক্ষায় থাকা দু-তিনটি মহিলা ওদের দিকে আকর্ষণী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো। ক্যাপটেন সরস ভঙ্গিতে জিগেস করলেন, 'কিহে ছোকরা, এদের মধ্যে কাউকে মনে ধরছে?'

'আপনি কি শয্যা-সঙ্গিনী করার জন্যে বলছেন ? না।'

'তুমি যেখানে যাচ্ছো, সেখানে কিন্তু কোনো সাদা-চামড়ার মেয়ে নেই। বুঝলে ?'

'ঠিক আছে।'

'কিছু দেশী মাগী দেখতে যাবে নাকি ?'

'আপত্তি নেই।'

ক্যাপটেন পানীয়ের দাম মিটিয়ে দিলেন, পায়ে পায়ে এগিয়ে ওরা আর একটা বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো। এখানকার মেয়েগুলো চীনে--ছোট্টখাট্ট মুখরোচক চেহারা —ফুলের মতো ছোটোছোটো হাত পা, পরনে ফুল আঁকা রেশমী পোশাক। কিন্তু ওদের প্রসাধন চর্চিত মুখগুলো যেন মুখোশের মতো। উপহাস ভরা কালো চোখ মেলে ওরা আগন্তুকদের দিকে তাকালো। কেমন যেন অমানুষ বলে মনে হলো মেয়েগুলোকে।

'আমার মনে হচ্ছিলো, জায়গাটা তোমার দেখা উচিত—তাই তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম,' কর্তব্য করে যাওয়া মানুষের ভঙ্গিতে ক্যাপটেন বললেন। 'কিন্তু শুধু ওই দেখাটুকুই সার। যে কোনো কারণেই হোক, এরা আমাদের ঠিক পছন্দ করে না। কিছু কিছু চীনে ডেরায় ওরা সাদা-চামড়ার মানুষদের ঢুকতে পর্যন্ত দেয় না। আসলে ওরা বলে, আমাদের গায়ে নাকি দুর্গন্ধ। মজার কথা, তাই না ? বলে, আমাদের গায়ে মরা মানুষের গন্ধ !'

'আমাদের ?'

'আমাকে বাপু জাপানী মেয়েমানুষ দাও, তারা হচ্ছে উত্তম জিনিস।'

ক্যাপটেন বললো, 'তুমি তো জানো, আমার স্ত্রীও জাপানী। চলো, তোমাকে একটা জাপানী মেয়েদের ডেরায় নিয়ে যাই। সেখানে যদি মনপসন্দ কিছু না পাও তো কি বলেছি !'

ওদের জন্য অপেক্ষায় থাকা রিক্সা দুটোতে ফের উঠে বসলো দুজনে। ক্যাপটেন ব্রেডনের নির্দেশ মতো গাড়ি চলতে লাগলো। নির্দিষ্ট বাড়িটাতে গিয়ে ঢুকতেই গাট্টাগোট্টা চেহারার একটি মাঝবয়সী জাপানী স্ত্রীলোক মাথা নিচু করে ওদের অভিবাদন জানিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলো দুজনে। ঘরের মেঝেতে মাদুর বেছানো, তাছাড়া অন্য কোনো আসবাব নেই। ওরা বসতেই ছোট্ট একটি মেয়ে ট্রেতে করে দুটো বাটিতে হালকা রঙের চা নিয়ে এলো। লাজুক ভঙ্গিতে অভিবাদন জানিয়ে মেয়েটি ওদের দুজনের হাতে চায়ের বাটি তুলে দিলো। ক্যাপটেন মাঝ-বয়সী স্ত্রীলোকটিকে কি একটা বলতেই সে নীলের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো। তারপর সে বাচ্চা মেয়েটিকে কি যেন বললো। মেয়েটি বেরিয়ে গেলো এবং পরক্ষণেই চারটি মেয়ে লঘু পায়ে ঘরে এসে হাজির হলো। কিমোনো পরে ভারি মিষ্টি লাগছিলো মেয়েগুলোকে। মাথার চিকচিকে কালো চুলগুলো কায়দা করে বাঁধা। দেখতে ছোট্টখাট্ট নাদুস-নুদুস, মুখগুলো গোল আর চোখগুলো হাসিভরা। ঘরে ঢুকে

ওরা মাথা নিচু করে অভিবাদন জানালো, তারপর মার্জিত ভঙ্গিতে মৃদু কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানালো দুজনকে। ওদের কণ্ঠস্বর যেন পাখির কাকলি। দুজন করে দুই পুরুষের দুপাশে বসে ওরা মধুর রসালাপ করতে শুরু করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেলো ক্যাপটেন ব্রেডনের হাত দু পাশের দুটি ছিপছিপে কোমরকে জড়িয়ে রেখেছে। ওরা সকলেই একসঙ্গে কলকল করে কথা বলছিলো। সবাই ভীষণ খুশিয়াল। নীলের মনে হলো, ক্যাপটেনের মেয়েমানুষ দুটি তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে—কারণ ওদের দুষ্টুমিভরা ঝিলমিলে চোখগুলো তার দিকেই ফেরানো। লজ্জায় সে লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু অন্য মেয়ে দুটি তাকে নিবিড় সোহাগে জড়িয়ে রেখেছে, হাসছে, আর অনর্গল জাপানী ভাষায় কথা বলছে—যেন ওদের প্রতিটি কথাই সে বুঝতে পারছে। ওদের এতো খুশি আর ছলাকলাহীন অকপট বলে মনে হচ্ছিলো যে নীল নিজেও হেসে ফেললো। তার দিকে মেয়ে দুটির ভীষণ নজর। সে চা খাবে বলে একজন তার হাতে চায়ের পাত্রটা তুলে দিলো এবং তারপর ফের সেটা নিজের হাতে ফিরিয়ে নিলো, যাতে তাকে পাত্রটা ধরে থাকার হাঙ্গামাটুকুও নিতে না হয়। ওরা তাকে সিগারেট ধরিয়ে দিলো এবং একটি মেয়ে নিজের ছোট্ট নরম হাতখানা এগিয়ে ধরলো, যাতে সিগারেটের ছাই নীলের পোশাকে খসে না পড়ে। ওরা নীলের মসৃণ মুখখানিতে হাত বোলাচ্ছিলো, কৌতূহলভরে তাকাচ্ছিলো তার বিশাল হাত দুটির দিকে। মেয়ে-গুলো একেবারে বেড়ালছানার মতো খেলুড়ে।

'কি হে, কোনটিকে নেবে?' খানিকক্ষণ বাদে ক্যাপটেন জিগেস করলেন, 'পছন্দ করা হয়ে গেছে?'

'তার মানে?'

'তোমার মনস্থির করা অব্দি আমি অপেক্ষা করবো। তারপর নিজেরটা ঠিক করবো।'

'আমি এদের কাউকেই চাই না। এবারে আমি বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়বো।'

'কেন, কি হলো? ভয় পাওনি তো?'

'না। এসব আমার ভালো লাগে না। তবে আমাকে আপনি পথের কাঁটা বলে ভাববেন না। আমি নিজেই হোটেলে ফিরে যেতে পারবো।'

'তুমি কিছু না করলে, আমিও নেই। আমি শুধু তোমাকে সঙ্গ দিতে চাইছিলাম।'

ক্যাপটেন মাঝ-বয়সী স্ত্রীলোকটিকে কি যেন বললেন এবং তাঁর কথায় মেয়েরা চকিত-বিস্ময়ে নীলের দিকে ফিরে তাকালো। স্ত্রীলোকটির জবাব শুনে ক্যাপটেন দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললেন। একটি মেয়ে কি একটা মন্তব্য করলো, তাই শুনে সবাই খিলখিল করে হেসে উঠলো।

'মেয়েটি কি বললো?' জিগেস করলো নীল।

'তোমাকে নিয়ে রসিকতা করলো,' ক্যাপটেন মৃদু হেসে এক আশ্চর্য দৃষ্টিতে নীলের দিকে তাকালেন।

মেয়েটি একবার সবাইকে হাসিয়ে, এবারে সরাসরি নীলকে কি যেন বললো। নীল কিছু বুঝতে পারলো না, কিন্তু মেয়েটির চোখে ফুটে ওঠা বিদ্রুপের ছোঁয়ায় সে আরক্তিম হয়ে উঠলো, ভ্রু দুটো কুঁচকে উঠলো তার। তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা তার আদৌ পছন্দ নয়। কিন্তু মেয়েটি এবারে খোলাখুলিভাবে হাসলো, তারপর নীলের গলা জড়িয়ে ধরে আলতো করে একটা চুমু খেলো।

'চলো হে, যাওয়া যাক!' ক্যাপটেন বললেন।

রিক্সা ছেড়ে দিয়ে হোটেলে ঢুকতে ঢুকতে নীল জিগেস করলো, 'মেয়েটি তখন কি বললো, যাতে সবাই হাসলো?'

'বললো, তুমি এখনও মেয়েমানুষ নিয়ে শোওনি।'

'এতে হাসার কি আছে, বুঝতে পারছি না।' স্কটদের মন্থর উচ্চারণ ভঙ্গিতে বললো নীল।

'কথাটা কি সত্যি?'

'আমি তো তাই মনে করি।'

'তোমার বয়েস কতো?'

'বাইশ।'

'তাহলে আর কিসের অপেক্ষা?'

'বিয়ের।'

ক্যাপটেন চুপ করে রইলেন। সিঁড়ির মাথায় উঠে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিলেন উনি। বালকটিকে শুভরাত্রি জানাবার সময় তাঁর চোখ দুটো একটু ঝিলমিলিয়ে উঠলো। কিন্তু নীল তাঁর দিকে তাকালো সরল, অকপট আর প্রশান্ত দৃষ্টিতে।

তিনদিন বাদে ওদের জাহাজ ছাড়লো। একমাত্র নীলই সাদা-চামড়ার যাত্রী। ক্যাপটেন ব্যস্ত থাকলে সে বইপত্র পড়ে। ওয়ালেসের 'মালয় আর্কিপেলাগো' বইটা সে ফের পড়তে শুরু করেছে। ছোটো থাকতে সে একবার বইটা পড়েছিলো, কিন্তু এখন এটা তার কাছে এক নতুন এবং নিবিড় আগ্রহের বস্তু হয়ে উঠেছে। ক্যাপটেনের অবসর সময়ে তারা দুজনে মিলে তাস খেলে কিংবা ডেকের লম্বা কুর্সিতে বসে ধূমপান করতে করতে কথাবার্তা বলে। নীল এক গ্রাম্য চিকিৎসকের ছেলে। কবে জীবতত্ত্ব সম্পর্কে তার আগ্রহ ছিলো না, তা আজ আর সে মনে করতে পারে না। স্কুলের পড়াশুনো শেষ করে সে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স নিয়ে বি. এস. সি. পাস করে। তারপর সে যখন জীববিদ্যায় ডেমনস্ট্রেটরের চাকরি খুঁজছে, তখন হঠাৎ একদিন কুয়ালা সোলর যাদুঘরে সহকারী তত্ত্বাবধায়ক পদের জন্যে প্রার্থী চেয়ে নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটা তার চোখে পড়ে। যাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক অ্যাংগাস মনরো এডিনবরায় নীলের কাকার সঙ্গে পড়তেন। কাকা এখন গ্লাসগোর একজন ব্যবসায়ী। তিনি পত্র মারফৎ ছেলেটিকে একটা সুযোগ দেবার জন্যে অ্যাংগাস মনরোকে অনুরোধ জানান। বিশেষ করে পতঙ্গবিজ্ঞানেই নীলের আগ্রহ ছিল বেশি, কিন্তু মৃত জীবজন্তুর চামড়ার মধ্যে কৃত্রিম

জিনিস পুরে সেগুলোকে জীবন্তের মতো করে তোলার ব্যবহারিক বিদ্যেটাও সে শিখেছিলো। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিলো, এটা জানা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। নীলের পুরনো শিক্ষকদের প্রশংসাপত্রগুলোও কাকা তাঁর চিঠির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি এ কথাও জুড়ে দিয়েছিলেন যে নীল তার বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে ফুটবল খেলেছে। এর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তার নিয়োগের খবর নিয়ে একটা তারবার্তা এলো এবং তার পনেরো দিন বাদে নীল জাহাজে চাপলো।

'মিঃ মনরো কি রকম লোক?' জিগেস করলো নীল।

'ভালো লোক। সবাই পছন্দ করে।'

'বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকায় আমি ও'র লেখাগুলো দেখেছি। দ্য আইবিসের শেষ সংখ্যাটায় জিমনাথাইডের ওপরে ও'র একটা লেখা ছিলো।'

'আমি ওসব কিছু জানি না। আমি জানি ও'র স্ত্রী রাশিয়ান এবং 'কেউই মহিলাকে তেমন পছন্দ করে না।'

'সিঙ্গাপুরে আমি ও'র কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। লিখেছেন, যতো-দিন আমি দেখেশুনে নিজের পছন্দমতো ব্যবস্থা করতে না পারছি, ততোদিন উনি আমাকে আশ্রয় দেবেন।'

নদীপথে এগিয়ে যাচ্ছিলো ওরা। মোহনার কাছে জলের ওপরেই কাদা মাটির স্তূপে একটু একটু করে কোনোক্রমে জেলেদের একটা গ্রাম গড়ে উঠেছে। তীর ধরে জেগে উঠেছে নিপা পাম আর গরান গাছের ঘন বেষ্টনী। তার পেছনে ছড়িয়ে আছে কুমারী-অরণ্যের ঘন শ্যামলিমা। দূরে নীল আকাশের পটভূমিকায় রুক্ষ পাহাড়ের ছায়াঘন দেহরেখা। এক নিবিড় উত্তেজনা নীলকে সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেলেছিলো। তার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠেছে। দুই আগ্রহী চোখ মেলে সমস্ত দৃশ্যটা যেন গিলছিলো সে। আসলে সে অবাক হয়ে গিয়েছিলো। কনর‍্যাড তার প্রায় মুখস্ত, একটা বিষণ্ন রহস্যময় দেশ দেখবে বলে সে আশা করেছিলো। এমন শান্ত নীল আকাশের জন্যে সে প্রস্তুত ছিলো না। দিগন্তে কয়েক টুকরো ছোটোছোটো সাদা মেঘ পাল তুলে ভেসে চলা শান্ত তরীর মতো রোদে ঝিলমিল করছে। উজ্জ্বল আলোর দীপ্তিতে ঝলমল করছে অরণ্যের সবুজ গাছগাছালি। নদীর তীরে তীরে এখানে সেখানে ফলগাছের ঘন সান্নিধ্যে খড়ে-ছাওয়া কিছু কিছু মালয়ী কুটির। স্থানীয় বাসিন্দারা ডিঙিতে চেপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড় বাইছে। এই উজ্জ্বল প্রভাতে নীলের মনে বন্ধন বা বিষাদের কোনো অনুভূতি ছিলো না—তার মনে হচ্ছিলো এ এক উদার উন্মুক্ত পরিবেশ, এখানে অসীম মুক্তি। দেশটা তাকে যেন সাদরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। নীল অনুভব করলো, এখানে সে সুখে থাকবে।

জাহাজের নির্দেশ-মঞ্চ থেকে ক্যাপটেন ব্রেডন নিচে দাঁড়ানো ছেলেটির দিকে হৃদ্যতার দৃষ্টিতে তাকালেন। গত চার দিনের যাত্রাপথে ছেলেটিকে তাঁর বেশ ভাল লেগে গেছে। এ কথা সত্যি যে ছেলেটা মদ খায় না এবং কোনো রসিকতা করলে ওর পক্ষে সেটাকে গুরুত্বপূর্ণভাবে না নেবার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু ওর

সুগম্ভীর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা অদ্ভুত আন্তরিকতা রয়ে গেছে। সমস্ত কিছুই ওর কাছে আগ্রহজনক এবং গুরুত্বপূর্ণ—তাই রসিকতা শুনেও ও মজা পায় না। কিন্তু মজা না পেলেও ও হাসে, কারণ ও বুঝতে পারে অন্যজন সেটাই প্রত্যাশা করছে। সে হাসে, কারণ তার কাছে জীবন ভারি অপরূপ। ছেলেটা ভীষণ ভদ্র। কোনো কিছু চাইতে হলে ও 'দয়া করে' কথাটা না বলে চায় না এবং পেলে সর্বদা 'ধন্যবাদ' বলে। ছেলেটা দেখতে সুন্দর, কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না। জাহাজের বেষ্টনীতে হাত রেখে টুপিবিহীন খোলা মাথায় দাঁড়িয়ে ক্রমশ সরে সরে যাওয়া তীরের দিকে তাকিয়ে ছিলো নীল। ও দীর্ঘকায়—উচ্চতা ছ ফুট দু-ইঞ্চি, হাত-পাগুলো লম্বা আর ঢিলেঢালা, কাঁধ চওড়া আর নিতম্বটা সরু। ছেলেটার মধ্যে অশ্ব-শাবকের মতো এক ধরনের মধুর চঞ্চলতা রয়ে গেছে, যার জন্যে মনে হয় যে কোনো মুহূর্তেই ও লাফালাফি শুরু করে দেবে। ওর মাথার কোঁকড়া কোঁকড়া বাদামী চুলগুলো অদ্ভুত চাকচিক্যময়। চোখ দুটো আয়ত, ভীষণ নীল আর খুশিতে ঝলমলে। নাকটা ছোটো এবং ভোঁতা। হাঁ-মুখটা বড়ো, চিবুকে দৃঢ় সঙ্কল্পের ছায়া। মুখটা একটু চওড়া মতো। কিন্তু সব চাইতে লক্ষণীয় জিনিস, ওর ত্বক। ভীষণ ফর্সা আর মসৃণ—দু গালে অপূর্ব লালচে ছোপ। মেয়েদের পক্ষেও চামড়াটা সুন্দর। এই নিয়ে ক্যাপটেন ব্রেডন রোজ সকালে তার সঙ্গে একই রসিকতা করেন।

'কিহে বাছা, আজ দাড়ি কামিয়েছো?'

'না,' নীল নিজের চিবুকে হাত বুলিয়ে বলে। 'আপনার কি মনে হয়, তার দরকার আছে?'

'দরকার?' ক্যাপটেন সর্বদাই এ কথায় হেসে ওঠেন। 'আরে বাপু, তোমার মুখখানা যে বাচ্চাদের পাছুর মতো!'

এবং অনিবার্যভাবে এবারে নীলের চুলের গোড়া অব্দি লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। 'আমি সপ্তাহে একবার কামাই,' জবাব দেয় সে।

কিন্তু শুধুমাত্র চেহারার জন্যেই যে ছেলেটিকে ভালো লাগে, তা নয়। ওর সারল্য, অকপট স্বভাব এবং সজীব উৎসাহে পৃথিবীর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবার মনোভাব মানুষকে মুগ্ধ করে দেয়। যে নিবিড় ঐকান্তিকতা ও শান্ত ভঙ্গিমায় ও সমস্ত কিছুকে গ্রহণ করে, প্রতিটা বিষয়ে যেভাবে ও তর্ক করার প্রবণতা প্রকাশ করে—তার মধ্যে এক অদ্ভুত সরলতা আছে, যা মানুষকে এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়ে তোলে। ক্যাপটেন এর কারণটা বুঝে উঠতে পারেন না। 'ছেলেটা কোনো-দিনও নারীসঙ্গ করেনি, এটাই কি কারণ!' নিজেকেই তিনি প্রশ্ন করেন। 'অবাক কাণ্ড! আমি তো ভেবেছিলাম মেয়েরা কিছুতেই ওকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। গায়ের রঙখানা যা সুন্দর!'

কিন্তু সুলতান আহমেদ ইতিমধ্যে নদীর বাঁকটার কাছাকাছি পেঁছে গেছে। বাঁকটা ঘুরলেই দৃশ্যপটে জেগে উঠবে কুয়ালা সোলর। কাজের তাড়া ক্যাপটেনের চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটালো। এঞ্জিন ঘরে ফোন করলেন তিনি, জাহাজের গতি অর্ধেক

কমিয়ে দেওয়া হলো। নদীর বাঁ-ধারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট ছিপছিপে শহর কুয়ালা সোলর। ডান তীরে একটা পাহাড়ের ওপরে দুর্গ আর সুলতানের প্রাসাদ। আকাশের পটভূমিতে একটা দীর্ঘ যষ্টির মাথায় সুলতানের নিশানটা বাতাসে নির্ভীক ভঙ্গিমায় দুলছে। জাহাজ মাঝ-নদীতে নোঙর ফেললো। সরকারী লঞ্চে চেপে ডাক্তার এবং একজন পুলিস অফিসার জাহাজে এসে উঠলেন। ওদের সঙ্গে সাদা পোশাক পরা একটি লম্বা কৃশকায় ভদ্রলোক। গ্যাং-ওয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ক্যাপটেন ওঁদের সঙ্গে হাত মেলালেন। তারপর সবশেষে আসা মানুষটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি আপনার তরুণ বন্ধুটিকে নিরাপদে এবং অক্ষত শরীরে নিয়ে এসেছি।' এবারে নীলের দিকে ফিরলেন উনি, 'ইনিই মনরো।'

লম্বা রোগা মানুষটি নিজের হাত বাড়িয়ে, নীলের দিকে যাচাই করে নেবার দৃষ্টিতে তাকালেন। নীল সামান্য আরক্তিম হয়ে মৃদু হাসলো। ওর দাঁতগুলো ভারি সুন্দর।

'নমস্কার, স্যার।'

মনরো ঠোঁট দিয়ে হাসলেন না, কিন্তু তাঁর ধূসর চোখ দুটিতে অস্পষ্ট হাসি জেগে উঠলো। ভদ্রলোকের গাল দুটি তোবড়ানো, নাকটা পাতলা এবং ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকা, ঠোঁট দুটি ফ্যাকাশে। গায়ের চামড়া রোদে ভীষণভাবে পুড়ে গেছে। মুখখানা ক্লান্ত, কিন্তু অভিব্যক্তি খুবই কোমল। নীল অবিলম্বে মানুষটির প্রতি আস্থা অনুভব করলো। ক্যাপটেন এবারে ডাক্তার এবং পুলিসটির সঙ্গেও ওর আলাপ করিয়ে দিলেন, তারপর সবাইকে এক পাত্র পান করে যাবার প্রস্তাব জানালেন। সবাই আসন গ্রহণ করলেন। পরিচারক বিয়ারের বোতলগুলো নিয়ে আসার পর মনরো তাঁর টুপিটা খুলে রাখলেন। নীল লক্ষ্য করলো, ভদ্রলোকের ছোটো করে ছাঁটা বাদামী চুলগুলোতে ধূসর ছাপ পড়তে শুরু করেছে। বয়েস চল্লিশের মতো। আচার ব্যবহার শান্ত সংযত—আর সেই সঙ্গে মিশে আছে মেধা-বুদ্ধির এক উজ্জ্বল উপস্থিতি, যা ওই চটপটে ডাক্তার এবং আত্মম্ভরি পুলিস অফিসারটির মধ্যে ওঁকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে।

পরিচারক চারটি গ্লাসে বিয়ার ঢালায় ক্যাপটেন বললেন, 'ম্যাক আডাম বিয়ার খায় না।'

'ভালোই তো।' মনরো বললেন, 'আশা করি তুমি ওকে কুপথে লুব্ধ করার চেষ্টা করোনি!'

'সিঙ্গাপুরে সে চেষ্টা করেছিলাম', ক্যাপটেনের চোখ দুটো ঝিকমিকিয়ে উঠলো, 'কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।'

বিয়ার শেষ করে মনরো নীলের দিকে তাকালেন, 'এবার তাহলে পারে নামা যাক, কি বলো?'

নীলের মালপত্রগুলো মনরোর চাকরটিকে গছিয়ে দেওয়া হলো। শাম্পানে চেপে দুজনে তীরে গিয়ে নামলেন।

'সোজা বাংলোয় যেতে চাও, নাকি আগে একটু ঘুরে ফিরে দেখবে? টিফিনের

আগে এখনও আমাদের হাতে ঘণ্টা দুয়েক সময় আছে।'

'যাদুঘরে যাওয়া যায় না?' নীল জিগেস করলো।

মনরোর চোখ দুটো শান্ত মৃদু হাসিতে ভরে উঠলো। তিনি খুশি হলেন। নীল স্বভাবে লাজুক, মনরোও বাক্যবাগীশ নন— তাই ও'রা নিঃশব্দেই পথ চলতে লাগলেন। নদীর ধারে এখানে সেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু এদেশী কুটির। স্মরণাতীত কাল থেকে মালয়ীরা এখানে বাস করছে। ওরা ব্যস্ত, কিন্তু ত্রস্ত নয়। দেখে বোঝা যায়, সুখী আর স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ। জন্ম, মৃত্যু, ভালোবাসা আর মানবজীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর নকশায় বোনা ছন্দময় ওদের জীবন। বাজারে গিয়ে হাজির হলো দুজনে। চত্বরের লাগোয়া সরু সরু গলি—অসংখ্য চীনে সেখানে কাজ করছে, খাচ্ছে, নিজেদের স্বভাব অনুযায়ী চিৎকার করে কথা বলছে আর অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে শাশ্বত কালের সঙ্গে।

যাদুঘরের বাড়িটা সুন্দর, পাথরে তৈরি। তোরণ দিয়ে ঢোকার সময় নীল সহজাত প্রবৃত্তিবশেই নিজের শরীরটাকে টানটান করে তুললো। দারোয়ান মনরোকে অভিবাদন জানালো, উনি তার সঙ্গে মালয়ী ভাষায় কথা বললেন। স্পষ্টতই বোঝা গেলো লোকটাকে উনি নীলের পরিচয় বুঝিয়ে দিলেন, কারণ লোকটা নীলের দিকে মৃদু হেসে ফের অভিবাদন জানালো। বাইরের উত্তাপের তুলনায় যাদুঘরের ভেতরটা ঠাণ্ডা এবং রাস্তার ঝলমলে রোদের তুলনায় ভেতরের আলোটাও স্নিগ্ধ মধুর।

'আমার আশঙ্কা, তুমি হতাশ হবে।' মনরো বললেন, 'আমাদের যা থাকা উচিত, তার অর্ধেক জিনিস এখানে আছে। এ পর্যন্ত টাকার অভাবে আমরা ভীষণ অসুবিধের মধ্যে রয়েছি। তবু তারই মধ্যে যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছি। কাজেই তোমাকে একটু মানিয়ে নিতে হবে।'

গ্রীষ্ম-সমুদ্রে গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ঝাঁপ দিতে যাওয়া সাঁতারুর মতো নীল যাদুঘরের ভেতরে পা বাড়ালো। নমুনাগুলো প্রশংসনীয়ভাবেই সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পাখি জীবজন্তু আর সরীসৃপগুলোকে যথাসম্ভব তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক পরিবেশে এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে তাদের জীবনের একটা নিখুঁত পরিপূর্ণ ছবি পাওয়া যায়। নীল তার লজ্জা ভুলে ছেলেমানুষের মতো উৎসাহ উদ্দীপনায় এটা সেটা নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। অসংখ্য প্রশ্ন জিগেস করে। উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কতোটা সময় কেটেছে সে বিষয়ে কারুরই কোনো খেয়াল ছিলো না। অবশেষে মনরো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, কটা বাজে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। রিক্সায় চেপে ওরা বাংলোয় ফিরে এলেন।

নীলকে নিয়ে মনরো বৈঠকখানা ঘরে ঢুকলেন। সোফায় শুয়ে একটি মহিলা বই পড়ছিলো, ওরা ঘরে ঢুকতে ধীরেসুস্থে উঠে বসলো।

'এই আমার স্ত্রী। আমরা ভয়ঙ্কর দেরি করে ফেললাম, তাই না দারিয়া?'

'তাতে কি হয়েছে?' মহিলা মৃদু হাসলো, 'সময়ের চাইতে গুরুত্বহীন জিনিস আর কিছু আছে নাকি?' নিজের বড়োসড়ো হাতখানা এগিয়ে দিয়ে নীলের দিকে

এক দীর্ঘ, চিন্তিত, কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো ও। 'আমার ধারণা ওকে তুমি যাদুঘরটা দেখাচ্ছিলে।'

মহিলার বয়েস পঁয়ত্রিশ, উচ্চতা মাঝারি, মুখখানা হালকা বাদামী আর চোখ দুটি ফিকে নীল। চুলগুলো মাঝখানে সিঁথি কেটে, ঘাড়ের কাছে কোনো রকমে অগোছালোভাবে একটা খোঁপা করে রাখা হয়েছে। চুলগুলো কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের হালকা বাদামী, অনেকটা মধের মতো রঙ। ওর মুখখানা চওড়া, চোয়ালের হাড় দুটো প্রকট, নাকটা একটু মাংসল। মহিলা সুন্দরী নয়। কিন্তু ওর মন্থর গতিবিধির মধ্যে এমন একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌষ্ঠব মিশে আছে, ওর ভাবভঙ্গিতে এমন এক শারীরিক অমনোযোগিতা—যে নেহাত মোটাবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ না হলে সকলেই ওর সম্পর্কে আগ্রহ অনুভব করবে। ওর পরনে একটা সবুজ সুতির ফ্রক। নিখুঁত ইংরেজি বলে, তবে তাতে সামান্য একটু টান রয়ে গেছে।

ওঁরা জল-খাবার খেতে বসলেন। নীল ফের লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে উঠেছিলো, কিন্তু দারিয়া যেন তা লক্ষ্যও করলো না। বেশ খোলাখুলি এবং সহজভাবে ও কথাবার্তা বলছিলো। নীলকে ও তার যাত্রাপথের কথা জিগেস করলো, জানতে চাইলো সিঙ্গাপুর সম্পর্কে তার কি ধারণা। এখানে নীলকে যাদের মুখোমুখি হতে হবে, তাদের কথাও বললো। সুলতান এখানে নেই, তাই সন্ধ্যেবেলা মনরো নীলকে রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে নিয়ে যাবেন। পরে ওঁরা ক্লাবে যাবেন। সেখানে সকলের সঙ্গেই নীলের দেখা হবে।

'এখানে তুমি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে', নীলের দিকে নিজের ফিকে নীল চোখের মনোযোগী দৃষ্টি মেলে রেখে মহিলা বললো। নীলের চাইতে কম অকপট হলে যে কোনো লোকই লক্ষ্য করতো, মহিলা তার যৌবন আর পৌরুষদীপ্ত চেহারার আকার, চকচকে কোঁকড়া চুল আর সুন্দর ত্বক—সবকিছুই ভালোভাবে দেখে নিয়েছে। 'আমাদের কেউ খুব একটা পছন্দ করে না,' ফের বললো ও।

'তুমি বাজে কথা বলছো, দারিয়া। তুমি বড্ড অনুভূতিশীল। আসলে ওরা ইংরেজ, এটাই হচ্ছে ব্যাপার।'

'ওরা মনে করে, অ্যাংগাসের পক্ষে বৈজ্ঞানিক হওয়া একটা হাস্যকর ব্যাপার। আর আমি রাশিয়ান বলে, ঠিক পাতে পড়ার যোগ্য নই। কিন্তু আমি কিছু পরোয়া করে চলি না। ওরা নির্বোধের দল। ওরা নেহাতই সাধারণ, প্রচণ্ড সঙ্কীর্ণমনা, চরম গতানুগতিক—এই ধরনের মানুষের মধ্যে বাস করার মতো দুর্ভাগ্য আমার আগে কখনও হয়নি।'

'এসে পৌঁছনোমাত্র তুমি ম্যাক অ্যাডামকে অমন করে ঘাবড়ে দিয়ো না। মানুষগুলোকে ওর সহৃদয় আর অতিথিপরায়ণ বলেই মনে হবে।'

'তোমার নামটা কি?' মহিলা জানতে চাইলো।

'নীল।'

'আমি তোমাকে ওই নামেই ডাকবো। আর তুমিও আমাকে দারিয়া বলবে। মিসেস মনরো ডাক শুনতে আমার জঘন্য লাগে। মনে হয়, আমি যেন একজন

যাজকের স্ত্রী।'

নীল আরক্তিম হয়ে ওঠে। মহিলা তাকে এতো তাড়াতাড়ি এতোটা ঘনিষ্ঠ হতে বলায় বিব্রত হয়ে ওঠে সে।

'পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ অবিশ্যি তেমন খারাপ নয়।'

'তাঁরা সুদক্ষভাবে নিজেদের কাজ করেন এবং সেই কারণেই তাঁরা এখানে রয়েছেন,' মনরো বললেন।

'তারা শিকার করে। ফুটবল টেনিস আর ক্রিকেট খেলে। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দিব্যি ভালোই। কিন্তু মহিলারা অসহ্য। ওরা হিংসুটে, কুচুটে আর কুঁড়ে। কোনো বিষয় নিয়েই ওরা কথা বলতে পারে না। কোনো বুদ্ধিদীপ্ত প্রসঙ্গ তুললে ওরা এমনভাবে নাক কোঁচকাবে, যেন তুমি অশোভন কাজ করছো। কি নিয়ে কথা বলবে ওরা? কোনো বিষয়েই ওদের আগ্রহ নেই। দেহ নিয়ে কথা বললে ওরা মনে করবে, তুমি অসভ্য আর আত্মার কথা বললে বলবে, নীতি-বাগীশ।'

'আমার স্ত্রী যা বলছেন, তুমি তা একেবারে আক্ষরিক অর্থে সত্যি বলে ধরে নিও না।' মনরো তাঁর নিজস্ব শান্ত সহিষ্ণু ভঙ্গিতে মৃদু হাসলেন, 'প্রাচ্যের অন্য যে কোনো জায়গার মতোই এখানকার সমাজ—প্রচণ্ড চালাক চতুর নয় আবার ভীষণ বোকাও নয়। তবে এঁরা সদাশয় এবং সৌজন্যময়। আর সেটাই তো অনেকখানি!'

'সদাশয় সৌজন্যময় মানুষে আমার কাজ নেই। আমি চাই, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা আবেগপ্রবণ মানুষ। আমি চাই তারা মানবজাতি সম্পর্কে আগ্রহী হবে, জিন কিংবা জলখাবারের চাইতে মানুষের আত্মা সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে বেশি গুরুত্ব দেবে, শিল্প আর সাহিত্যকে উপযুক্ত মূল্য দেবে।' আচমকা নীলের দিকে ফিরে দারিয়া প্রশ্ন করলো, 'তোমার কি আত্মা আছে?'

'জানি না। আপনি কি বলতে চাইছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমি জিগেস করলাম বলে তুমি লাল হয়ে উঠছো কেন? নিজের আত্মার জন্যে তুমি কেন লজ্জা পাবে? তোমার মধ্যে যার গুরুত্ব সব চাইতে বেশি, তা ওই আত্মা। আমাকে তার কথা বলো। আমি তোমার সম্পর্কে আগ্রহী, আমি তোমার কথা জানতে চাই।'

একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতার কাছ থেকে এ ধরনের ব্যবহার নীলের কাছে ভীষণ অস্বস্তিকর বলে মনে হচ্ছিলো। এ ধরনের কারুর সঙ্গে তার আগে কোনো-দিনও আলাপ-পরিচয় হয়নি। কিন্তু সে গভীর-আন্তরিক প্রকৃতির যুবক—তাই সরাসরি প্রশ্ন করায় সে তার যথাসাধ্য জবাব দেবার চেষ্টা করলো। শুধু মনরোর উপস্থিতি তাকে খানিকটা বিব্রত করে তুলছিলো।

'আত্মা বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন, আমি জানি না। যদি আত্মা বলতে আপনি নিরাকার বা আধ্যাত্মিক কোনো সত্তার কথা বোঝাতে চান, যা স্রষ্টা স্বতন্ত্র ভাবে তৈরি করে সাময়িকভাবে নশ্বর দেহের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন—তাহলে

আমার উত্তর হবে নেতিবাচক। আমার মনে হয় শান্ত ভাবে প্রমাণগুলো বিচার করে দেখার মতো ক্ষমতা যাঁদের আছে, মানব-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এ ধরনের চরম দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের পক্ষে কোনোমতেই সমর্থন করা সম্ভব নয়। তবে আত্মা বলতে আপনি যদি মানুষের মানসিক উপাদানগুলোর সমষ্টিকে বুঝিয়ে থাকেন, যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে—তাহলে অবশ্যই আমার তা আছে।'

'তুমি ভীষণ মিষ্টি, আর দেখতে দারুণ সুন্দর,' দারিয়া মৃদু হাসলো। 'না, আত্মা বলতে আমি বোঝাতে চাইছি চাওয়া-পাওয়ার আর্তিসহ আমাদের হৃদয়, কামনা-বাসনা নিয়ে গড়া এই দেহ আর আমাদের ভেতরকার সেই অসীম অনন্তকে। আচ্ছা বলো তো, আসার পথে তুমি কি কোনো বই পড়লে? না কি শুধু ডেকে টেনিস খেলেই সময় কাটিয়েছো?'

এ ধরনের এলোমেলো জবাবে নীল অবাক হয়ে গেলো। মহিলার চোখ দুটো অমন হাসিখুশি আর ভাবভঙ্গি অতো সহজ-স্বাভাবিক না হলে সে খানিকটা অপমানিত বোধ করতো। যুবকের বিহ্বলতায় মনরো শান্ত ভঙ্গিতে হাসলেন। হাসলে তাঁর নাকের পাটা থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত টানা টানা রেখাগুলো গভীর হয়ে ফুটে ওঠে।

'খুব কনর‍্যাড পড়েছি।'

'আনন্দের জন্যে, নাকি মনটাকে উন্নত করার জন্যে?'

'দুই-ই। কনর‍্যাড আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে।'

তীব্র প্রতিবাদের ভঙ্গিমায় দারিয়া নিজের হাত দুটো ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিলো, 'তোমরা ইংরেজরা কি করে ওই ভণ্ড পোলটার বাক চাতুরিতে ভোলো, বলো তো? নিজের অন্যান্য দেশবাসীর মতো ওই লোকটার জ্ঞানও নেহাতই ভাসা-ভাসা। ওই শব্দস্রোত, ওই বাক্যবিন্যাস, অমন আকর্ষণীয় অলঙ্কার, গভীরতার প্রতি অমন টান—এসমস্ত পেরিয়ে তলানিতে গিয়ে ঠেকলে স্রেফ তুচ্ছ মামুলি গতানুগতিকতা ছাড়া তুমি আর কি পাবে? লোকটা যেন রোম্যান্টিক পোশাক পরে ভিক্টর হ্যুগোর নাটক আবৃত্তি করতে থাকা একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেতা। মিনিট পাঁচেক ওই আবৃত্তি তোমার কাছে উচ্ছ্বাসময় বলে মনে হবে। কিন্তু তারপরেই তোমার সমস্ত সত্তা বিদ্রোহ করে উঠবে···তুমি চিৎকার করে উঠবে—না, এ মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে।'

নীল শিল্প বা সাহিত্য নিয়ে কাউকে এমন আবেগ ঢেলে কথা বলতে দেখেনি। দারিয়ার সচরাচর ফ্যাকাশে গাল দুটো লাল হয়ে উঠেছে, ঝকঝক করছে ওর হালকা রঙের চোখ দুটো।

'কনর‍্যাডের মতো আর কেউ অমন করে পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে না।' নীল বললো, 'পড়তে পড়তে আমি যেন প্রাচ্যের ঘ্রাণ পাই, প্রাচ্যকে দেখতে পাই, ছুঁতে পাই।'

'বাজে কথা। প্রাচ্যের কতোটুকু জানো তুমি? সবাই বলবে কি ধরনের সাংঘাতিক ভুল উনি করেছেন। অ্যাংগাসকে জিগেস করে দ্যাখো।'

'উনি অবশ্যই সবকিছু একেবারে ঠিকঠাক লেখেননি,' নিজস্ব পরিমিত, চিন্তিত ভঙ্গিমায় মনরো বললেন। 'যে বোর্নিয়োর বর্ণনা উনি দিয়েছেন, তা আমাদের জানা বোর্নিয়ো নয়। বোর্নিয়োকে উনি দেখেছেন একটা বাণিজ্য-জাহাজের ডেক থেকে এবং যেটুকু দেখেছেন তা-ও নিখুঁতভাবে দেখেননি। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় কি? আমি বুঝি না, বাস্তব কেন উপন্যাসের গতিরোধ করবে। কেউ যদি মনগড়া একটা অন্ধকার, গা-ছমছমে, রোম্যান্টিক এবং বীরত্বেভরা দেশের সৃষ্টি করেন, তবে আমি সেটাকে একটা হীন কাজ বলে মনে করতে পারি না।'

'অ্যাংগাস, তুমি ভাবপ্রবণ।' ফের নীলের দিকে তাকিয়ে দারিয়া বললো, 'তোমার তুর্গেনিভ পড়া উচিত, তলস্তয় পড়া উচিত, ডস্টয়েভস্কি পড়া উচিত।'

দারিয়া মনরোকে নীল বিন্দুমাত্রও বুঝে উঠতে পারেনি। পরিচয়ের প্রথম পর্যায়গুলো টপকে গিয়ে নীলের সঙ্গে ও অবিলম্বে এমন ব্যবহার করতে শুরু করেছে যেন নীলকে ও আজীবন অতি ঘনিষ্ঠভাবে চেনে। নীল এতে বিহ্বল হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা তার কাছে ভীষণ বেপরোয়া বলে মনে হয়েছে। কারুর সঙ্গে পরিচয় হলে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশেই সে গোড়ার দিকে খানিকটা সতর্কভাবে এগোয়। তার ব্যবহার সৌজন্যময়, কিন্তু সামনের পথটা না দেখে সে বেশি দূরে এগুনো পছন্দ করে না। নিজে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হওয়া অব্দি সে কাউকে নিজের মনের কথা বলে না। কিন্তু দারিয়া সম্পর্কে এ ধরনের মনোভাব বজায় রাখা সম্ভব নয়। ও জোর করে আস্থা আদায় করে নেয়। নিজের অনুভূতি আর ভাবনা—যা অধিকাংশ মানুষই নিজের মধ্যে গোপন করে রাখে—বিশৃঙ্খল জনতার মধ্যে অকাতরে স্বর্ণমুদ্রা ছড়িয়ে যাওয়া বেহিসেবি মানুষের মতো দারিয়া সেগুলোকেই প্রকাশ করে দেয় অতি অনায়াসে। ওর কথাবার্তা চালচলনের সঙ্গে নীলের পরিচিত কারুরই কোনো মিল নেই। কি বললো, তা নিয়ে ওর কোনো মাথা ব্যথা নেই। মানুষ নামক জন্তুর প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে ও এমনভাবে কথাবার্তা বলে যা নীলের গাল দুটোতে লজ্জার লালিমা বয়ে আনে। এবং তাতে আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে দারিয়ার পরিহাস।

'ওঃ, তুমি একটি মিচকে শয়তান! এতে অশ্লীলতা কোথায়? আমি যখন জোলাপ নিতে যাচ্ছি, তখন কেন আমি তা বলবো না? আর যখন আমার মনে হচ্ছে যে তোমার জোলাপ নেওয়া দরকার, তখন সেটাই বা বলবো না কেন?'

নীলের কাছ থেকে তার বাবা-মা-ভাই, তার স্কুল আর বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন—সবই জেনে নেয় দারিয়া। নিজের কথাও বলে। ওর বাবা ছিলেন একজন জেনারেল, যুদ্ধে মারা যান। মা এক প্রিন্সেস লাচকভ। বলশেভিকরা ক্ষমতা অধিকার করার সময় ওরা ছিলো পূর্ব রাশিয়ায়, তারপর সেখান থেকে পালিয়ে যায় ইয়োকোহামায়। কিছু কিছু অলঙ্কার আর শিল্পবস্তু, যেগুলো ওরা বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলো, সেগুলো বিক্রি করেই তখন কোনোক্রমে অতিকষ্টে ওদের দিন কাটতে থাকে। ওখানেই একজন নির্বাসিতের সঙ্গে দারিয়ার বিয়ে হয়। কিন্তু

বিয়েটা সুখের হয়নি, দু বছরের মধ্যেই দারিয়া বিয়ে ভেঙে দেয়। তারপর মা মারা গেলেন, ওর তখন কপর্দকহীন অবস্থা। বেঁচে থাকার জন্যে ওকে তখন বাধ্য হয়ে নানান ধরনের কাজ করতে হয়েছে। একটা মার্কিন ত্রাণ সংস্থায় কাজ করেছে, একটা মিশনারী স্কুলে পড়িয়েছে, তাছাড়া কাজ করেছে একটা হাসপাতালেও। যে সমস্ত পুরুষমানুষ ওর দারিদ্র্য এবং অসহায় অবস্থার সুযোগ নিতে চেষ্টা করেছে, ও তাদের কথা বলায় নীলের রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। আবার সেই সঙ্গে সে ভীষণ অপ্রস্তুতও বোধ করেছে—কারণ খুঁটিনাটি কোনো বিবরণই দারিয়া বাদ দিয়ে বলেনি।

'বর্বর পশুর দল,' নীল বলেছে।

'সব পুরুষমানুষই ওই রকম,' দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে জবাব দিয়েছে দারিয়া।

একবার রিভলভার তুলে কিভাবে ও নিজের ধর্ম রক্ষা করেছিলো, সে কথাও নীলকে বলেছে দারিয়া। 'সত্যি বলছি, লোকটা আর এক পা এগুলেই আমি ওকে মেরে ফেলতাম—একটা কুকুরের মতো গুলি করে মারতাম।'

'কি সাংঘাতিক!'

ইয়োকোহামাতেই অ্যাংগাসের সঙ্গে দেখা হয় দারিয়ার। অ্যাংগাস তখন জাপানে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। মানুষটার অকপট এবং শোভন-সুন্দর ব্যবহার, কোমলতা আর বিচার-বিবেচনায় ও মুগ্ধ হয়। অ্যাংগাস ব্যবসায়ী নন, তিনি একজন বৈজ্ঞানিক এবং বিজ্ঞান শিল্পেরই সহোদর। দারিয়াকে তিনি শান্তি আর নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন। তাছাড়া জাপান তখন দারিয়ার কাছে ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিলো। ওর মনে হয়েছিলো, বোর্নিয়ো এক রহস্যময় দেশ। ওদের বিয়ে হয়েছে আজ পাঁচ বছর।...

নীলকে রাশিয়ান ঔপন্যাসিকদের লেখা পড়তে দেয় দারিয়া। ফাদার্স অ্যাণ্ড সানস, আনা কারেনিনা, আর দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ।

'এগুলো আমাদের সাহিত্যের তিনটে চূড়া। এগুলো পড়ো। এগুলো পৃথিবীর অন্যতম সেরা উপন্যাস।'

ওর দেশের আরও অনেকের মতো দারিয়াও এমনভাবে কথা বলে, যেন পৃথিবীর অন্য কোনো সাহিত্যই ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। যেন গোটাকতক গল্প-উপন্যাস, বিক্ষিপ্ত কয়েকটা কবিতা আর গোটা ছয়েক ভালো নাটক দুনিয়ার তাবৎ সাহিত্যকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ করে দিয়েছে। নীল ওর কথায় আকৃষ্ট আর বিহ্বল হয়ে ওঠে।

'তুমি অনেকটা অ্যালিয়োশার মতো,' নরম আর নিবিড় হয়ে ওঠা চোখে তার দিকে তাকিয়ে দারিয়া বলেছে, 'সংশয়ী আর বিচক্ষণ এক অ্যালিয়োশা, যার মধ্যে রয়েছে স্কচদের জেদ—যা তোমার ভেতরকার আত্মাটাকে, তোমার আত্মিক সৌন্দর্যকে ফুটে বেরুতে দেবে না।'

'আমি একটুও অ্যালিয়োশার মতো নই,' আত্মসচেতন ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছে নীল।

'তুমি জানো না তুমি কি রকম। নিজের সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। তুমি প্রকৃতিবিজ্ঞানী হলে কেন? টাকার জন্যে? গ্লাসগোতে গিয়ে কাকার অফিসে যোগ দিলে তুমি তো অনেক বেশি টাকা রোজগার করতে পারতে! আমার কেমন যেন মনে হয়, তোমার মধ্যে আশ্চর্য আর অপার্থিব কিছু একটা রয়ে গেছে। ফাদার জোসিমা যেমন দিমিত্রির কাছে নত হয়েছিলেন, আমিও তেমনি তোমার পায়ের কাছে মাথা নত করতে পারি।'

'দয়া করে তা কোরো না,' সুস্মিত মুখে জবাব দিলেও নীল ঈষৎ রক্তিম হয়ে উঠেছে।

কিন্তু উপন্যাসগুলো পড়ে দারিয়াকে এখন তার আর অতোটা বিচিত্র বলে মনে হয় না। ওরা দারিয়ার পরিবেশ গড়ে দিয়েছে। নীল বুঝতে পেরেছে, দারিয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো স্কটল্যান্ডে তার পরিচিত মহিলাদের ক্ষেত্রে—যেমন তার মা, কাকার মেয়েরা—অস্বাভাবিক হলেও, রুশ উপন্যাসের বহু চরিত্রেই সেগুলো খুব সাধারণ। দারিয়ার অতো রাত অব্দি জেগে থাকা, অসংখ্য বার চা খাওয়া, প্রায় সারাটা দিন সোফায় শুয়ে শুয়ে বই পড়া আর অনবরত ধূমপান করা—এগুলোতে নীল এখন আর অবাক হয় না। দিনের পর দিন কিছু না করলেও ওর একঘেয়ে লাগে না। ও আলস্য আর উৎসাহের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। প্রায়ই ও দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে বলে, আসলে ও প্রাচ্য জগতের—কিন্তু স্রেফ দৈবচক্রে ইউরোপিয় হয়ে জন্মেছে। ওর মধ্যে বেড়ালের মতো এক ধরনের সৌন্দর্য আছে, যা সত্যিই প্রাচ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। ও প্রচণ্ড অগোছালো। বৈঠকখানার সর্বত্র সিগারেটের শেষাংশ, পুরনো কাগজ আর খালি কৌটো ছড়ানো-ছেটানো থাকলেও ওর কোনো অসুবিধে হয় বলে মনে হয় না। অথচ নীলের মনে হয়, আনা কারেনিনার সঙ্গে ওর কি যেন একটা মিল আছে এবং ওই করুণ চরিত্রটির প্রতি তার সবটুকু সহানুভূতি সে তাই দারিয়াকে নিবেদন করেছে। দারিয়ার ঔদ্ধত্যের কারণ সে বুঝতে পারে। ও যে এখানকার মেয়েদের অবজ্ঞার চোখে দেখে, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। নীল একটু একটু করে এখানকার মেয়েদের পরিচয় পেয়েছে। ওরা নেহাতই সাধারণ, ওদের চাইতে দারিয়ার মন অনেক দ্রুত কাজ করে, দারিয়ার সংস্কৃতি অনেক বেশি বিস্তৃত এবং সর্বোপরি দারিয়ার মধ্যে এমন এক সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা আছে যা ওদের একেবারে অস্বাভাবিক বিবর্ণ করে দিয়েছে। দারিয়া ওদের সৌহার্দ্য অর্জনের জন্যে অবশ্যই কোনো রকম চেষ্টা করেনি। বাড়িতে একটা সারং আর বাজু গলিয়ে রাখলেও অ্যাংগাসের সঙ্গে বাইরে কোথাও নৈশভোজে গেলে ও এমন জমকালো সাজগোজ করে, যে এখানে সেটা কেমন যেন বেমানান বলে মনে হয়। খোলামেলা পোশাকে নিজের অপর্যাপ্ত বক্ষ-সৌন্দর্য আর সুগঠিত সুষম পিঠের অনেকটা দেখাতে ও ভালোবাসে। গালে রঙ মাখে, পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়ানো অভিনেত্রীর মতো চোখও আঁকে। তখন ওর প্রতি মানুষের বিমুগ্ধ বা বিক্ষুব্ধ দৃষ্টি দেখে নীলের রাগ হয় বটে, কিন্তু নিজেকে এমন একটি দর্শনীয় বস্তু করে তোলার জন্যে তখন

মনে মনে দারিয়ার জন্যে তার দুঃখও হয়। দেখতে অবশ্যই দুর্ধর্ষ লাগে, কিন্তু পরিচয় জানা না থাকলে তখন মনে হয় ও সম্ভ্রান্ত মহিলা নয়। ওর কতকগুলো জিনিস নীল কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। ওর প্রচণ্ড খিদে। নীল ও অ্যাংগাস দুজনে মিলে যা খায়, দারিয়া একাই সেই পরিমাণ মতো খায় বলে নীলের ধারণা। যৌন প্রসঙ্গে ও এমন খোলামেলাভাবে কথাবার্তা বলে যা নীল কিছুতেই ঠিক মেনে নিতে পারে না। ও ধরেই নিয়েছে, দেশে এবং এডিনবরায় একগাদা মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিলো। সেই সমস্ত ঘটনাবলী বিশদভাবে বলার জন্যে ও নীলকে চেপে ধরে। নিজের স্কচসুলভ চাতুর্যে নীল তখন ওকে ঠেকিয়ে রাখে, সতর্কভাবে ওর প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে যায়। তার স্বল্পভাষিতায় তখন হেসে ওঠে দারিয়া।

মাঝে মাঝে ও নীলকে আহত বিস্ময়ে বিমূঢ় করে তোলে। ওর মুখে নিজের সৌন্দর্যের খোলাখুলি প্রশংসায় নীল এখন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। দারিয়া যখন বলে, নীল নরওয়ের এক তরুণ দেবতার মতো সুদর্শন—তখন নীল এতোটুকু বিচলিত হয় না। দারিয়ার রসেবশেভরা মধুর তোষামোদ তাকে আদৌ প্রভাবিত করে না। কিন্তু দারিয়া যখন তার কোঁকড়া চুলগুলোতে নিজের দীর্ঘ, নরম আর সোহাগী আঙুলগুলোকে চালিয়ে দেয় অথবা সুস্মিত মুখে তার মসৃণ গালে হাত বোলায়—তখন নীলের মোটেই ভালো লাগে না। অত্যধিক মাখামাখি সে পছন্দ করে না। একদিন দারিয়া জল খাবে বলে টেবিলে রাখা একটা গ্লাসে জল ভরতে শুরু করেছিলো। নীল তক্ষুণি বলে উঠেছিলো, 'ওটা আমার গ্লাস। এইমাত্র আমি ওটা থেকে জল খেয়েছি।'

'তাতে কি হয়েছে? তোমার তো সিফিলিস নেই, তাই নয় কি?'

'অন্যের গ্লাসে জল খেতে আমার নিজের বিশ্রী লাগে।'

সিগারেট নিয়েও দারিয়া অদ্ভুত কাণ্ড করে। একদিন—নীল তখনও খুব বেশিদিন হলো এখানে আসেনি—সে একটা সিগারেট ধরাতেই দারিয়া বলে বসে, 'ওটা আমার চাই।' এবং নীলের ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নিয়ে ও টানতে শুরু করে। কিন্তু দু-তিনবার টানার পর আর ভালো লাগছে না বলে সেটা ও আবার নীলকে ফিরিয়ে দেয়। সিগারেটের যে অংশটা ওর মুখে ছিলো, সেটা ওর ঠোঁটের রঙে লাল হয়ে গিয়েছিলো। ওটা মুখে নেবার আর কোনো ইচ্ছেই ছিলো না নীলের। কিন্তু ওটা ফেলে দিলে পাছে দারিয়া কিছু মনে করে, তাই ভেবে ভয় পেয়েছিলো সে। কিন্তু ব্যাপারটাতে সে খানিকটা বিরতও হয়েছিলো তখন। প্রায়ই ও নীলের কাছে সিগারেট চায় এবং সিগারেট দিলে বলে, 'ধরিয়ে দাও না!' সিগারেট ধরিয়ে এগিয়ে দিলে, ও নিজের ঠোঁট দুটিকে ঈষৎ ফাঁক করে রাখে যাতে নীল সেটা ওর ঠোঁটে গুঁজে দেয়। ধরাতে গিয়ে নীল সিগারেটটা সামান্য ভিজিয়ে ফেলে। সে ভেবে পায় না, ওই ভেজা অংশটাই দারিয়া কি করে নিজের ঠোঁটে তুলে নেয়। সমস্ত জিনিসটা তার কাছে ভয়ঙ্কর অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা বলে মনে হয়। সে সুনিশ্চিত, মনরো এতোটা মাখামাখি পছন্দ করবেন না। ক্লাবেও দারিয়া দু-একবার এরকম কাণ্ড করেছে। নীল ভাবে, এ ধরনের অপ্রিয় অভ্যেসগুলো

দারিয়ার না থাকলেই পারতো। কিন্তু ও ধরে নিয়েছে, রুশ মাত্রেই এ ধরনের স্বভাবের অধিকারী। তবে এসব বাদে, সঙ্গী হিসেবে দারিয়া সত্যিই চমৎকার। ওর কথাবার্তা শ্যাম্পেনের মতো উদ্দীপনা যোগায়—কথাটা অবশ্যই রূপকার্থে, কারণ নীল একবার মাত্র শ্যাম্পেন পান করেছে এবং জিনিসটা তার ভীষণ বিশ্রী লেগেছে। এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে দারিয়া কথা বলতে পারে না। ও পুরুষের মতো কথাবার্তা বলে না। একজন পুরুষের ক্ষেত্রে বলা যায়, পরের কথাটা সে কি বলবে—কিন্তু দারিয়ার ক্ষেত্রে কোনো সময়েই তা বোঝা যায় না। অনুমান করে নেবার শক্তি ওর অসাধারণ। ওর কথাবার্তা মনে নানান ধরনের চিন্তার উন্মেষ ঘটায়, মনকে প্রসারিত করে এবং কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। নীল অনুভব করে, আগে সে কখনও এতো প্রাণবন্ত ছিলো না। সে যেন পর্বতের শিখরে শিখরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার মনের দিগন্ত যেন বাধা-বন্ধনহীন। তার চেনা জানা মহিলাদের মধ্যে দারিয়া অনেক দিক দিয়েই সব চাইতে বুদ্ধিমতী এবং সব চাইতে বড়ো কথা, ও অ্যাংগাস মনরোর স্ত্রী।

দারিয়া সম্পর্কে নীলের মনে কোনো আপত্তি থাকলেও, মনরো সম্পর্কে তেমন কিছুই নেই। উনি কতো ধীর স্থির, কতো সুষম আর কি সহিষ্ণু! বয়েস বাড়লে নীল নিজেও ওমনি হতে চায়। উনি কম কথা বলেন—কিন্তু যখন কিছু বলেন, তার মধ্যে বস্তু থাকে। উনি প্রাজ্ঞ। ওঁর মধ্যে একটা শুষ্ক রসবোধ আছে, যেটা নীল বুঝতে পারে। তার পাশাপাশি ক্লাবে দিলখোলা ইংরাজী রসিকতাও নিতান্ত শূন্যগর্ভ বলে মনে হয়। উনি সদাশয় এবং ধৈর্যশীল। ওঁর মধ্যে এমন এক মর্যাদার আভিজাত্য আছে যে কারুর পক্ষেই ওঁর সঙ্গে হালকা ফাজলামো করা সম্ভব নয়। অথচ উনি আত্মম্ভরি বা গুরুগম্ভীর নন। মানুষ হিসেবে যতোটা, বৈজ্ঞানিক হিসেবে নীল ওঁকে তার চাইতে কম শ্রদ্ধা করে না। ওঁর কল্পনাশক্তি আছে, উনি সতর্ক এবং কষ্টসহিষ্ণু। যদিও গবেষণার দিকেই ওঁর আগ্রহ, কিন্তু যাদুঘরের দৈনন্দিন কাজগুলোও উনি যত্ন নিয়েই করেন। ওই সময়ে উনি এক ধরনের পতঙ্গ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন এবং স্থির করেছিলেন, তাদের যৌন সংসর্গবিহীন বংশবিস্তারের ক্ষমতা সম্পর্কে একটা তথ্যমূলক প্রবন্ধ লিখবেন। এই গবেষণার ব্যাপারে একদিনের একটা ঘটনা নীলের মনে গভীর ছাপ ফেলে যায়। সেদিন একটা গিবন কি করে যেন শেকলের বাঁধন থেকে ছাড়া পেয়ে সব কটা লার্ভা খেয়ে নেয় এবং তার ফলে মনরোর সমস্ত রকম তথ্য-প্রমাণও বিনষ্ট হয়ে যায়। নীলের তখন প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা। কিন্তু অ্যাংগাস মনরো গিবনটাকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে, তার গায়ে আদরের চাপড় মারতে মারতে স্মিত মুখে স্যার আইজ্যাক নিউটনের সেই বিখ্যাত উক্তিটির পুনরুল্লেখ করেছিলেন, 'ডায়মন্ড ডায়মন্ড, তুমি জানো না তুমি কি ক্ষতি করেছো!'

জন্তু-জানোয়ারের অনুকৃতি নিয়েও অ্যাংগাস মনরো পড়াশুনো করেন এবং এই বিতর্কিত বিষয়টিতে তিনি নীলেরও গভীর আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছেন। এ ব্যাপারে ওঁদের মধ্যে সীমাহীন আলাপ আলোচনা হয়েছে। মনরোর আশ্চর্য

জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে নীল বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়েছে আর কুণ্ঠিত হয়েছে নিজের অজ্ঞতায়। কিন্তু মনরো যখন নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে অভিযানের কথা বলেন, তখনই তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনাটা সব চাইতে বেশি সংক্রামক হয়ে ওঠে। ওই হচ্ছে পরিপূর্ণ নিখুঁত জীবন—পরিশ্রম, অসুবিধে, কখনও অভাব আর কখনও বা বিপদ। কিন্তু তার পুরস্কার—কোনো দুর্লভ অথবা কোনো নতুন প্রজাতি আবিষ্কারের রোমাঞ্চ, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর অপরূপ সৌন্দর্য, প্রকৃতিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার সুবর্ণ সুযোগ এবং সর্বোপরি সমস্ত রকম বন্ধন থেকে মুক্তির অনুভূতি। প্রধাণত কাজের এই অংশটার জন্যেই নীলকে রাখা হয়েছে। মনরো গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকেন বলে তাঁর পক্ষে একটানা সপ্তাহের পর সপ্তাহ বাড়ির বাইরে থাকা অসুবিধেজনক এবং দারিয়াও কক্ষণো তাঁর সঙ্গে যেতে রাজি হয় না। জঙ্গল সম্পর্কে ওর মনে এক অহেতুক ভীতি। বুনো জীবজন্তু, সাপখোপ আর বিষাক্ত পতঙ্গে ওর দারুণ ভয়। মনরো বারবার করে ওকে বুঝিয়েছেন, আঘাত না করলে বা ভয় না দেখালে কোনো জন্তুই মানুষের ক্ষতি করে না—কিন্তু নিজের সহজাত আতঙ্ককে দারিয়া কিছুতেই জয় করতে পারে না। দারিয়াকে রেখে যেতেও মনরোর ভালো লাগে না। কারণ তিনি জানেন, দারিয়া এখানে কারুর সঙ্গে মেলা-মেশা করে না—কাজেই তিনি না থাকলে ওর পক্ষে জীবনটা অসহ্য রকমের একঘেয়ে হয়ে ওঠে। অথচ প্রকৃতিবিজ্ঞানে সুলতান প্রচণ্ড আগ্রহী এবং তাঁর ইচ্ছে, যাদুঘরে এ দেশের প্রাণীকুলের একটা সম্পূর্ণ সংগ্রহ থাকবে। এবারে তাই মনরো আর নীল দুজনে মিলে একটা অভিযানের সামিল হবেন, যাতে নীল কাজের ধারাটা শিখে নিতে পারে। পরিকল্পনাটা নিয়ে মাসের পর মাস ওঁদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। নীল এখন অসীম আগ্রহে ওই অভিযানের দিন গুনছে, জীবনে আর কোনোদিন অন্য কিছুর জন্যেই সে এমন করে অপেক্ষা করেনি।

ইতিমধ্যে নীল মালয়ী ভাষাটা শিখে নিয়েছে এবং আঞ্চলিক বাচনভঙ্গিও খানিকটা আয়ত্ত করেছে, যেটা তার ভবিষ্যৎ অভিযানগুলোতে কাজে আসবে। খুব শীগগিরি এখানকার প্রত্যেকের সঙ্গে তার চেনা পরিচয় হয়ে গেলো। সে টেনিস আর ফুটবল খেলে। বিজ্ঞানের প্রতি আবিষ্টতা এবং রুশ উপন্যাস সম্পর্কে সমস্ত আগ্রহ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ফুটবল মাঠে শুধু খেলার আনন্দের মধ্যেই সে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। খেলার শেষে জল আর এক টুকরো লেবু খেতে খেতে অন্যদের সঙ্গে খেলাটার সম্পর্কে আলোচনা করা তার কাছে দারুণ আনন্দদায়ক। মনরোদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে থাকার কোনো বাসনা তার ছিলো না। কিন্তু কুয়ালা সোলরে একটি মাত্র রেস্ট হাউস এবং নিয়ম অনুসারে কেউ সেখানে পনেরো দিনের বেশি থাকতে পারবে না। তাই সরকারী আবাসন না পাওয়া অবিবাহিত কর্ম-চারীরা কয়েকজন মিলে এক একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে। নীল যখন এখানে এসে পৌঁছোয়, তখন কোনো বাড়িতেই জায়গা ছিলো না। চার মাস কেটে যাবার পর একদিন সন্ধ্যাবেলা ওয়্যারিং আর জনসন নামে দুজন যুবক টেনিস খেলার পর একসঙ্গে বসে গল্প করতে করতে নীলকে জানালো, তাদের মেসের একটি ছেলে

দেশে চলে যাচ্ছে—কাজেই নীল ইচ্ছে করলে তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিতে পারে এবং নীলকে পেলে তারা খুশিই হবে। ওরা দুজনেই তরুণ, তার সমবয়সী, ফুটবল খেলে এবং নীল ওদের দুজনকেই পছন্দ করে। ওয়্যারিং শুল্ক বিভাগে কাজ করে আর জনসন পুলিসে। প্রস্তাবটা পেয়ে নীল লাফিয়ে উঠলো। কতো খরচাপাতি পড়বে, তা-ও ওরা নীলকে জানিয়ে দিলো। পনেরো দিন বাদে একটা দিন স্থির করা হলো, সেদিনই নীলের পক্ষে আশ্রয়স্থল বদলানোটা সুবিধেজনক হবে।

রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়ার সময় নীল মনরোদের কথাটা বললো।

'আমাকে আপনারা এতোদিন থাকতে দিয়েছেন, এ আপনাদের অশেষ করুণা। কিন্তু এভাবে আপনাদের ঘাড়ে পড়ে থাকতে আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগে, লজ্জা করে। অথচ এ জন্যে আমার দেবার মতো কোনো কৈফিয়তও নেই।'

'কিন্তু তুমি এখানে থাকলে আমাদের ভালো লাগে,' দারিয়া বললো। 'তোমাকে কোনো ওজর বা কৈফিয়ৎ দেখাতে হবে না।'

'কিন্তু আমি তো অনির্দিষ্ট কাল এখানে থাকতে পারি না!'

'কেন পারবে না? তোমার মাইনেপত্র তো জঘন্য, খাওয়া-থাকার পেছনে সেটা শুধু শুধু নষ্ট করে কি লাভ? জনসন আর ওয়্যারিঙের সঙ্গে থাকতে তোমার বিচ্ছিরি লাগবে। ওরা দুজনে দুটো আকাট। গ্রামোফোন বাজানো আর বল নিয়ে দাপা দাপি করা ছাড়া ওদের মাথায় আর কিছু নেই।'

বিনা খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাটা নীলের পক্ষে সত্যিই খুব সুবিধেজনক হয়েছিলো। এতোদিন মাইনের বেশির ভাগটাই সে সঞ্চয় করেছে। সে স্বভাবে মিতব্যয়ী, অপ্রয়োজনে খরচ করতে সে কোনোদিনই অভ্যস্ত নয়। কিন্তু সে অহঙ্কারী, অন্যের ঘাড়ে বসে খাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

'অ্যাংগাস আর আমি আজকাল তোমার সঙ্গে থেকে অভ্যস্ত হয়ে গেছি,' দারিয়া শান্ত সন্ধানী দৃষ্টিতে নীলের দিকে তাকালো। 'তুমি না থাকলে আমাদের খারাপ লাগবে। তোমার জন্যে আমাদের তেমন কিছু খরচ হয় না। তবে তুমি যদি স্বস্তি পাও তাহলে আমি না হয় হিসেবের খাতা দেখে বের করবো, খরচের কতোটা হেরফের হয়—সেটা তুমি আমাদের দিয়ে দিতে পারো।'

'বাড়ির মধ্যে একটা বাইরের লোককে এনে রাখা, নিশ্চয়ই খুব বিশ্রী ব্যাপার,' নীল অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জবাব দেয়।

'ওখানে থাকতে তোমার জঘন্য লাগবে। ওরা যে কি যাচ্ছেতাই খায়!'

এ কথা সত্যি, কুয়ালা সোলরে অন্য যে কোনো জায়গার চাইতে মনরোদের বাড়ির খাওয়াদাওয়া অনেক বেশি ভালো। নীল মাঝে-মধ্যে এখানে-সেখানে, এমন কি রেসিডেন্টের বাড়িতেও খেয়েছে—কিন্তু খুব একটা ভালো খানা জোটেনি। দারিয়া নিজে খেতে ভালোবাসে এবং পাচকের গুণমানের দিকে সর্বদা নজর রাখে। তার রান্না করা রাশিয়ান খাবারগুলো সত্যিই চমৎকার। ওই বাঁধাকপির সুরুয়াটার জন্যে তো অনায়াসে মাইল পাঁচেক হাঁটা যায়। কিন্তু মনরো এতোক্ষণ এ

ব্যাপারে কিছুই বলেননি। এবারে উনি বললেন, 'তুমি এখানে থাকলে আমি খুশিই হবো। তোমাকে জায়গা-মতো পাওয়া আমার পক্ষে সুবিধেজনকও বটে। কখনও কোনো ব্যাপারে কোনো সমস্যা দেখা দিলে, আমরা তক্ষুণি কথাবার্তা বলে ব্যাপারটার মীমাংসা করে ফেলতে পারি। ওয়্যারিং আর জনসন খুবই ভালো লোক। কিন্তু আমার আশঙ্কা—কিছু দূর অব্দি এগুলেই তুমি দেখতে পাবে, ওদের আওতা খানিকটা সীমায়িত।'

'এখানে থাকতে পারলে আমি খুবই খুশি হবো। ঈশ্বর জানেন, এর চাইতে ভালো কোনো ব্যবস্থা আমি আশাও করতে পারি না। আমার শুধু ভয় হচ্ছিলো, হয়তো আমি আপনাদের অসুবিধে ঘটাচ্ছি।'

পরের দিন মুষলধারে বৃষ্টি। টেনিস বা ফুটবল খেলা একেবারে অসম্ভব। তবু ছটা নাগাদ নীল বর্ষাতিটা গায়ে চাপিয়ে ক্লাবে গিয়ে হাজির হলো। ক্লাব ঘর শূন্য, শুধু রেসিডেন্ট সাহেব একটা আরাম কুর্সিতে বসে 'দ্য ফোর্টনাইটলি' পড়ছিলেন। ভদ্রলোকের নাম ট্রেভেলিয়ান, বায়বনের বন্ধুর সঙ্গে ওঁদের আত্মীয়তা আছে বলে উনি দাবী করেন। লম্বা মোটাসোটা চেহারা, মাথার সাদা চুলগুলো ছোটো করে ছাঁটা, বিশাল লাল মুখখানা ঠিক একটা কৌতুক অভিনেতার মতো। উনি অবিবাহিত, কিন্তু মেয়েদের উনি পছন্দ করেন বলে মনে করা হয় এবং নৈশ-ভোজের আগে উনি জিন পান করতে ভালোবাসেন। সুলতানের সঙ্গে বন্ধুত্বের খাতিরেই ভদ্রলোক এই পদমর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। ওঁর স্বভাবটা ঢিলেঢালা, আত্মপ্রসাদেভরা, ভীষণ বাচাল, কাজকর্ম করতে খুব একটা ভালোবাসেন না, অথচ আশা করেন প্রতিটা কাজই কোনো রকম অসুবিধে না দিয়ে মসৃণভাবে হয়ে যাবে। কাজকর্মে সুদক্ষ না হলেও এখানকার সমাজে উনি জনপ্রিয়। বেশি উৎসাহী এবং কর্মপটু না হওয়ায় জীবনটা ওঁর পক্ষে নিঃসন্দেহে বেশি স্বস্তি-দায়কই হয়েছে। নীলের দিকে তাকিয়ে উনি ঘাড় নাড়লেন।

'কিহে যুবক, দিনটা কেমন কাটছে?'

'আবহাওয়াটা উপভোগ করছি, স্যার,' গম্ভীরভাবে জবাব দিলো নীল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওয়্যারিং, জনসন এবং বিশপ নামে আরও একজন ক্লাবে এসে ঢুকলো। বিশপ একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী। নীল ব্রিজ খেলে না, তাই বিশপ রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো, 'ক্লাবে আজ লোকজন নেই, স্যার। আপনি আমাদের সঙ্গে খেলবেন?'

'বেশ,' রেসিডেন্ট অন্যদের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন, 'আমি এই প্রবন্ধটা শেষ করেই তোমাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেবো। মাত্র পাঁচ মিনিট লাগবে। তোমরা ততোক্ষণে তাস বাঁটতে শুরু করো।'

নীল এবারে ওদের তিনজনের দিকে এগিয়ে গেলো।

'ইয়ে হয়েছে, ওয়্যারিং···তোমাদের অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আমি তোমাদের ওখানে উঠে যেতে পারছি না। মনরোরা আমাকে বরাবরের মতো ওঁদের সঙ্গে থাকতে বলেছেন।'

ওয়্যারিঙের মুখটা হাসিতে ভরে উঠলো, 'ভাবো কাণ্ডখানা !'

'ভীষণ ভালো ওঁরা, তাই না ? ওঁরা এমন জোর দিয়ে বললেন যে আমি আর কথাটা ঠেলতে পারলাম না ।'

'কি বলেছিলুম তোমাকে ?' বিশপ বললো ।

'আমি ছেলেটাকে কোনো দোষ দিই না,' ওয়্যারিং জবাব দিলো ।

ওদের ভাবভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু ছিলো, যা নীলের ভালো লাগছিলো না। মনে হচ্ছিলো, ওরা যেন মজা পেয়েছে। লাল হয়ে উঠলো সে ।

'কি নিয়ে কথা বলছো তোমরা ?' চড়াসুরে জিগেস করলো নীল ।

'দ্যাখো বাপু, আমাদের দারিয়াকে আমরা চিনি ।' বিশপ বললো, 'দেখতে ভালো, বয়েস কম—এমন ছেলে তুমিই প্রথম নও, যার সঙ্গে দারিয়া একটু ঢলাঢলি করেছে। আর এ ব্যাপারটা তোমাতেই শেষ হবে না ।'

কথাগুলো শেষ হতে না হতেই নীলের মুঠিবদ্ধ হাতটা বিদ্যুতের মতো ঠিকরে উঠলো। ঘুষিটা বিশপের গালে গিয়ে পড়লো এবং সে সশব্দে লুটিয়ে পড়লো মেঝেতে। জনসন লাফিয়ে উঠে নীলকে কোমর জড়িয়ে আটকে রাখলো, কারণ নীলের তখন মাথার ঠিক নেই ।

'ছেড়ে দাও আমাকে,' নীল চিৎকার করে বললো, 'কথাটা ফিরিয়ে না নিলে আমি ওকে খুন করে ফেলবো ।'

গোলমালে চমকে উঠে রেসিডেন্ট সাহেব ওদের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তারপর সশব্দে পা ফেলে এগিয়ে গেলেন ওদের দিকে ।

'এটা কি হচ্ছে ? হচ্ছেটা কি ? কি লাগিয়েছো তোমরা ?'

ওরা তখন হতভম্ব। নিজেদের ওরা ভুলে গিয়েছিলো। রেসিডেন্ট সাহেব ওদের মনিব। জনসন নীলকে ছেড়ে দিলো, বিশপও উঠে দাঁড়ালো। রেসিডেন্ট ভুরু কুঁচকে নীলকে তীক্ষ্ম সুরে প্রশ্ন করলেন, 'এর অর্থ কি ? তুমি বিশপকে মেরেছো ?'

'হ্যাঁ, স্যার ।'

'কেন ?'

নীল তখনও রাগে ফ্যাকাশে। ক্রুদ্ধ সুরে সে বললো, 'একজন মহিলা সম্পর্কে ও কদর্য ইঙ্গিত করেছে ।'

রেসিডেন্টের চোখ দুটো ঝিলমিলিয়ে উঠলো। কিন্তু মুখের গাম্ভীর্য বজায় রেখে উনি জিগেস করলেন, 'মহিলাটি কে ?'

'এর জবাব আমি দেবো না,' মাথাটা পেছনে হেলিয়ে নীল তার আকর্ষণীয় উচ্চতাটা পুরোপুরি মেলে দাঁড়ালো ।

রেসিডেন্ট আরও দু ইঞ্চি বেশি লম্বা এবং অনেক বেশি গাট্টাগোট্টা না হলে, এটার প্রভাব অনেক বেশি হতো ।

'আহাম্মুকি কোরো না ।'

'দারিয়া মনরো,' জনসন বললো ।

'তুমি কি বলেছিলে, বিশপ ?'

'ঠিক কি কি শব্দ ব্যবহার করেছিলাম, তা আমি ভুলে গেছি। তবে এ কথা বলেছিলাম যে এখানকার অনেক যুবকের সঙ্গেই দারিয়া বিছানায় গিয়ে উঠেছে এবং আমার ধারণা ম্যাক অ্যাডামের সঙ্গেও ওই কর্মটি করার সুযোগ ও হারায়নি।'

'চরম অপমানজনক ইঙ্গিত। ক্ষমা চেয়ে হাত মেলাও। দুজনেই।'

'আমার ভীষণ চোট লেগেছে, স্যার। ওর ঘুষিতে আমার চোখটা শয়তানের চোখের মতো হয়ে উঠবে। সত্যি কথা বলার জন্যে আমি ক্ষমা চাইতে একটুও রাজি নই।'

'তোমার কথাগুলো সত্যি বলেই সেগুলো আরও বেশি অপমানজনক, এটা বোঝার মতো যথেষ্ট বয়েস তোমার হয়েছে। আর তোমার চোখের ব্যাপারটা ···শুনেছি এক টুকরো কাঁচা গোমাংস এসমস্ত ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ দেয়। তোমার ক্ষমা চাইবার ব্যাপারে আমার ইচ্ছেটাকে আমি ভদ্রতার খাতিরে অনুরোধের ভঙ্গিমায় প্রকাশ করলেও, আসলে সেটা কিন্তু আদেশ।'

এক মুহূর্ত সবাই চুপচাপ। রেসিডেন্টের মুখখানা শান্ত।

'আমি যা বলেছি, তার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি।' বিশপ বিষণ্ন সুরে বললো।

'তাহলে এবারে তুমি, ম্যাক অ্যাডাম।'

'ওকে মেরেছি বলে আমি দুঃখিত, স্যার। আমিও ক্ষমা চাইছি।'

'দুজনে হাতে হাত মেলাও।'

ওরা বিষণ্ন মুখে তা-ই করলো।

'এ কথাটা আরও ছড়াক, আমি তা চাই না। আমার ধারণা, মনরোকে আমরা সকলেই পছন্দ করি—এটা তাঁর পক্ষে প্রীতিপ্রদ হবে না। কাজেই তোমরা এ ব্যাপারে মুখ বন্ধ করে রাখবে, এ বিশ্বাস আমি রাখতে পারি কি ?'

ওরা ঘাড় নেড়ে সায় জানালো।

'তাহলে তোমরা এবারে এসো। ম্যাক অ্যাডাম, তুমি থাকো। তোমার সঙ্গে আমি একটু কথাবার্তা বলতে চাই।'

ওরা চলে যাবার পর রেসিডেন্ট কুর্সিতে বসে একটা চুরুট ধরালেন। উনি নীলকেও একটা ধরাতে বললেন, কিন্তু সে শুধু সিগারেট খায়।

'তুমি তো দেখছি একটি দাঙ্গাবাজ ছেলে,' রেসিডেন্ট মৃদু হাসলেন। 'আমার অফিসাররা এরকম একটা প্রকাশ্য জায়গায় নাটুকে কাণ্ড করবে, আমি তা চাই না।'

'মিসেস মনরো আমার বিশেষ বন্ধু। আমার প্রতি উনি এমনিতেই যথেষ্ট সদয়। ওঁর বিরুদ্ধে আমি একটি কথাও শুনতে রাজি নই।'

'তাহলে তো এখানে খুব বেশিদিন থাকলে ব্যাপারটা তোমার পক্ষে খুব কঠিন হয়ে উঠবে।'

দীর্ঘ ছিপছিপে দেহ নিয়ে নীল রেসিডেন্টের মুখোমুখি একমুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার গম্ভীর তরুণ মুখখানিতে ছলনার কোনো চিহ্ন নেই। দৃপ্তভঙ্গিতে মাথাটা পেছন দিকে এক ঝাঁকুনিতে ঠেলে দিলো সে। আবেগের আধিক্যে উচ্চারণে স্বাভাবিকের চাইতে অতিরিক্ত টান এসে গেলো তার।

'চার মাস আমি মনরোদের সঙ্গে রয়েছি। বিশ্বাস করুন, অন্তত আমাকে জড়িয়ে ওই পশুটা যা বলে গেলো তার মধ্যে এক বিন্দুও সত্যতা নেই। মিসেস মনরো আমার সঙ্গে কক্ষণো এমন কোনো ব্যবহার করেননি, যেটাকে অসঙ্গত ঘনিষ্ঠতা বলা যায়। ও'র মাথায় কোনো বদ-মতলব আছে বলে, উনি কথায় বা কাজে আমাকে কোনোদিন সামান্যতম কোনো ইঙ্গিতও দেননি। আমার সঙ্গে উনি মা বা বড়োবোনের মতো আচরণ করেছেন।'

রেসিডেন্ট বিদ্রূপভরা চোখে নীলকে লক্ষ্য করছিলেন। বললেন, 'শুনে খুবই খুশি হলাম। দীর্ঘদিন হয়ে গেলো ও'র সম্পর্কে এতো ভালো ভালো কথা শুনিনি।'

'আপনি আমার কথাগুলো বিশ্বাস করেছেন, স্যার?'

'করেছি বইকি! হয়তো তুমি ওকে শুধরে দিয়েছো।' চিৎকার করে উনি পরিচারকের উদ্দেশ্যে বললেন, 'ওহে, আমার জন্যে একটা জিন পাহিত নিয়ে এসো।' তারপর ফের নীলকে বললেন, 'ঠিক আছে। ইচ্ছে হলে তুমি এবারে যেতে পারো! কিন্তু মনে রেখো, আর মারামারি নয়। মারামারি করলেই চাকরি খতম।'

পায়ে হেঁটে নীল যখন মনরোদের বাংলোয় ফিরলো, তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। মখমলের মতো আকাশটা তারায় তারায় উজ্জ্বল। বাগানের এখানে সেখানে অসংখ্য জোনাকির অস্থির আনাগোনা। মাটির বুক থেকে একটা নির্যাসময় উষ্ণতা জেগে উঠছে। মনে হয় থমকে দাঁড়ালে বুঝি প্রাচুর্যভরা গাছগাছালির বেড়ে ওঠার শব্দও শোনা যাবে। রাতের একটা সাদা রঙের ফুল এক আশ্চর্য ঝিম-ধরানো সুগন্ধ ছড়াচ্ছে চতুর্দিকে। বারান্দায় বসে মনরো কতকগুলো তথ্য টাইপ করে নিচ্ছিলেন। আর দারিয়া একটা লম্বা কুর্সিতে টানটান হয়ে শুয়ে কি যেন পড়ছিলো। ওর ধূপছায়া রঙের চুলগুলোর পেছনে আলোটা ঝলমল করছিলো একটা জ্যোতির্বলয়ের মতো। নীলের দিকে ও চোখ তুলে তাকালো, তারপর বইটা রেখে মৃদু হাসলো। ভারি বন্ধুত্বময় ওর হাসিটা।

'কোথায় গিয়েছিলে, নীল?'

'ক্লাবে।'

'কেউ ছিলো ওখানে?'

দৃশ্যটা এতো ঘরোয়া আর স্নিগ্ধ-স্বাচ্ছন্দ্যভরা, দারিয়ার ভাবভঙ্গি এতো শান্ত আর পরম নিশ্চিন্ত যে তা মনকে স্পর্শ করবেই। ওই যে দুজন—যে যার কাজে ব্যস্ত—ও'রা এতো ঘনিষ্ঠ, ও'দের অন্তরঙ্গতা এতো স্বাভাবিক যে কেউ ভাবতেই পারবে না, ও'রা পরস্পরকে নিয়ে সম্পূর্ণ সুখী নয়। রেসিডেন্টের ইঙ্গিত

এবং বিশপ যা বলেছে, তার একটি বর্ণও নীল বিশ্বাস করেনি। নীল জানে, তার নিজের সম্পর্কে ওরা যে সন্দেহ করেছে সেটা আসলে সত্যি নয়। কাজেই বাকিটা সত্যি বলে মনে করার কি এমন কারণ থাকতে পারে? ওদের মন নোংরা—প্রত্যেকেরই তাই। নিজেরা একপাল শুয়োর বলে ওরা সবাইকেই নিজেদের মতো খারাপ বলে মনে করে। নীলের আঙুলের গাঁটগুলোতে সামান্য ব্যথা হচ্ছিলো। বিশপকে মেরেছে বলে আনন্দ হচ্ছিলো তার। ওই নোংরা কাহিনীটা কে প্রথম চালু করেছিলো, সেটা তার জানতে ইচ্ছে করছিলো। জানতে পারলে তার ঘাড়টা সে মটকে দিতো।

কিন্তু ইতিমধ্যে মনরো তাদের বহু আলোচিত অভিযানের দিনক্ষণ স্থির করে ফেলেছেন এবং নিজের স্বভাবসুলভ সতর্কতায় তার প্রস্তুতিপর্বও শুরু করে দিয়েছেন, যাতে শেষ মুহূর্তে কোনো ভুল হয়ে না যায়। ওঁদের পরিকল্পনাটা হলো, যতোদূর পর্যন্ত সম্ভব নদীপথে গিয়ে ওঁরা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ করে এগুবেন এবং স্বল্প পরিচিত মাউন্ট হিতমে গিয়ে নমুনা সংগ্রহের জন্যে অনুসন্ধান চালাবেন। সম্ভবত দুমাস ওঁদের বাইরে থাকতে হবে। যাত্রার দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনরোর উৎসাহও বেড়ে ওঠে। যদিও উনি মুখে বেশি কিছু বলেন না, শান্ত আর সংযত হয়েই থাকেন—কিন্তু ওঁর চোখের দীপ্তি আর প্রতিটি পদক্ষেপের উচ্ছল উদ্দীপনাতেই বোঝা যায় কতো গভীর আগ্রহ নিয়ে উনি ওই বিশেষ দিনটির প্রতীক্ষা করছেন। একদিন সকালবেলা যাদুঘরে উনি তো প্রায় উৎফুল্লই হয়ে উঠলেন! গবেষণাগারে একটা পরীক্ষা চালাতে চালাতে আচমকা নীলকে বললেন, 'তোমার জন্যে একটা সুখবর আছে হে। দারিয়া আমাদের সঙ্গে আসছে।'

'তাই নাকি? দারুণ খবর!' নীল ভীষণ খুশি হয়ে উঠলো। 'পুরো ব্যাপারটা এবারে নিখুঁত হলো।'

'এই প্রথম আমি ওকে আমার সঙ্গে যাবার জন্যে রাজি করাতে পারলাম। কতো বলেছি, গেলে ওর ভালো লাগবে! কিন্তু ও কোনোদিনও আমার কথায় কান দেয়নি। মেয়েরা এক অদ্ভুত জাত। আমি তো আশা-ভরসা ছেড়েই দিয়েছিলাম, এবারে ওকে যাবার কথা জিগেস করবো বলেও ভাবিনি। অথচ গতকাল রাতে হঠাৎ, একেবারে আচমকা বলে বসলো, ও আমাদের সঙ্গে যেতে চায়।'

'আমি ভীষণ খুশি হয়েছি,' নীল বললো।

'ওকে এতোদিন একা একা এখানে রেখে যাবার ব্যাপারটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছিলো না। এবারে আমরা যতোদিন খুশি বাইরে থাকতে পারবো।'

একদিন খুব ভোরে মালয়ী মাঝিমাল্লায় টানা চারটে প্রাহু নিয়ে ওরা রওনা হলো। দলে ওরা ছাড়া ওদের চাকরবাকর আর চারজন ডায়াক শিকারী। ছইয়ের নিচে পাশাপাশি তিনটে গদিতে ওরা তিনজন। অন্য নৌকোগুলোতে চীনে চাকরবাকর আর শিকারী ডায়াকরা। ওদের সঙ্গে পুরো দলটার জন্যে চালের বস্তা, নিজেদের খাবারদাবার, পোশাক-আশাক, বই আর ওদের কাজের জন্যে

প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র। সভ্যতাকে পেছনে ফেলে রেখে যেতে কি যে স্বর্গীয় আনন্দ! ওরা তিনজনেই উত্তেজিত। ওরা কথা বলে, ধূমপান করে, বই পড়ে। নদীর দুলুনি ভারি আরামদায়ক। ঘাসে ঢাকা একটা তীরভূমিতে বসে ওরা দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে নেয়। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে, রাতের মতো নোঙর ফেলা হয়। একটা লম্বামতো বাড়িতে রাত কাটায় ওরা। ওদের আগমন উপলক্ষে আরক, বক্তৃতা এবং অদ্ভুত নাচ সহযোগে উৎসব পালন করে ডায়াক গৃহস্বামীরা। পরের দিন নদীপথ আরও সংকীর্ণ হয়ে ওঠে। ওরা স্পষ্টই অনুভব করে, অজানার দিকে এগিয়ে চলেছে ওদের অভিযান। পেছন থেকে ভিড়ের ধাক্কায় ঠিকরে আসা উত্তেজিত জনতার মতো নদীর তীরে তীরে জলের ধার ঘেঁষে জড়ো হয়ে থাকা অদ্ভুত ধরনের গাছগাছালি দেখে বিহ্বল আনন্দে নীলের যেন শ্বাসরোধ হয়ে ওঠে। কি আশ্চর্য, কি পরম আনন্দ! তৃতীয় দিনে নদীর বুক অগভীর এবং স্রোত প্রবলতর হয়ে ওঠায় ওদের আরও হালকা ধরনের নৌকোয় চাপতে হলো। কিন্তু দেখতে দেখতে স্রোত এতো তীব্র হয়ে উঠলো যে মাঝিরা আর দাঁড় বাইতে পারে না, অপূর্ব শক্তিদীপ্ত ভঙ্গিমায় ওরা তখন লগি মেরে স্রোতের বিরুদ্ধে নৌকো নিয়ে এগুতে লাগলো। মাঝে মাঝেই প্রপাতের কাছে এসে পড়ায় ওদের নৌকো থেকে নেমে, মালপত্র নামিয়ে, সংকীর্ণ পাথুরে পথ দিয়ে নৌকোগুলোকে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছিলো। পাঁচদিন বাদে ওরা এমন একটা জায়গায় গিয়ে হাজির হলো, যেখান থেকে আর এগুনো যায় না। ওখানে একটা সরকারী বাংলো ছিলো, কয়েক রাতের জন্যে ওরা সেখানেই স্থিতু হলো। মনরো তার মধ্যেই আরও ভেতরের দিকে অভিযান চালাবার জন্যে প্রস্তুতি সেরে ফেলতে লাগলেন। উনি মালপত্র বইবার জন্যে কয়েকজন কুলী আর মাউন্ট হিতমে পৌঁছে একটা আস্তানা তৈরি করার জন্যে কয়েকজন কারিগর খুঁজছিলেন। এ ব্যাপারে গাঁয়ের মোড়লের সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন। মোড়ল আসবে বলে অপেক্ষায় না থেকে তিনি নিজে মোড়লের সঙ্গে দেখা করতে গেলে কিছুটা সময় বাঁচবে ভেবে, পরদিন খুব ভোরে মনরো একজন পথপ্রদর্শক আর কয়েকজন ডায়াককে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। ওঁর ধারণা, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই উনি ফিরে আসবেন। ওঁকে বিদায় জানিয়ে নীল একটু স্নান করে নেবার কথা ভাবলো। বাংলোর একটু দূরেই নদীতে স্নান করার মতো একটা শান্ত নিস্তরঙ্গ জায়গা আছে। ওখানকার জল এতো স্বচ্ছ যে তলায় বালুর প্রতিটা কণা স্পষ্ট দেখা যায়। ওখানে নদীটা এতো সংকীর্ণ যে দুধারের গাছগাছালি নদীর ওপরে যেন খিলান গড়ে তুলেছে। জায়গাটা নীলকে স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন নদীতে এই ধরনের দহের কথা মনে করিয়ে দেয়, যে সমস্ত জায়গায় সে বালক বয়সে স্নান করেছে। অথচ এই দুয়ের মধ্যে কি আশ্চর্য প্রভেদ! এখানকার পরিবেশে ছড়িয়ে আছে এক মধুর রোম্যান্স, মনে হয় এখানকার প্রকৃতি যেন কুমারী—এটা তার সমস্ত সত্তাকে এমন এক অনুভূতিতে ভরিয়ে তোলে যা তার পক্ষে বিশ্লেষণ করা শক্ত। চেষ্টা সে অবশ্যই করেছে, কিন্তু তার চাইতে অনেক প্রাচীন পাকা মস্তিষ্কও

সুখকে কেটেছিঁড়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছে। নদীর ওপরে ঝুঁকে পড়া একটা ডালে একটা মাছরাঙা বসেছিলো, তার নিবিড় নীল শরীর ঠিক তেমনি নিটোল নীলা হয়ে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিলো নদীর স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জলে। সারং আর বাজুটা খুলে নীল গুটিগুটি জলে গিয়ে নামতেই পাখিটা যেন জড়োয়ার ডানায় ঝিকমিকে ঝিলিক তুলে উড়ে চলে গেলো। জলটা টাটকা, কিন্তু ঠাণ্ডা নয়। নীল ইচ্ছেমতো উলটে পালটে নদীর জলে ঝাঁপাঝাঁপি করতে লাগলো। নিজের বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিটি চঞ্চল আন্দোলন উপভোগ করছিলো সে। জলের মধ্যে ভাসতে ভাসতে সে পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেওয়া নীল আকাশের দিকে তাকালো, দেখলো জলের বুকে এখান সেখানে ভেসে চলা আকাশের সূর্যটাকে। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সে।

'তোমার শরীরটা কি ফর্সা, নীল!'

ঝট করে দম নিয়ে নীল ডুব দিলো। তারপর মুখ ফিরিয়ে দেখলো, দারিয়া তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'ইয়ে…আমার পরনে কিন্তু কিচ্ছুটি নেই।'

'তাই তো দেখলাম। কিছু না পরে স্নান করতে অনেক সুখ। একটু দাঁড়াও, আমিও নামছি। জায়গাটা ভারি সুন্দর।'

দারিয়ার পরনেও সারং আর বাজু। নীল দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিলো, কারণ সে দেখলো দারিয়া পোশাক খুলে ফেলছে। জলে ওর ঝাঁপ দেবার শব্দ শুনতে পেলো সে। হাতের দু-তিনটে টানে নীল কিছুটা এগিয়ে গেলো, যাতে তার কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে থেকেও দারিয়া সাঁতার কাটার মতো যথেষ্ট জায়গা পায়। কিন্তু দারিয়া তার কাছেই এগিয়ে এলো।

'শরীরে জলের স্পর্শটা কি অপূর্ব, তাই না?'

দারিয়া হাসতে হাসতে নীলের মুখে জল ছিটিয়ে দিলো। নীল এতো বিব্রত বোধ করছিলো যে বুঝতে পারছিলো না কোন্ দিকে তাকাবে। দারিয়া যে সম্পূর্ণ নগ্ন তা ওই স্বচ্ছ জলে দেখতে না পাওয়া অসম্ভব। এখন পরিস্থিতি অবিশ্যি ততোটা খারাপ নয়, কিন্তু জল থেকে ওঠা যে কতোটা কঠিন হয়ে উঠবে তা নীল চিন্তা না করে পারছিলো না। অথচ দারিয়া যেন দিব্যি আনন্দে সময়টা কাটাচ্ছে!

'চুল ভিজলেও আমার কিছু এসে যায় না,' বললো ও।

চিৎ হয়ে শুয়ে বলিষ্ঠ বাহুর টানে জল সরিয়ে সরিয়ে, গোটা অঞ্চলটাতে সাঁতার কেটে কেটে ঘুরে বেড়াতে লাগলো দারিয়া। নীল ভাবলো, দারিয়া যখন জল থেকে উঠতে চাইবে, সে তখন ওর দিকে পেছন ফিরে থাকবে এবং ও পোশাক টোশাক পরে চলে যাবার পর সে জল থেকে উঠবে। পরিস্থিতিটা যে লজ্জাজনক সে সম্পর্কে দারিয়া যেন সম্পূর্ণ অচেতন। ওর এ ধরনের আচরণ সত্যিই খানিকটা বিচার-বুদ্ধিহীনের মতো। ও এমনভাবে নীলের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে যেন ওরা শুকনো ডাঙায় ঠিকমতো পোশাক-আশাক পরা অবস্থায় রয়েছে। এমন

কি কথা বলার জন্যে নিজের দিকে নীলের দৃষ্টি আকর্ষণও করছে ও।

'আমার চুলগুলো কি বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে? আসলে চুলগুলো এতো পাতলা যে ভিজলেই দেখতে ইঁদুরের লেজের মতো হয়ে যায়। তুমি আমার কাঁধের তলাটা একটু ধরো তো, আমি ততোক্ষণে চুলটা একটু জড়িয়ে নেবার চেষ্টা করি।'

'ঠিকই তো আছে,' নীল বললো, 'এখন বরং ওভাবেই থাকতে দাও।'

'আমার ভীষণ খিদে পাচ্ছে,' একটু পরেই দারিয়া বললো। 'সকালের জল-খাবার খাবে না?'

'তুমি আগে উঠে পোশাক পরে নাও। আমি এক মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

'বেশ।'

দু বার হাত চালিয়েই দারিয়া তীরের কাছে পৌঁছে গেলো। নীল লাজুক ভঙ্গিমায় অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো, যাতে দারিয়ার নগ্ন অবস্থায় জল থেকে ওঠার দৃশ্য তাকে দেখতে না হয়।

'উঠতে পারছি না,' দারিয়া চিৎকার করে বললো, 'আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে।'

জলে নামাটা যথেষ্ট সহজ ছিলো। কিন্তু নদীর পাড়টা জলের দিকে ঝুঁকে রয়েছে বলে গাছের ডাল ধরে নিজেকে টেনে ওপরে তুলতে হয়।

'আমি পারবো না। আমার শরীরে সুতোর নামগন্ধও নেই।'

'তা আমি জানি। অমন গোঁড়া স্কচ হয়ো না তো! পাড়ে উঠে আমার দিকে হাতটা এগিয়ে দাও।'

ছাড়া পাবার কোনো উপায় নেই। নীল এক ঝটকায় তীরে উঠে ওকেও টেনে তুললো। নীলের সারঙের পাশেই নিজেরটা ছেড়ে রেখেছিলো দারিয়া। নির্বিকার-ভাবে সেটা তুলে নিয়ে, ও সেটা দিয়েই গা মুছতে শুরু করলো। নীলেরও তাছাড়া আর কিছু করার ছিলো না, তবু শোভনতার খাতিরে সে দারিয়ার দিকে পেছন ফিরে রইলো।

'তোমার চামড়াটা সত্যিই ভারি সুন্দর!' দারিয়া বললো, 'মেয়েদের মতো মসৃণ আর ফর্সা। এমন একটা পুরুষালি চেহারায় অমন চামড়া দেখতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। বুকে একটাও চুল নেই।'

সারঙটা কোমরে জড়িয়ে, নীল বাজুটা তার গায়ে গলিয়ে নিলো।

'তোমার হলো?'

প্রাতরাশে দারিয়া পরিজ, ডিম আর বেকন, ঠাণ্ডা মাংস আর মার্মালেডের ব্যবস্থা করেছিলো। নীলের মুখটা একটু গোমড়া। দারিয়া সত্যি বড়ো বেশি পরিমাণে রাশিয়ান। কি যে বোকার মতো কাণ্ড করে ও! অবিশ্যি ওতে অন্যায় কিছু ছিলো না, কিন্তু ঠিক ওই ধরনের ব্যাপারগুলোর জন্যেই লোকে ওর সম্পর্কে আজেবাজে কথা ভাবে আর তাই বলে। সব চাইতে বিশ্রী ব্যাপার হলো, এ ব্যাপারে ওকে কোনো ইঙ্গিতও দেওয়া যায় না। তাহলে ও স্রেফ হাসবে, উপহাস করবে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, কুয়ালা সোলরের ওই লোকগুলোর মধ্যে

আজ কেউ যদি ওদের দুজনকে অমন উদোম হয়ে স্নান করতে দেখতো, তাহলে তাকে কিছুতেই বোঝানো যেতো না যে ওদের মধ্যে অনুচিত কোনো ঘটনা ঘটেনি। নিজস্ব বিচক্ষণতায় নীল নিজের কাছেও স্বীকার করে যে সেক্ষেত্রে ওদের কোনো দোষ দেওয়া যেতো না। দারিয়ার ভীষণ অন্যায়। একটা লোককে এমন অবস্থায় ফেলার কোনো অধিকার ওর নেই। নিজেকে এমন আকাটের মতো লাগছিলো তার! যাই বলা যাক না কেন, ব্যাপারটা সত্যিই অশোভন।

পরদিন সকালে কুলিরা পিঠে মালের বোঝা নিয়ে, একজনের পরে একজন করে একটা দীর্ঘ সারি বেঁধে মিছিল করে রওনা হাবার পর, চাকরবাকর পথ-প্রদর্শক আর শিকারীদের নিয়ে ওরাও বেরিয়ে পড়লো। পাহাড়ের পায়ের কাছ দিয়ে লম্বা লম্বা ঘাস আর ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে চলে গেছে পথটা। মাঝে মাঝেই এক একটা সঙ্কীর্ণ জলপ্রবাহ, বাঁশের সাঁকো দিয়ে সেগুলোকে পেরিয়ে যেতে হয়। আকাশ থেকে সূর্যটা হিংস্র তেজ ছড়াচ্ছিলো ওদের ওপরে, বিকেলবেলা একটা বাঁশবনের ছায়ায় পেঁছে ওরা সেই প্রখর দীপ্তি থেকে রক্ষা পেলো। ভেতরের সবুজ আলোটা যেন সমুদ্রতলের আলোর মতো। ছিপছিপে তনু-সৌষ্ঠব নিয়ে বাঁশগুলো অবিশ্বাস্য উচ্চতায় উঠে গেছে। অবশেষে ওরা এক আদিম অরণ্যে গিয়ে পেঁছলো। প্রাচুর্যময় দুরন্ত লতাগুলো জড়িয়ে রেখেছে বিশাল বিশাল বনস্পতিকে—সর্বত্র দুর্ভেদ্য এক জটলা। এক বিস্ময় জড়ানো আতঙ্ক নেমে এলো ওদের সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে। অনন্ত গোধূলির রাজ্যে ঝোপঝাড় কেটে পথ করতে করতে এগুতে হচ্ছিলো ওদের। শুধু মাঝে মধ্যে ঘন পত্রালির ফাঁক-ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো এক এক ঝলক রোদ। কোথাও কোনো মানুষ বা কোনো জীবজন্তু ওবা দেখতে পায়নি। কারণ অরণ্যের অধিবাসীরা স্বভাবে লাজুক, প্রথম পদশব্দটা শোনা মাত্রই তারা দৃষ্টিপথ থেকে উধাও হয়ে যায়। লম্বা লম্বা গাছগুলোর অনেক উঁচুতে ওরা পাখির কাকলি শুনেছে, কিন্তু ঝোপ-ঝাড় দিয়ে উড়ে যাওয়া কিংবা বুনো ফুলের সঙ্গে মধুর আলাপে ব্যস্ত সানবার্ড ছাড়া অন্য কোনো পাখি ওদের নজরে আসেনি।

অবশেষে ওরা রাতের মতো থামলো। কুলিরা গাছের ডালপালা বিছিয়ে, তার ওপরে জলরোধক চাদর বিছিয়ে দিলো। চীনে-পাচক রাতের খানা তৈরি করে দিলো। তারপর শুয়ে পড়লো সবাই।

নীল এর আগে কখনও অরণ্যে রাত কাটায়নি। সে ঘুমোতে পারছিলো না। চতুর্দিকে নিবিড় ঘন অন্ধকার। অসংখ্য পতঙ্গের গুঞ্জন কানে যেন তালা ধরিয়ে দেয়। কিন্তু কোনো বড়ো শহরে যানবাহনের গর্জনের মতো শব্দটা এমনই অবিশ্রান্ত যে সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা যেন এক দুর্ভেদ্য নীরবতা হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে আচমকা সাপের কবলে পড়া বানরের আর্তনাদ কিংবা রাত-জাগা পাখির তীক্ষ্ন চিৎকারে নীলের প্রাণ আতঙ্কে উড়ে যাবার উপক্রম করছিলো। একটা রহস্যময় অনুভূতি হচ্ছিলো তার—মনে হচ্ছিলো চতুর্দিক থেকে অসংখ্য প্রাণী যেন তাকে লক্ষ্য করছে। শিবিরের অগ্নিকুণ্ডগুলোর ওধারে আদিম সংগ্রাম

আর এধারে ডালপালার বিছানায় ভয়ঙ্করী প্রকৃতির মুখোমুখি ওরা তিনজন। প্রতিরোধহীন আর নিঃসঙ্গ। নীলের পাশে মনরো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, শান্তলয়ে নিঃশ্বাস বইছে তাঁর।

'তুমি জেগে আছো, নীল ?' দারিয়া অস্ফুটে প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ। কেন, কি হয়েছে ?'

'আমার ভয় করছে।'

'সব ঠিক আছে। ভয়ের কিছু নেই।'

'কি ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা ! মনে হচ্ছে, না এলেই ভালো হতো।'

একটা সিগারেট ধরালো ও।

নীল শেষ অব্দি ঘুমিয়ে পড়লো, ঘুম ভাঙলো কাঠঠোকরার খটখট আওয়াজে। এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে যেতে যেতে পাখিটা যেন আত্মপ্রসাদের হাসিতে অলস মানুষগুলোকে বিদ্রূপ করছিলো। দ্রুত প্রাতরাশ সেরে নিয়ে অভিযাত্রীদল আবার যাত্রা শুরু করলো। গিবনগুলো এক ডাল থেকে আর এক ডালে দোল খেতে খেতে গাছের পাতা থেকে গায়ে ভোরের শিশির মাখছিলো। ওদের অদ্ভুত চিৎকার যেন অনেকটা পাখির ডাকের মতো। ভোরের আলো দারিয়ার মন থেকে আতঙ্ক দূর করে দিয়েছিলো। একটা নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েও এখন ও দিব্যি চটপটে আর খুশিয়াল। পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলো সকলে। বিকেলবেলা ওরা যেখানে গিয়ে পেঁছিলো, পথপ্রদর্শকদের মতে সেটা শিবির করার পক্ষে ভালো জায়গা। মনরো সেখানেই একটা বাড়ি তৈরি করে নেবেন বলে স্থির করলেন। লম্বা লম্বা ছুরি দিয়ে তালপাতা আর চারাগাছ কেটে, সঙ্গের লোকগুলো দেখতে দেখতে মাটি থেকে খানিকটা উঁচুতে দু-কামরার একটা কুটির তৈরি করে ফেললো। ছিমছাম, সতেজ আর সবুজ রঙের কুটির। গন্ধটাও সুন্দর।

মনরোরা দুজনেই যে কোনো জায়গায় নিজেদের দিব্যি মানিয়ে নিতে পারেন। অ্যাংগাস তা পারেন নিজের পুরনো অভ্যেসের ফলে। আর দারিয়া তো বেশ কয়েক বছর সারারাজ্য ঘুরে বেড়িয়েছে—যে কোনো জায়গায় নিজের আরামের ব্যবস্থা করে নেবার মতো একটা অদ্ভুত বেড়ালসুলভ দক্ষতা আছে ওর। একদিনের মধ্যেই ও'রা সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে স্থিতু হয়ে বসলেন। প্রতিদিন একই কর্মসূচি ও'দের। প্রতিদিন সকালে নীল আর মনরো নমুনা সংগ্রহের জন্যে আলাদা আলাদাভাবে বেরিয়ে পড়েন। বিকেলটা কেটে যায় পতঙ্গগুলোকে আলপিন দিয়ে বাক্সে গেঁথে রাখা, প্রজাপতিগুলোকে কাগজের ভাঁজে রাখা আর পাখিগুলোর ছাল ছাড়ানোর কাজে। সন্ধ্যে হলে ওরা মথ ধরে। দারিয়া ঘরদোর আর চাকরবাকরদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে—সেলাই করে, বই পড়ে আর অজস্র সিগারেট খায়। ভারি মনোরমভাবে কেটে যায় দিনগুলো। একঘেয়ে, কিন্তু ঘটনাবহুল। নীলের মহা আনন্দ। চতুর্দিকের পাহাড়গুলোতে সে অভিযান চালায়। একদিন একটা নতুন ধরনের পতঙ্গ আবিষ্কার করে সে কি গর্ব তার! মনরো ওটার নাম দিলেন কিউনিকুলিনা ম্যাক অ্যাডামি। এরই নাম সম্মান।

নীল বুঝতে পারে (বাইশ বছর বয়সে), তার জীবন বৃথা নয়। কিন্তু আর একদিন একটুর জন্যে সে ভাইপারের ছোবল খেতে খেতে বেঁচে গেলো। গায়ের রঙ সবুজ বলে ভাইপারটাকে সে দেখতেই পায়নি। সঙ্গের ডায়াক শিকারীটা ভাগ্যিস তাকে সাবধান করে দিয়েছিলো, নয়তো সে সাপটার গায়ে গিয়েই পড়তো। সাপটাকে ওরা মেরে শিবিরে নিয়ে এসেছিলো। দারিয়া সেটাকে দেখে একেবারে শিউরে উঠেছিলো। জঙ্গলের বন্যপ্রাণী সম্পর্কে ওর ভীষণ ভয়। হারিয়ে যাবার ভয়ে শিবির থেকে ও কয়েক গজের চাইতে বেশি দূরে কক্ষণো যায় না।

একদিন সন্ধ্যায় রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে ওরা চুপচাপ বসেছিলো। হঠাৎ দারিয়া নীলকে বললো, 'অ্যাংগাস একবার কিভাবে হারিয়ে গিয়েছিলো, তোমাকে বলেছে ?'

'অভিজ্ঞতাটা তেমন প্রীতিপ্রদ নয়,' অ্যাংগাস মৃদু হাসলেন।

'ওকে ঘটনাটা বলো, অ্যাংগাস।'

মনরো সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠলেন। ঘটনাটা তার মনে করতে ইচ্ছে হয় না।

'কয়েক বছর আগেকার কথা। প্রজাপতি ধরার জালটা নিয়ে বেরিয়েছি। ভাগ্য খুবই ভালো, এমন কতকগুলো দুর্লভ নমুনা পেলাম যেগুলোকে আমি দীর্ঘদিন ধরে খুঁজছিলাম। খানিকক্ষণ বাদে মনে হলো খিদে পাচ্ছে, তাই পেছনে ফিরলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ চলার পর বুঝলাম, আমি আমার চেনাজানা পথ থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছি। হঠাৎ একটা খালি দেশলাইয়ের বাক্স চোখে পড়লো! ফেরার পথে চলতে শুরু করেই আমি ওটা ফেলে দিয়েছিলাম। তার মানে এতোক্ষণ ধরে আমি একটা বৃত্তাকার পথে হাঁটছিলাম এবং এখন যেখানে রয়েছি, এক ঘন্টা আগে ঠিক সেখানেই ছিলাম। ব্যাপারটাতে আমি আদৌ খুশি হলাম না। তবু চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফের চলতে শুরু করলাম। ভয়ঙ্কর গরম, সমস্ত শরীর দিয়ে একেবারে টপটপ করে ঘাম ঝরছে। শিবির কোন্ দিকে সেটা আমার মোটামুটি খেয়াল ছিলো। পথের চিহ্নগুলো খুঁজে খুঁজে বুঝতে চেষ্টা করছিলাম, আমি সঠিক পথে চলেছি কি না। মনে হলো দু-একটা তেমন চিহ্ন দেখতেও পেলাম—তাই আশায় বুক বেঁধে এগিয়ে চললাম। প্রচণ্ড তেষ্টা পাচ্ছিলো। চিহ্ন হিসেবে গুঁজে রাখা খোঁটা আর পরিচিত গাছপালার ভেতর দিয়ে দেখে দেখে হাঁটছি তো হেঁটেই চলেছি। কিন্তু হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমি হারিয়ে গেছি। ঠিক পথে গেলে এতোক্ষণে আমার শিবিরে পেঁছে যাবার কথা। ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। জানতাম আমাকে মাথা ঠিক রাখতে হবে—তাই এক জায়গায় বসে পরিস্থিতিটা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। জল তেষ্টায় ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো। দুপুর পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ, আর তিন চার ঘন্টার মধ্যেই চারদিক অন্ধকার হয়ে যাবে। জঙ্গলের মধ্যে রাত কাটাবার কথা ভাবতে আমার একটুও ভালো লাগছিলো না। একমাত্র যে কথাটা আমার মাথায় আসছিলো তা হলো, একটা জলপ্রবাহ খুঁজে বের করতে হবে। সেটাকে অনুসরণ করলে আমি যখনই হোক

নদীর কাছে গিয়ে পেঁছিতে পারবো। কিন্তু তাতে বেশ কয়েক দিন সময় লেগে যেতে পারে। এ ধরনের একটা বোকামো করে ফেলার জন্যে আমি নিজেকে প্রাণ ভরে গালাগাল দিচ্ছিলাম। কিছুই করার নেই, তাই ফের হাঁটতে শুরু করলাম। আর যাই হোক, জলের সন্ধান পেলে তেষ্টাটা অন্তত মেটানো যেতো। কিন্তু কোথাও একটা তিরতিরে নালারও সন্ধান পেলাম না। জানতাম, জঙ্গলে প্রচুর জন্তু-জানোয়ার আছে—হঠাৎ যদি একটা গণ্ডারের সামনে গিয়ে পড়ি, তাহলেই সব শেষ। সব চাইতে পাগল-করা জিনিস হচ্ছে, আমি জানতাম শিবির থেকে আমার দূরত্ব দশ মাইলের বেশি হতে পারে না। জোর করে আমাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হচ্ছিলো। ওদিকে দিন ফুরিয়ে আসছে, জঙ্গলের ভেতর দিকে তখনই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সঙ্গে একটা বন্দুক আনলেও গুলির আওয়াজ করতে পারতাম। শিবিরে সবাই এতোক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে আমি হারিয়ে গেছি, ওরা নিশ্চয়ই খুঁজছে আমাকে। আগাছাগুলো এতো ঘন যে আমি তার ভেতর দিয়ে ছ ফুট দূরের জিনিসও দেখতে পাচ্ছিলাম না। ভয়ে কিনা জানি না, হঠাৎ আমার কেমন যেন মনে হতে লাগলো. একটা জন্তু চুপিসাড়ে আমার পাশাপাশি হাঁটছে। আমি থামলে সে-ও থামে, আবার আমি হাঁটতে শুরু করলে সে-ও এগোয়। জন্তুটাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না—ঝোপঝাড়ের কোনো আন্দোলন আমার চোখে পড়েনি, এমনকি ডালপালা ভাঙার আওয়াজ বা পাতার সঙ্গে কোনো দেহের ঘষটানির শব্দও আমি শুনতে পাইনি। কিন্তু আমি জানতাম বনের পশুরা কতো নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারে। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা তখন এতো জোরে আঘাত করছিলো যে মনে হচ্ছিলো বুকটা বুঝি ফেটে যাবে। সবটুকু আত্মসংযম প্রয়োগ করেছিলাম বলেই আমি তখন ছুটে পালাবার বাসনাটাকে চেপে রাখতে পেরেছিলাম। আমি জানতাম ছুটলেই আমার দফা রফা হয়ে যাবে। বিশ গজ যাবার আগেই শিকড়বাকড়ের জটলায় পা বেঁধে আমি পড়ে যাবো আর সঙ্গে সঙ্গে ওই জন্তুটা আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাছাড়া ছুটতে শুরু করলে আমি যে কোথায় গিয়ে পেঁছিবো তা ঈশ্বরই জানেন। মিতব্যয়ীর মতো আমাকে শক্তি খরচ করতে হচ্ছিলো। ভীষণ কান্না পাচ্ছিলো। তার ওপরে সেই অসহ্য তেষ্টা। অমন ভয় আমি জীবনেও পাইনি। বিশ্বাস করো, সঙ্গে রিভলভার থাকলে আমি হয়তো নিজের মাথাতেই গুলি চালিয়ে ঘিলু উড়িয়ে দিতাম। এমন অবসন্ন হয়ে উঠেছিলাম যে আর টলতে টলতেও যেন এগুতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিলো আমার পরম শত্রুকেও যেন এমন মর্মান্তিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না হয়। হঠাৎ দুটো গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন একেবারে থেমে গেলো। ওরা আমাকে খুঁজছে! সেই মুহূর্তে আমি সমস্ত চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেললাম, প্রাণপণে চিৎকার করতে করতে আমি ওই শব্দটাকে লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে পড়ে যাচ্ছি, ফের উঠে আবার ছুটছি। চিৎকার করতে করতে মনে হচ্ছিলো ফুসফুস দুটো বোধহয় ফেটে যাবে। ফের একটা গুলির শব্দ, এবারে আরও কাছে। আমি ফের চিৎকার করে উঠলাম—জবাবে ওদের চিৎকারও শুনতে

পেলাম। আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কতকগুলো লোক হুড়োহুড়ি করে এগিয়ে এলো। এক মিনিটের মধ্যেই দেখি, ডায়াক শিকারীরা আমাকে ঘিরে ধরেছে। ওরা আমার হাত দুটোকে জড়িয়ে ধরলো, হাতে চুমু খেলো, হাসলো, কাঁদলো। আমারও তখন প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা। আমি ক্লান্ত, অবসন্ন। ওরা আমাকে জল দিলো। শিবির থেকে আমরা তখন মাত্র তিন মাইল দূরে। যখন ফিরলাম, চতুর্দিকে তখন নিকষ কালো অন্ধকার। ওঃ ঈশ্বর, সে একেবারে মরতে মরতে ফিরে আসা!'

দারিয়ার সমস্ত শরীর দিয়ে একটা শিহরণ ছুটে গেলো।

'বিশ্বাস করো, আমি আর কোনোদিনও জঙ্গলে হারিয়ে যেতে চাই না।'

'ওরা তোমাকে খুঁজে না পেলে, কি হতো?'

'পাগল হয়ে যেতাম। সাপে না কাটলে বা গণ্ডারে তাড়া না করলে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়া অব্দি নিশ্চয়ই শুধু অন্ধের মতো হাঁটতাম। না খেয়ে মারা পড়তাম। তেষ্টায় মরতাম। বুনো জন্তুরা আমার দেহটাকে খেয়ে ফেলতো আর পিঁপড়েরা সাফ করে দিতো আমার হাড়গুলোকে।'

মাউন্ট হিতমে প্রায় এক মাস কাটাবার পর, মনরো নীলকে নিয়মিত কুইনিন খাওয়ানো সত্ত্বেও, নীল জ্বরে পড়লো। তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়, কিন্তু তাকে বিছানা নিতে হলো। দারিয়া তার সেবা শুশ্রূষা করে। ওকে এতো কষ্ট দিতে নীলের লজ্জা হয়, কিন্তু দারিয়া তার কোনো প্রতিবাদই কানে তোলে না। এসমস্ত কাজে দারিয়া অবশ্যই খুব দক্ষ। চীনে চাকরগুলো যে কাজ করে দিতে পারে, সেগুলোও ওর হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় নীল। সে মুগ্ধ হয়ে যায়। তার কাজ করার জন্যে দারিয়া সর্বক্ষণ যেন তটস্থ হয়ে অপেক্ষা করে। জ্বর খুব বাড়লে ঠাণ্ডা জল দিয়ে তার সর্বাঙ্গ মুছিয়ে দেয়। আরামটা যদিও অবর্ণনীয়, তবু নীল তাতে প্রচণ্ড বিব্রত বোধ করে। রাতে আর সকালে—দুবার করে তার গা মুছিয়ে দেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করে দারিয়া। মৃদু হেসে বলে, 'ছ-মাস ইয়োকোহামার ব্রিটিশ হাসপাতালে কাজ করে শুশ্রূষা করার অন্তত নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্যগুলো তো আমি শিখেছি!'

প্রতিবার গা মোছানো শেষ করে নীলের ঠোঁটে চুমু দেয় ও। বন্ধুত্বময় আর মধুর ব্যবহার ওর। নীলের ভালোই লাগে, কিন্তু ব্যাপারটাকে সে কোনো গুরুত্ব দেয় না—এমন কি এটা নিয়ে সে ঠাট্টা ইয়ার্কিও করে, যা তার স্বভাবে এক বিরল বস্তু।

'হাসপাতালে রোগীদের তুমি সব সময় চুমু খেতে নাকি?' জিগেস করতো নীল।

'আমি তোমাকে চুমু দিই, তা তোমার পছন্দ নয়?' দারিয়ার মুখে মৃদু হাসি।

'কোনো ক্ষতি করে না।'

'হয়তো এতে তুমি তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে,' দারিয়া ঠাট্টা করে বলে।

একদিন রাতে দারিয়াকে স্বপ্ন দেখে নীল চমকে জেগে উঠলো। সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড ঘাম। ঘুম ভাঙার স্বস্তিটা ভারি অপূর্ব। নীল বুঝতে পারলো তার জ্বরটা নেমে গেছে, সে ভালো হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না—স্বপ্নে সে যা দেখেছে তা তার মনকে লজ্জায় ভরিয়ে তুললো। সে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। ঘুমের মধ্যেও এ ধরনের চিন্তা তার মনে থাকতে পারে ভেবে নীলের ভীষণ খারাপ লাগলো। মনে হলো সে একটা দুশ্চরিত্র দানব।

তখন ভোর হচ্ছে। পাশের ঘরে মনরো আর দারিয়া। মনরোর বিছানা ছেড়ে ওঠার শব্দ শুনতে পেলো নীল। দারিয়া দেরী করে ওঠে। ওর ঘুমে যাতে ব্যাঘাত না হয় মনরো সেদিকে সতর্ক থাকেন। মনরো নীলের ঘর দিয়ে যাবার সময় নীল তাঁকে নিচু গলায় ডাকলো।

'কি হে, তুমি জেগে আছো নাকি?'

'হ্যাঁ। খারাপ সময়টা কাটিয়ে দিয়েছি। এখন ভালোই আছি।'

'বেশ। আজকের দিনটা বরং শুয়েই থাকো। তাহলে কাল একেবারে সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হয়ে উঠবে।'

'আপনার সকালের জলখাবার খাওয়া হয়ে গেলে আহ্ তানকে একটু আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন?'

'ঠিক আছে, দেবো।'

মনরোর বেরিয়ে যাবার শব্দ শুনলো নীল। তারপর চীনে চাকরটা এসে জানতে চাইলো, সে কি চায়। এক ঘন্টা বাদে দারিয়া ঘুম থেকে উঠলো। সুপ্রভাত জানাতে ও যখন ঘরে এসে ঢুকলো, তখন নীল যেন ওর মুখের দিকে তাকাতে পারছিলো না।

'জলখাবারটা খেয়ে এসেই আমি তোমার গা মুছিয়ে দেবো,' দারিয়া বললো।

'হয়ে গেছে। আহ্ তানকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছি।'

'কেন?'

'তোমাকে ঝামেলা থেকে রেহাই দিতে।'

'ওটা কোনো ঝামেলা নয়। আমার ভালোই লাগে।'

বিছানার কাছে এসে চুমু খাবার জন্যে নিচু হলো দারিয়া, কিন্তু নীল মুখ ফিরিয়ে নিলো, 'না।'

'কেন?'

'ভীষণ বোকা বোকা লাগে।'

অবাক হয়ে এক মুহূর্ত নীলের দিকে তাকিয়ে রইলো ও, তারপর দু কাঁধে সামান্য একটু ঝাঁকুনি তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। কিন্তু একটু বাদেই নীলের কোনো দরকার আছে কিনা দেখার জন্যে ফের ও ঘরে এসে ঢুকলো। নীল ঘুমের ভান করে পড়ে রইলো। আলতো করে তার গালে হাত ছোঁয়ালো দারিয়া।

'দোহাই তোমার, অমন কোরো না!' নীল চিৎকার করে উঠলো।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমোচ্ছো। আজ তোমার কি হয়েছে বলো তো?'

'কিছু না।'

'তাহলে আমার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করছো কেন ? আমি কি তোমাকে কোনো আঘাত দিয়ে ফেলেছি ?'

'না।'

'তাহলে কি হয়েছে বলো।'

বিছানায় বসে নীলের হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলো দারিয়া। নীল দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখলো। লজ্জায় সে যেন কথাই বলতে পারছিলো না। তবু বললো, 'তুমি যেন ভুলে যাও যে আমি একটা পুরুষ-মানুষ। আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করো যেন আমি একটা বারো বছরের বাচ্চা ছেলে।'

'তাই বুঝি ?'

নিজের প্রতি রাগ আর দারিয়ার ওপরে বিক্ষোভে নীল ভীষণ রক্তিম হয়ে উঠছিলো। দারিয়ার সত্যি আরও বুঝেশুনে চলা উচিত ছিলো। বিচলিতভাবে চাদরটা তুলে নিয়ে নীল বললো, 'আমি জানি, তোমার কাছে এর কোনো বিশেষ অর্থ নেই। আমার কাছেও থাকা উচিত নয় এবং আমি যখন সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকি, তখন আমারও ওতে কিছু মনে হয় না। কিন্তু স্বপ্নের ওপরে তো কারুর হাত নেই ! অবচেতন মনে কি হয়ে চলেছে, স্বপ্ন তারই ইঙ্গিত দেয়।'

'তুমি আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছিলে ? কিন্তু তাতে কোনো দোষ আছে বলে তো আমার মনে হয় না।'

নীল মুখ ফিরিয়ে দারিয়ার দিকে তাকালো।

দারিয়ার চোখ দুটি ঝলমল করছে, অথচ তার দু চোখ বিষাদে বিধুর।

'পুরুষমানুষদের তুমি জানো না,' নীল বললো।

রিমঝিম সুরে হেসে উঠলো দারিয়া, তারপর নিচু হয়ে দুহাতে নীলের গলা জড়িয়ে ধরলো। সারং আর বাজু ছাড়া ওর পরনে আর কিচ্ছু নেই।

'লক্ষ্মী সোনা ! তুমি কি স্বপ্ন দেখেছো, বলো—'

নীল বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে উঠলো। প্রচণ্ড ধাক্কায় দারিয়াকে সরিয়ে দিয়ে বিছানা থেকে এক লাফে প্রায় নেমে এলো সে, 'কি করছো তুমি ? পাগল হয়ে গেলে নাকি ?'

'তুমি কি জানো না, আমি তোমাকে পাগলের মতো ভালোবাসি ?'

'এসব কি বলছো তুমি ?'

নীল বিছানার ধারে উঠে বসলো। সত্যিই সে হতবাক হয়ে গেছে। দারিয়া নিচু গলায় হাসলো, 'আমি কেন এই ভয়ঙ্কর জায়গাটাতে এসেছি, জানো ? তোমার কাছাকাছি থাকবো বলে। তুমি কি জানো না, আমি জঙ্গলকে কি ভীষণ ভয় পাই ? এই ঘরের মধ্যে থেকেও আমার ভয় হয়, এই বুঝি কোনো সাপ কাঁকড়া-বিছে বা অন্য কিছু এলো। আমি তোমাকে ভালোবাসি, নীল।'

'আমাকে এ ধরনের কথা বলার কোনো অধিকার তোমার নেই,' নীল কঠোর সুরে বললো।

'অতো রসকষহীন হয়ো না,' দারিয়ার মুখখানা সুস্মিত।

'চলো, এখান থেকে বেরোই।'

নীল বারান্দায় বেরিয়ে এলো, পেছনে দারিয়া। একটা কুর্সি'তে ঝুপ করে বসে পড়লো নীল। তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে, দারিয়া তার হাত দুটো নিজের হাতে তুলে নেবার চেষ্টা করলো। হাত সরিয়ে নীল বললো, মনে হচ্ছে তুমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছো। আশা করি তুমি যা বলছো, তা তোমার মনের কথা নয়।'

'প্রতিটা কথাই সত্যি,' দারিয়া মৃদু হাসলো।

নিজের স্বীকারোক্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে ও যেন সম্পূর্ণ নিশ্চেতন। নীলের রাগ হয়।

'তুমি কি তোমার স্বামীর কথা ভুলে গেছো?'

'সে থাকলেই বা কি এসে যায়?'

'দারিয়া!'

'অ্যাংগাসের কথা নিয়ে আমি এখন মাথা ঘামাতে পারছি না।'

নীলের মসৃণ ভুরু দুটি কুঁচকে গাঢ় হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে সে বলে, 'মনে হচ্ছে তুমি খুব খারাপ মেয়ে।'

'কেন, আমি তোমার প্রেমে পড়েছি বলে?' দারিয়া খিলখিল করে হেসে ওঠে, 'তোমার কিন্তু এতো সুন্দর দেখতে হওয়া উচিত হয়নি!'

'ঈশ্বরের দোহাই, তুমি হেসো না!'

'না হেসে পারছি না যে! তুমি ভারি মজার, কিন্তু তবু তোমাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। তোমার ওই ফর্সা রঙ আর চকচকে কোঁকড়া চুলগুলোকে আমি ভালোবাসি। তুমি এতো রসকষহীন, বেরসিক, নীতিবাগীশ—তাই তোমাকে আমি ভালোবাসি। ভালোবাসি তোমার বলিষ্ঠতা, তোমার যৌবন।'

দারিয়ার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে থাকে, শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুততর হয়ে ওঠে। নিচু হয়ে নীলের নগ্ন পা দুটিতে চুমু দেয় ও। তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ জানিয়ে দ্রুত পা সরিয়ে নেয় নীল, তার বিক্ষুব্ধ অঙ্গভঙ্গিতে প্রায় উলটে পড়ে জীর্ণ কুর্সি'খানা।

'পাগল মেয়ে! তোমার কি লজ্জা বলতে কিছুই নেই?'

'না।'

'আমার কাছে কি চাও তুমি?' হিংস্র সুরে প্রশ্ন করে নীল।

'প্রেম।'

'আমাকে তুমি কোন্ ধরনের মানুষ বলে মনে করেছো?'

'অন্য যে কোনো পুরুষমানুষের মতো।'

'তুমি কি মনে করো আমি এমনই একটা নোংরা ইতর জানোয়ার যে অ্যাংগাস মনরো আমার জন্যে এতো কিছু করার পরেও আমি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মজা লুটবো? চেনা জানা যে কোনো লোকের চাইতে আমি ওঁকে অনেক বেশি শ্রদ্ধা করি। উনি অসাধারণ। ওঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার চাইতে আমি বরং আত্মহত্যা করবো। আমি এ ধরনের একটা জঘন্য কাপুরুষের মতো কাজ করতে

পারি বলে তুমি কি করে ভাবলে, আমি জানি না।'

'অতো বিরাট বিরাট কথা বোলো না, লক্ষ্মীটি! আচ্ছা, এতে ও'র কি ক্ষতি হচ্ছে বলো তো? এ ধরনের জিনিসকে অমন দুঃখজনকভাবে ধরতে নেই। হাজার হোক, জীবনটা বড্ড ছোটো—এর মধ্যে থেকে যতোটুকু আনন্দ পাওয়া যায় তা কুড়িয়ে না নেওয়াটা বোকামো।'

'কথার পিঠে কথা সাজিয়ে তুমি অন্যায়কে ন্যায় করে তুলতে পারো না।'

'তা আমি জানি না। তবে আমি মনে করি, ওটা একটা ভীষণ বিতর্কিত বিবৃতি।'

নীল অবাক বিস্ময়ে দারিয়ার দিকে তাকায়। তার পায়ের কাছে শান্ত সংযত হয়ে বসে আছে দারিয়া, যেন পরিস্থিতিটা উপভোগ করছে ও। বিষয়টার গুরুত্ব সম্পর্কে ও যেন সম্পূর্ণ অচেতন।

'জানো, তোমার সম্পর্কে একটা অপমানজনক মন্তব্য করেছিলো বলে ক্লাবে একটা লোককে আমি ঘুঁষি মেরে ফেলে দিয়েছিলাম?'

'কাকে?'

'বিশপকে।'

'নোংরা কুকুর! কি বলেছিলো সে?'

'বলেছিলো, তোমার সঙ্গে অনেকের সম্পর্ক ছিলো।'

'মানুষ কেন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে না, বুঝি না। তবে কে কি বললো না বললো, তাতে কি আর এসে-যায়? আমি তোমাকে ভালোবাসি। কাউকে কোনোদিনও এতো ভালোবাসিনি। তোমার প্রেমে আমি নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিয়েছি, নীল!'

'চুপ করো। থামো!'

'শোনো, আজ রাতে মনরো ঘুমিয়ে পড়লে আমি চুপিচুপি তোমার ঘরে চলে আসবো। ও পাথরের মতো নিঃসাড় হয়ে ঘুমোয়। কোনো ঝুঁকি নেই।'

'তুমি কক্ষণো তা করবে না।'

'কেন?'

'না না না।'

আচমকা উঠে পড়ে দারিয়া, তারপর বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

দুপুরবেলা মনরো ফিরে এলেন। বিকেলটা ওরা যথারীতি যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে রইলো। দারিয়াও ও'দের সঙ্গে কাজে যোগ দিলো, যেমনটি ও মাঝে মধ্যে করে থাকে। ভীষণ উৎসাহ-উদ্দীপনা ওর। এতো হাসিখুশি যে মনরো বললেন, ও জীবনটাকে উপভোগ করতে শুরু করেছে।

'জীবনটা খুব একটা খারাপ নয়,' স্বীকার করলো দারিয়া। 'আসলে আজ আমার মনটা খুব ভালো লাগছে।'

ও নীলের পেছনে লেগে তাকে খেপাবার চেষ্টা করলো। নীল যে চুপ করে রয়েছে, ওর দিকে তাকাচ্ছে না—তা যেন ও খেয়ালই করলো না।

'নীল আজ বড্ড চুপচাপ।' মনরো বললেন, 'তোমার বোধহয় এখনও একটু দুর্বল লাগছে। তাই না, নীল?'

'না, তবে বেশি কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।'

আসলে নীল একেবারে নাকাল হয়ে উঠেছে। তার স্থির বিশ্বাস, দারিয়া যে কোনো কাজ করে ফেলতে পারে। 'দ্য ইডিয়ট' উপন্যাসে নাস্তাসিয়া ফিলিপোভনার সেই উম্মত্ত আচরণের কথা মনে পড়ে তার। তার মনে হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে মানসিক ভারসাম্যের অভাব ঘটলে দারিয়াও অমন আচরণ করতে পারে। চীনে চাকরবাকরদের ওপরে নীল একাধিকবার ওকে মেজাজ খারাপ করতে দেখেছে এবং সে জানে, কিভাবে ও সমস্ত আত্মসংযম হারিয়ে ফেলতে পারে। প্রতিরোধ ওকে আরও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। যা চায় তা তক্ষুণি না পেলে ও রাগে প্রায় পাগল হয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে যতো দ্রুত ও কোনো জিনিসের জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে, তেমনি আচমকা সেই বস্তুটি সম্পর্কে ওর সমস্ত আগ্রহ ফুরিয়ে যায় এবং তখন এক মিনিটের জন্যেও ওর মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে নিতে পারলে, পুরো ব্যাপারটাই ভুলে যায় ও। ওই ধরনের পরিস্থিতিতে মনরোর দক্ষতায় নীল মুগ্ধ হয়ে গেছে। ধূর্ত অথচ কোমল চাতুর্যে উনি তখন দারিয়ার মেয়েলি বদমেজাজকে ঠাণ্ডা করে তোলেন। মনরোর জন্যেই দারিয়ার প্রতি নীলের ঘৃণা এতো প্রবল। মনরো একজন সাধুপুরুষ। দারিয়াকে স্ত্রীর মর্যাদা দেবার জন্যে কতো অপমান, কতো দারিদ্র্য আর নিয়ত কতো পরিবর্তনই না তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে! নিজের সমস্ত কিছুর জন্যেই দারিয়া তাঁর কাছে ঋণী। তাঁর নামটাই দারিয়াকে রক্ষা করেছে, দারিয়াকে সম্মান দিয়েছে। আজ সকালে দারিয়া যে বাসনার কথা ব্যক্ত করেছে, সাধারণ একটু কৃতজ্ঞতাবোধ থাকলে তা কিছুতেই ওর পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। পুরুষ মানুষ নির্বিবাদে এগিয়ে যেতে পারে—তারা করেও তাই—কিন্তু মহিলাদের পক্ষে তেমন কাজ ভীষণ বিরক্তিকর। নীলের শালীনতাবোধে নিদারুণ আঘাত লেগেছে। দারিয়ার মুখে ফুটে ওঠা কামন-বাসনা আর ওর ভাবভঙ্গির অমার্জিত স্থূলতা দেখে মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েছে সে।

নীল ভাবছিলো দারিয়া সত্যি সত্যিই তার ঘরে আসবে কি না। তেমন সাহস ওর হবে বলে নীলের মনে হচ্ছিলো না। কিন্তু রাতে সবাই শুয়ে পড়ার পর সে এমন আতঙ্কিত হয়ে উঠলো যে কিছুতেই ঘুমোতে পারলো না। উৎকণ্ঠিত মনে সে উৎকর্ণ হয়ে শুয়ে রইলো। শুধুমাত্র একটা পেঁচার ক্রমাগত এবং একঘেয়ে চিৎকারে রাতের স্তব্ধতা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিলো। তালপাতায় বোনা পাতলা বেড়ার ভেতর দিয়ে মনরোর নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো নীল। হঠাৎ সে বুঝতে পারলো, চুপিচুপি কেউ তার ঘরে এসে ঢুকছে। কিন্তু ততোক্ষণে সে তার নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে।

'মিঃ মনরো নাকি?' উঁচু গলায় জিগেস করলো নীল।

দারিয়া আচমকা থমকে দাঁড়ালো। মনরো জেগে উঠেছেন।

'কে যেন আমার ঘরে এসে ঢুকলো। আমি ভাবলাম, আপনি।'

'না, আমি।' দারিয়া বললো, 'ঘুমোতে পারছিলাম না। তাই ভাবলাম বারান্দায় গিয়ে একটা সিগারেট খাবো।'

'ব্যাস, স্রেফ এই জন্যে ?' মনরো বললেন, 'দেখো, ঠাণ্ডা লাগিও না।'

নীলের ঘর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো দারিয়া। নীল ওকে সিগারেট ধরাতে দেখলো। কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যেই ও নিজের ঘরে ফিরে গেলো। ওর বিছানায় ওঠার শব্দ শুনতে পেলো নীল।

পরদিন সকালে নীল দারিয়ার সঙ্গে দেখা করলো না। দারিয়া ঘুম থেকে ওঠার আগেই সে নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো এবং মনরো বাড়িতে ফিরেছেন বলে নিশ্চিত না হওয়া অব্দি সে-ও বাড়িতে ফিরলো না। অন্ধকার না হওয়া অব্দি দারিয়ার একক সান্নিধ্য সে এড়িয়েই চললো। কিন্তু তারপর মনরো মথ ধরার জাল পাততে কয়েক মিনিটের জন্যে বাইরে যেতেই দারিয়া রুদ্ধ চাপা স্বরে জিগেস করলো, 'কাল রাতে অ্যাংগাসকে জাগিয়ে দিলে কেন ?'

দু-কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে নীল নিজের কাজ করে যেতে লাগলো, ওর প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না।

'ভয় পেয়েছিলে ?'

'আমার মধ্যে এক ধরনের শালীনতাবোধ আছে।'

'ছাড়ো তো ! অমন নীতিবাগীশ হয়ো না।'

'একটা নোংরা শুয়োর হওয়ার বদলে নীতিবাগীশ হওয়া অনেক ভালো।'

'আমি তোমাকে ঘেন্না করি !'

'তাহলে আমাকে নিজের মনে থাকতে দাও।'

দারিয়া কোনো জবাব দিলো না, তবে চট করে নীলের গালে সজোরে একটা চড় বসিয়ে দিলো। নীল আরক্তিম হয়ে উঠলো, কিন্তু মুখে কিছু বললো না। মনরো ফিরে এলেন। ওরা এমন ভাব দেখালো যেন এতোক্ষণ ওরা নিজেদের কাজেই মগ্ন ছিলো।

পরবর্তী কয়েকটা দিন দারিয়া শুধুমাত্র খাওয়ার সময় আর সন্ধ্যেবেলাটা বাদে অন্য কখনও নীলের সঙ্গে কথা বলেনি। কোনো পূর্ব নির্ধারিত বন্দোবস্ত না থাকলেও নিজেদের মনোমালিন্যের ব্যাপারটা ওরা দুজনেই মনরোর কাছে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতো। কিন্তু যে আপ্রাণ প্রয়াসে দারিয়া নিজের ক্লান্তিকর নীরবতা ভেঙে মুখর হয়ে উঠতো তাতে অ্যাংগাসের চাইতে বেশি সন্দেহপ্রবণ যে কোনো লোকই ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারতো। মাঝে মাঝে দারিয়া নীলের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করে ফেলতো। নীলকে ও ঠাট্টা করতো, কিন্তু ওর ঠাট্টার মধ্যে একটা করে বিষাক্ত হুল থেকে যেতো। ও জানতো কি করে নীলকে আঘাত করা যাবে এবং কায়দামতো তাকে পেয়েও যেতো। কিন্তু নীল খেয়াল রাখতো যাতে সে আঘাত পেলেও দারিয়া তা বুঝতে না পারে। নীলের কেমন যেন একটা আবছা ধারণা ছিলো, তার প্রসন্ন মেজাজ দারিয়াকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে।

একদিন দুপুরে, জলখাবারের সময়টা যথেষ্ট বিলম্বিত করেও, নীল নিজের

নমুনা সংগ্রহের কাজ থেকে ফিরে এসে অবাক হয়ে দেখলো, মনরো তখনও ফেরেননি। বারান্দায় একটা মাদুরে শরীর বিছিয়ে দারিয়া জিনের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ধূমপান করছিলো। নীল ওর পাশ দিয়ে হাত-মুখ ধুতে যাবার সময় ও কিছুই বললো না। একটু বাদেই চীনে চাকরটা নীলের ঘরে গিয়ে জানালো, খাবার তৈরি।

'মিঃ মনরো কোথায় ?' ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিগেস করলো নীল।

'এখন আসবে না।' দারিয়া বললো, 'খবর পাঠিয়েছে, সে যেখানে গেছে সেখানটা এতো ভালো যে রাতের আগে ফিরবে না।'

সেদিন সকালে মনরো পাহাড়টার চূড়োর দিকে যাত্রা করেছিলেন। স্তন্য-পায়ীদের ক্ষেত্রে নিচের দিকে তাঁদের কাজের ফলাফল ভালো হয়নি। তাই মনরোর ইচ্ছে ছিলো, উঁচুর দিকে যদি কোনো ভালো জায়গা পাওয়া যায় এবং সেখানে যদি জলের যোগান থাকে, তাহলে শিবিরটা সেখানেই নিয়ে যাবেন।

নীল ও দারিয়া নিঃশব্দে খাওয়াদাওয়া শেষ করলো। তারপর নীল বাড়ির ভেতর গিয়ে তার টুপি এবং পতঙ্গ সংগ্রহের সাজ-সরঞ্জামগুলো নিয়ে ফের বেরিয়ে এলো। অথচ সাধারণত বিকেলে সে বেরোয় না।

'কোথায় যাচ্ছো ?' আচমকা জিগেস করলো দারিয়া।

'বেরুচ্ছি।'

'কেন ?'

'ক্লান্ত লাগছে না। তাছাড়া বিকেলে আর তেমন কিছু করারও তো নেই।'

হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়লো দারিয়া। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, 'কি করে তুমি আমার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করছো ? কেন এমন নিষ্ঠুরতা !'

দীর্ঘ শরীর নিয়ে অনেকটা উঁচু থেকে নীল ওর দিকে তাকালো। তার সুন্দর অবিচলিত মুখখানা যেন খানিকটা বিব্রত।

'কি করেছি আমি ?'

'তুমি আমার সঙ্গে পশুর মতো ব্যবহার করেছো। হয়তো আমি খারাপ, কিন্তু তাহলেও এতো যন্ত্রণা পাবার মতো কোনো কাজ আমি করিনি। তোমার জন্যে আমি সবকিছু করেছি। খুশি মনে করিনি, এমন একটা কাজের কথা তুমি বলো ! ওহ্, কি মর্মান্তিক কষ্টই না আমি পাচ্ছি !'

অস্বস্তিভরে পা ফেললো নীল। দারিয়ার মুখ থেকে এ সমস্ত কথা শুনতে তার ভীষণ খারাপ লাগছিলো। দারিয়াকে সে ঘৃণা করে, ভয় পায়। তবু দারিয়া সম্পর্কে তার মনে এখনও সেই সম্ভ্রমবোধটা রয়ে গেছে যা সে আগেও অনুভব করতো এবং সেটা শুধু নারী বলে নয়, অ্যাংগাস মনরোর স্ত্রী বলে। আকুল হয়ে কাঁদছিলো দারিয়া। ভাগ্যিস ডায়াক শিকারীরা সকালবেলা মনরোর সঙ্গে চলে গেছে ! তিনজন চীনে চাকর ছাড়া শিবিরের কাছোপিঠে আর কেউ নেই এবং তারাও খাওয়াদাওয়া সেরে পঞ্চাশ গজ দূরে নিজেদের আস্তানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। এখন ওরা একা।

'আমি তোমাকে অসুখী করতে চাইনে। পুরো ব্যাপারটাই বড্ড বোকা বোকা। তোমার মতো একজন মহিলার পক্ষে আমার মতো একটা ছেলের প্রেমে পড়াটাই একটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড। ফলে নিজেকে আমার একটি গাড়ল বলে মনে হচ্ছে। তোমার কি আত্মসংযম বলতে কিছু নেই?'

'হা ঈশ্বর, আত্মসংযম!'

'আমি বলতে চাইছি কি, তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে তুমি নিশ্চয়ই চাইবে না আমি অমন একটা লোচ্চা ইতর হয়ে উঠি। তোমার স্বামী যে আমাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস করেন, তাতে কি তোমার কিছুই এসে যায় না? উনি যে আমাদের এভাবে একা রেখে গেছেন, এই সম্মানটুকু রাখার দায়িত্ব আমাদের। উনি কোনোদিন একটা মাছিকেও আঘাত করেন না। ওঁর বিশ্বাসভঙ্গ করলে আমি আর কোনোদিনও নিজেকে সম্মান দিতে পারবো না।'

আচমকা দারিয়া চোখ তুলে তাকালো, 'তুমি কি করে ভাবলে যে ও কোনো-দিন একটা মাছিকেও আঘাত করে না? কেন, ওই যে বোতলগুলো আর বাক্স-গুলো—ওগুলো তো ওরই খুন করা নিরীহ প্রাণীতে বোঝাই হয়ে আছে।'

'সেটা বিজ্ঞানের কল্যাণে। সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।'

'তুমি একটা বুদ্ধু, একটা আকাট!'

'বুদ্ধু হলেও আমার কিছু করার নেই। আমাকে নিয়ে কেন তুমি মাথা ঘামাচ্ছো?'

'তোমার কি ধারণা, আমি তোমার প্রেমে পড়তে চেয়েছিলাম?'

'নিজের জন্যে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।'

'লজ্জা! কি বোকার মতো কথা! হায় ঈশ্বর, আমি কি এমন করেছি যে এমন একটা ভানসর্বস্ব গর্দভের জন্যে আমাকে জ্বলেপুড়ে মরতে হবে?'

'তুমি আমার জন্যে কতো কি করেছো, তা তো বললে। কিন্তু মনরো তোমার জন্যে কি করেছেন?'

'মনরো আমাকে একঘেয়েমিতে মেরে ফেলছে। ওকে আমার অসহ্য লাগে। বিরক্তিতে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে।'

'তাহলে আমিই প্রথম নই?'

দারিয়ার সেই আশ্চর্য স্বীকৃতির পর থেকে একটা সন্দেহ নীলকে ক্রমাগত যন্ত্রণা দিয়ে এসেছে। তার মনে হয়েছে, কুয়ালা সোলরে ওই লোকগুলো দারিয়া সম্পর্কে যা বলেছিলো হয়তো তা সত্যি। তখন ওদের একটি কথাও সে বিশ্বাস করতে রাজি হয়নি এবং এখনও সে ভাবতে পারে না দারিয়া অমন একটা ভ্রষ্টা দানবী। অ্যাংগাস মনরোর মতো অমন বিশ্বাসপরায়ণ কোমলহৃদয় মানুষ যে নির্বোধের স্বর্গে বাস করছেন, তা ভাবতে ভয় হয়। দারিয়া কিছুতেই অতোটা খারাপ হতে পারে না। তবে নীলকে ও ভুল বুঝেছে।

'অবশ্যই না!' চোখে জল নিয়ে হেসে উঠলো দারিয়া। 'কি করে তুমি এমন বোকার মতো কথা বললে? কিন্তু তাই বলে তুমি অমন সাংঘাতিক গম্ভীর হয়ো

না, লক্ষ্মীটি! আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

তাহলে কথাটা সত্যি! নীল বারবার নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, তার সম্পর্কে দারিয়ার মনোভাবটা নিয়মের একটা ব্যতিক্রম, একটা পাগলামো—এবং তারা দুজনে মিলে যুক্তিতর্ক দিয়ে সেটাকে হারিয়ে দেবে। কিন্তু এ যে বাছবিচার-হীন আসঙ্গলিপ্সা!

'মনরো সব জেনে ফেলবেন ভেবে তোমার ভয় হয় না?'

এখন দারিয়া আর কাঁদছে না। নিজের সম্পর্কে ও কথা বলতে ভালোবাসে। নীলকে ও নিজের এক নতুন মোহিনী মায়ায় জড়িয়ে ফেলছে বলে ভাবে।

'মাঝে মাঝে মনে হয়, ও মন থেকে না জানলেও প্রাণ দিয়ে বোঝে। মেয়েদের মতো এক সহজাত বোধশক্তি আছে ওর, মেয়েদের মতোই ও সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, ও ব্যাপারটা সন্দেহ করছে এবং ওর উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে তখন আমি এক বিচিত্র আত্মিক পরমানন্দের অস্তিত্ব অনুভব করেছি। মনে হয়েছে, তবে কি ও বেদনার মধ্যে অসীম আনন্দের সন্ধান পায়? জানো তো, কিছু কিছু মানুষ আছে যারা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে এক ধরনের ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করে।'

'কি ভয়ঙ্কর!' এ সমস্ত উদ্ভট কথাবার্তা শোনার মতো ধৈর্য নীলের ছিলো না। সে বললো, 'তোমার সপক্ষে যে একটি মাত্র যুক্তি দেওয়া যায় তা হচ্ছে, তুমি উন্মাদ।'

নিজের সম্পর্কে দারিয়া এখন অনেক বেশি প্রত্যয়ী। স্পর্ধিত দৃষ্টিতে নীলের দিকে তাকালো ও, তোমার কি মনে হয় না, আমার চেহারাটা লোভনীয়? ঢের ঢের পুরুষমানুষ কিন্তু তাই মনে করে। স্কটল্যান্ডে তুমি নিশ্চয়ই কয়েক ডজন মেয়ের সঙ্গে শুয়েছো, কিন্তু তাদের কারুর গড়নই আমার মতো এতো সুন্দর নয়।'

চোখ নামিয়ে শান্ত অহঙ্কারী দৃষ্টিতে নিজের সুগঠিত আবেদনময় শরীরটার দিকে তাকালো দারিয়া।

'আমি কখনও কারুর সঙ্গে শুইনি,' নীল গম্ভীর মুখে বললো।

'কেন?' বিস্ময়ে এক লাফে উঠে দাঁড়ালো দারিয়া।

নীল কাঁধ ঝাঁকালো। এ ব্যাপারটার কথা চিন্তা করতেও তার যে কতোটা বিরক্ত লাগে, এডিনবরায় সহপাঠীদের অবিরত এলোমেলো উদ্দাম প্রণয়লীলা তার কাছে যে কতোটা জঘন্য কাজ বলে মনে হতো—তা সে দারিয়াকে মুখ ফুটে বলতে পারলো না। নিজের নিষ্কলুষ পবিত্রতায় সে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দ অনুভব করে। প্রেম এক পবিত্র জিনিস। কিন্তু যৌন সঙ্গমের চিন্তা তাকে আতঙ্কিত করে তোলে। ব্যাপারটার সপক্ষের যুক্তি, সন্তান উৎপাদন—বিয়ের মাধ্যমে জিনিসটাকে পবিত্র করে নেওয়া হয়। কিন্তু দারিয়া সমস্ত শরীর শক্ত করে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, হাঁফাচ্ছে। আচমকা কান্নায়-বুজে-ওঠা গলায় ও এক অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো—তাতে একই সঙ্গে এক নিবিড় পুলক আর বন্য বাসনার সুর মেশানো।

তারপর চকিতে নতজানু হয়ে বসে, নীলের হাত দুটো আঁকড়ে ধরে তাতে চুমু দিতে লাগলো পরম আবেগে।

'অ্যালিয়োশা, অ্যালিয়োশা!' হাঁফাতে হাঁফাতে বললো দারিয়া। তারপর কাঁদতে কাঁদতে এবং হাসতে হাসতে একটা স্তূপের মতো হয়ে পড়ে রইলো নীলের পায়ের কাছে। প্রায় অমানুষিক অদ্ভুত কতকগুলো আওয়াজ ওর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো, নিদারুণ বিক্ষোভে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো ওর সমস্ত শরীর—যেন একটার পর একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গের আঘাত নেমে আসছে ওর ওপরে। এটা হিস্টিরিয়ার আক্রমণ না কি মৃগীরোগের মূর্ছা, তা নীল বুঝে উঠতে পারলো না।

'থামো, বন্ধ করো এ সমস্ত!' চিৎকার করে উঠলো নীল। তারপর দুই বলিষ্ঠ বাহুতে দারিয়াকে তুলে নিয়ে, কুর্সি'তে শুইয়ে দিলো সে। কিন্তু ওকে ছেড়ে আসার চেষ্টা করতেই দারিয়া দুহাতে নীলের গলা জড়িয়ে তাকে আঁকড়ে রাখলো। নীলের সমস্ত মুখ ও চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলো। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো নীল—অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখলো, নিজেকে বাঁচাতে নিজের এবং ওর মুখের মাঝখানে একখানা হাত তুলে রাখলো। আচমকা তার সেই হাতটাতে দাঁত বসিয়ে দিলো দারিয়া। নিদারুণ যন্ত্রণায় নীল কিছু চিন্তা না করেই এক প্রচণ্ড ধাক্কা মারলো দারিয়াকে।

'শয়তানী,' নীল চিৎকার করে বললো। ধাক্কাটার তীব্রতায় দারিয়ার বাঁধন থেকে নিজেকে সে মুক্ত করে নিয়েছিলো। এবারে হাতটা সামনে মেলে, সেদিকে তাকালো একবার। হাতের মাংসল অংশটাতেই দাঁত বসিয়েছিলো দারিয়া, সেখান থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। আগুনের মতো জ্বলছে দারিয়ার চোখ দুটো।

'যথেষ্ট হয়েছে! আমি বেরুচ্ছি।' বললো নীল।

দারিয়া তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।'

টুপিটা মাথায় দিয়ে এক ঝটকায় পতঙ্গ-সংগ্রহের সরঞ্জামগুলো হাতে তুলে নিলো নীল। তারপর একটিও কথা না বলে এক লাফে সিঁড়ির তিনটে ধাপ টপকে ঘর থেকে বাইরের প্রাঙ্গণে নেমে এলো। দারিয়া অনুসরণ করলো তাকে।

'আমি জঙ্গলে যাচ্ছি।'

'আমি ভয় পাইনে।'

এক সর্বনাশা কামনায় আবিষ্ট হয়ে দারিয়া জঙ্গল সম্পর্কে নিজের অস্বাভাবিক আতঙ্কের কথা ভুলে গিয়েছিলো। সাপখোপ, বন্যপ্রাণী কিছুকেই পরোয়া করছিলো না। অগ্রাহ্য করছিলো মুখের ওপরে আছড়ে পড়া ডালপালা আর পা জড়িয়ে ধরা লতাপাতার জটিল বন্ধনকে। গত এক মাস ধরে নীল এই জঙ্গলের সর্বত্র চষে বেড়িয়েছে, এখানকার প্রতিটি জায়গা তার চেনা। কঠোর হয়ে সে স্থির করলো, তার সঙ্গে সঙ্গে আসার জন্যে দারিয়াকে সে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। সচেষ্ট প্রয়াসে ঝোপঝাড় আর আগাছার ভেতর দিয়ে সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললো। তার পেছন পেছন দারিয়া—বারবার হোঁচট খাচ্ছে, কিন্তু ওর দৃঢ় সঙ্কল্প এতো-

টুকুও টলছে না। রাগে অন্ধ হয়ে নীল হুড়মুড় শব্দে এগুচ্ছে, দারিয়াও হুড়মুড় করে তার পেছন পেছন ছুটছে। দারিয়া কি যেন বলছিলো, কিন্তু নীল ওর কোনো কথাই শুনছিলো না। দারিয়া নীলের কাছে করুণা ভিক্ষা করছিলো, নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করছিলো, নিজেকে বিনত করে তুলছিলো। ও কাঁদ-ছিলো আর নিজের হাত দুটোকে মোচড়াচ্ছিলো। মিষ্টি কথায় ও নীলকে ভোলাতে চেষ্টা করছিলো। ওর ঠোঁট দিয়ে অনর্গল ধারায় বেরিয়ে আসছিলো কথাগুলো। ঠিক যেন উন্মাদিনী। অবশেষে ছোটোখাটো একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে নীল আচমকা থমকে দাঁড়ালো। তারপর ঘুরে দাঁড়ালো দারিয়ার দিকে।

'অসম্ভব!' চিৎকার করে নীল বললো, 'আমার বিরক্তি ধরে গেছে। অ্যাংগাস ফিরে এলে বলবো, আমাকে চলে যেতে হবে। কাল সকালেই আমি কুয়ালা সোলরে চলে যাবো, তারপর সেখান থেকে দেশে।'

'সে তোমাকে যেতে দেবে না। সে তোমাকে চায়। তোমাকে সে অমূল্য বলে মনে করে।'

'তাতে আমার কিচ্ছু এসে যাবে না। ওঁকে যা হোক একটা মনগড়া কথা বলে দেবো।'

'কি?'

'না, তোমাকে ভয় পেতে হবে না। আমি ওঁকে সত্যি কথাটা বলবো না। ইচ্ছে হলে তুমি ওঁর মনটাকে ভেঙে দিতে পারো, কিন্তু আমি তা করবো না।'

'তুমি ওই প্রাণহীন বিরক্তিকর লোকটাকে ভীষণ ভক্তি শ্রদ্ধা করো, তাই না?'

'উনি তোমার চাইতে একশো গুণ বেশী শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য।'

'আমি যদি ওকে বলি যে আমি তোমার আগ্রাসী আকাঙ্ক্ষার কাছে ধরা দিইনি বলেই তুমি চলে গেছো, তাহলে বেশ মজা হবে।'

নীল সামান্য চমকে উঠলো। দারিয়া মন থেকে কথাটা বলেছে কিনা বোঝার জন্যে ওর দিকে তাকালো সে:

'অমন বোকামো কোরো না। তোমার ও সমস্ত কথা উনি বিশ্বাস করবেন ভেবেছো? উনি জানেন, অমন কুচিন্তা কক্ষণো আমার মনে আসবে না।'

'অতোটা নিশ্চিত হয়ো না।'

শুধুমাত্র তর্কটা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে দারিয়া কথাটা বলেনি। কিন্তু ও বুঝতে পারলো, নীল ভয় পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা হিংস্র প্রবৃত্তির বশে নিজের সুবিধেজনক পরিস্থিতিটাকে ও আরও জোরদার করে তুলতে সচেষ্ট হলো।

'তুমি ভেবেছো আমি তোমাকে দয়া করবো? তুমি আমাকে যে অপমান করেছো তা সহ্যের অতীত। এমন ব্যবহার করেছো যেন আমি একটা নোংরা প্রাণী। আমি শপথ করে বলছি, তুমি যদি ঘুণাক্ষরেও চলে যাবার কথা তোলো তাহলে আমি সোজা অ্যাংগাসের কাছে গিয়ে বলবো যে তুমি ওর অনুপস্থিতির সুযোগে আমার সম্মান নষ্ট করার চেষ্টা করেছিলে।'

'আমি তা অস্বীকার করতে পারি। শত হলেও সেটা হবে আমার কথার পিঠে তোমার কথা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার কথারই দাম থাকবে। আমি নিজের কথার সপক্ষে প্রমাণ দিতে পারবো।'

'তার মানে ? কি বলতে চাইছো তুমি ?'

'আমার গায়ে সহজেই কালশিরের দাগ পড়ে। অ্যাংগাসকে আমি দাগগুলো দেখিয়ে বলবো, ওই বিশেষ জায়গাগুলোতে তুমি আমাকে আঘাত করেছো। তাছাড়া নিজের হাতটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। ওখানে ওই দাঁতের দাগ এলো কি করে ?'

চকিত দৃষ্টিতে নিজের হাতটা এক ঝলক দেখে নিয়ে নীল বোকার মতো দারিয়ার দিকে তাকালো। ততোক্ষণে সে সম্পূর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। দারিয়ার শরীরে কালশিরে আর নিজের হাতে ওই ক্ষতচিহ্নটা কি করে ব্যাখ্যা করবে সে ? আত্মরক্ষার জন্যে বাধ্য হলে সে সত্যি কথাটা বলে দিতে পারে, কিন্তু অ্যাংগাস তা বিশ্বাস করবেন কি ? দারিয়াকে উনি শ্রদ্ধা করেন, তাই দারিয়ার কথাই উনি সত্যি বলে মেনে নেবেন। মনরোর অমন মহানুভবতার কাছে এ ব্যাপারটাকে কতো দূর অকৃতজ্ঞতা বলে মনে হবে তখন! অতোখানি বিশ্বাসের কাছে কি সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতকতা! নীলকে তখন উনি একটা জঘন্য নোংরা লোক বলে মনে করবেন এবং ওঁর দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা সঠিক বিচারই হবে। যে মনরোর জন্যে সে স্বেচ্ছায় নিজের জীবনটাকে বিলিয়ে দিতে পারে, তিনি ওকে খারাপ ভাববেন — এই চিন্তাটাই নীলকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিলো। নিবিড় বেদনায় তার দুচোখ জলে ভরে উঠলো, অথচ অপুরুষোচিত বলে কান্নাকে সে ঘৃণা করে। নীলকে ভেঙে পড়তে দেখে দারিয়া খুশিতে উদ্বেল হয়ে উঠলো। এতোদিন নীল ওকে যে কষ্ট দিয়েছে, এখন ও নীলকে তা ফিরিয়ে দিচ্ছে। এখন নীল ওর হাতের মুঠোয়। প্রাণভরে নিজের জয়ের সুস্বাদ উপভোগ করছিলো দারিয়া, প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার মধ্যেও নীলের বোকামোতে প্রাণখোলা হাসিতে মুখর হয়ে উঠলো ও—কারণ সেই মুহূর্তে ও বুঝতে পারছিলো না, নীলকে ও ভালোবাসে না ঘৃণা করে।

'এবারে ভালো হয়ে চলবে তো ?' জিগেস করলো দারিয়া।

একবার ফুঁপিয়ে উঠলো নীল, তারপর ওই জঘন্য স্ত্রীলোকটার কাছ থেকে পালিয়ে যাবার এক চকিত প্রেরণায় দৌড়তে শুরু করলো প্রাণপণ। কোথায় চলেছে সেদিকে কোনো খেয়াল না রেখে, দম না ফুরোনো অব্দি, আহত জন্তুর মতো সে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটে চললো। তারপর এক সময় হাঁফাতে লাগলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। অজস্র ধারায় ঘাম নেমে তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে তুলেছিলো, পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছলো সে। তখন সে অবসন্ন, তাই বিশ্রাম নিতে বসে পড়লো একান্তে।

'খেয়াল রাখতে হবে যাতে হারিয়ে না যাই,' নিজেকে বললো নীল।

নীলের কাছে এটা তেমন কোনো সমস্যাই নয়। তবু কম্পাসটা পকেটে আছে বলে সে খুশি হলো—সে জানে কোন্‌দিকে তাকে যেতে হবে। একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে ক্লান্ত পায়ে উঠে দাঁড়ালো সে। কিন্তু পথের দিকে নজর রাখতে রাখতে মনের অন্য একটা অংশ দিয়ে সে কাতর হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলো, এবারে তার কি করা উচিত। নীল ভালোভাবেই জানে দারিয়া তাকে যে ভয়টা দেখিয়েছে, বাস্তবেও ও ঠিক তাই করবে। এই অভিশপ্ত জায়গাটাতে তাদের আরও তিনটে সপ্তাহ থাকার কথা। তার আগে চলে যাবার মতো সাহস নীলের নেই, থাকতেও ভরসা হয় না। মনের মধ্যে এক অস্থির চাঞ্চল্য। এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে, শিবিরে ফিরে গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় একটা সমাধান খুঁজে বের করা।

সিকি ঘণ্টার মধ্যেই নীল যেখানে এসে হাজির হলো, সেটা তার চেনা জায়গা। তারপর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শিবিরে ফিরে এসে একটা কুর্সি'তে নিজের শরীরটাকে ছুঁড়ে দিলো সে। তার সমস্ত ভাবনায় শুধু অ্যাংগাসের অস্তিত্ব। অ্যাংগাসের জন্যে তার হৃৎপিণ্ড থেকে যেন রক্তক্ষরণ হতে থাকে। আগে যা অন্ধকারে ছিলো, এখন তার সমস্ত কিছুই নীলের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। যেন এক তিক্ত অন্তর্দৃষ্টির প্রভায় সব কিছু পরিষ্কার হয়ে ওঠে তার চোখের সামনে। এবারে নীল বুঝতে পারে, কেন কুয়ালা সোলরের মহিলারা দারিয়ার সম্পর্কে অমন বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করতো, কেন ওরা অ্যাংগাসের দিকে অমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাতো। অ্যাংগাসের প্রতি ওদের ব্যবহারে একটা হালকা মমতার স্পর্শ থাকতো। নীল ভেবেছিলো, এর কারণ হচ্ছে—অ্যাংগাস বিজ্ঞানের মানুষ বলে মেয়েদের নির্বোধ দৃষ্টিতে উনি এক আজব বস্তু। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারে, ওরা অ্যাংগাসের সম্পর্কে দুঃখ অনুভব করতো এবং একই সঙ্গে তাঁকে কৌতুকেব পাত্র বলেও মনে করতো। গোটা সমাজের কাছে দারিয়া তাঁকে উপহাসের পাত্র করে তুলেছে। অথচ মেয়েদের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পাবার মতো মানুষ অ্যাংগাস নন।

হঠাৎ নীলের যেন শ্বাস ফুরিয়ে এলো, সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করলো। আচমকা তার মনে হলো, দারিয়া জঙ্গলের পথ চেনে না। নিদারুণ মানসিক অশান্তিতে তার নিজেরও খেয়াল নেই তারা কোথায় গিয়েছিলো। কিন্তু দারিয়া যদি শিবিরে ফিরে আসার পথ খুঁজে না পায়? তাহলে ও তো ভীষণ ভয় পেয়ে যাবে! অ্যাংগাসের মুখে শোনা অরণ্যে হারিয়ে যাবার সেই ভয়ঙ্কর গল্পটা মনে পড়লো নীলের। প্রথমে দারিয়াকে খুঁজে আনতে যাবার জন্যে এক লাফে উঠে দাঁড়ালো সে, কিন্তু তারপরেই এক হিংস্র ক্রোধ তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেললো। না, ও নিজেই নিজের ব্যবস্থা করুক। ও নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় গেছে, নিজেই ফেরার পথ খুঁজে নিক। দারিয়া একটা নোংরা মেয়েছেলে—যেটুকু হতে পারে সেটা হবে ওর উচিত শিক্ষা। বেপরোয়া ভঙ্গিতে মাথাটা পেছন দিকে ঝাঁকালো নীল। তার মসৃণ তরুণ ভ্রূযুগলে ঘৃণার কুঞ্চন, হাত দুটি মুষ্ঠিবদ্ধ। মনস্থির করে ফেললো সে। দারিয়া কোনোদিন না ফিরলে, সেটা অ্যাংগাসের

পক্ষে ভালোই হবে। বসে বসে একটা পাহাড়ি ড্রোগনের চামড়া ঠিক করতে শুরু করলো নীল। কিন্তু চামড়াটা ভেজা টিস্যু পেপারের মতো, তাছাড়া তার হাতও কাঁপছে। কাজের দিকে মন দেবার চেষ্টা করলো সে—কিন্তু ফাঁদে পড়া পতঙ্গের মতো তার চিন্তাগুলো যেন মরিয়া হয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে, অথচ নীল কিছুতেই তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। জঙ্গলে এখন কি হচ্ছে, কে জানে? নীল আচমকা উধাও হয়ে যাবার পর কি করলো দারিয়া? অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীল মাঝে মাঝে মুখ তুলে দেখছিলো। যে কোনো মুহূর্তেই দারিয়া সামনের ফাঁকা জায়গাটায় এসে হাজির হয়ে শান্ত ভঙ্গিতে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে পারে। নীলের কোনো দোষ নেই। সবই ঈশ্বরের বিধান। নীল শিউরে উঠলো। আকাশে ঝড়ের মেঘ জমছে। দেখতে দেখতে রাত নেমে এলো।

অন্ধকার হবার ঠিক পরেই মনরো এসে পৌঁছলেন। বললেন, 'খুব সময় মতো এসে গেছি। প্রচণ্ড ঝড় উঠবে।'

মনরোর মনে খুব উৎসাহ। উনি একটা সুন্দর মালভূমির সন্ধান পেয়েছেন। সেখানে প্রচুর জল। ওখান থেকে সমুদ্রের দৃশ্যও অপূর্ব। দু-তিনটে বিরল শ্রেণীর প্রজাপতি আর একটা উড়ন্ত কাঠবেড়ালীও উনি সংগ্রহ করেছেন। ওই নতুন জায়গায় শিবিরটা তুলে নিয়ে যাবার পরিকল্পনায় তিনি ভরপুর হয়ে আছেন। ভারি বুট জোড়া খুলে রাখার জন্যে উনি বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন। পরক্ষণেই বেরিয়ে এসে জিগেস করলেন, 'দারিয়া কোথায়?'

স্বাভাবিক ব্যবহার ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসে নীল নিজেকে শক্ত করে তুললো। 'ওর ঘরে নেই?'

'না, হয়তো কোনো দরকারে চাকরদের ডেরায় গেছে।'

সিঁড়ি দিয়ে নেমে মনরো কয়েক গজ এগিয়ে গেলেন। তারপর চিৎকার করে ডাকলেন, 'দারিয়া! দারিয়া!'

কোনো জবাব নেই। মনরো এবারে চিৎকার করে চাকরবাকরদের ডাকতেই একটি চীনে চাকর ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো। অ্যাংগাস তাকে জিগেস করলেন, তার মালিকান কোথায়। সে জানে না। টিফিনের পর থেকে সে আর মালিকানকে দেখেনি।

'কোথায় যেতে পারে?' বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে আসতে আসতে মনরো জিগেস করলেন। বাড়ির পেছন দিকটা খুঁজে দেখতে গিয়ে উনি উঁচু গলায় বললেন, 'ও বাড়ির বাইরে যাবে না। যাবার কোনো জায়গা নেই। নীল, তুমি কখন ওকে শেষ দেখেছো?'

'টিফিনের পর আমি নমুনা সংগ্রহ করতে বেরিয়ে ছিলাম। সকালে কাজকর্ম সুবিধের হয়নি, তাই ভাবলাম ফের একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি।'

'অদ্ভুত কাণ্ড!'

শিবিরের চতুর্দিকে প্রতিটি জায়গা ওরা খুঁজে খুঁজে দেখলো। মনরোর ধারণা, দারিয়া নিশ্চয়ই কোথাও আরাম করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বললেন,

'এভাবে মানুষকে ভয় পাইয়ে দেওয়া ভীষণ অন্যায়।'

পুরো দলটাই এবারে খোঁজাখুঁজিতে যোগ দিলো। মনরো ক্রমশ আতঙ্কিত হয়ে উঠতে শুরু করলেন।

'ও জঙ্গলে একটু পায়চারি করতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে—সেটা সম্ভব নয়। আমি যতোদূর জানি, আমরা এখানে আসার পর থেকে ও কক্ষণো শিবির থেকে একশো গজের বেশি এগোয়নি।'

মনরোর দুচোখে আতঙ্ক দেখে নীল নিচের দিকে চোখ নামালো।

'আমরা বরঞ্চ পুরোপুরি তৈরি হয়ে ওর খোঁজে বেরোই। একটা জিনিস হচ্ছে, ও বেশি দূরে যায়নি। ও জানে, জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেলে সব চাইতে ভালো কাজ হচ্ছে চুপচাপ সেখানেই অপেক্ষা করা—অন্যেরা এসে খুঁজে বের করবে। এতোক্ষণে নিশ্চয়ই ও ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। বেচারী!'

উনি ডায়াক শিকারীদের ডাকলেন, চীনে চাকরদের লণ্ঠন নিয়ে আসতে বললেন, সংকেত হিসেবে একবার বন্দুকও ছুঁড়লেন। সকলে দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো—একটা দল মনরোর অধীনে, অন্যটা নীলের। একমাস ওদের অনবরত যাতায়াতে যে দুটো পায়ে-চলা পথ গড়ে উঠেছে, সেই দুটো পথ ধরেই এগিয়ে চললো দুটো দল। ঠিক করে নেওয়া হয়েছিলো যে আগে দারিয়ার সন্ধান পাবে, সে পরপর তিনবার বন্দুকের আওয়াজ করবে। নীল কঠোর আর দৃঢ় মুখে পথ চলছিলো। তার বিবেক পরিষ্কার। তার হাতে যেন বিধাতার অমোঘ দণ্ড বিধান। সে জানে, দারিয়াকে আর কোনোদিনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবশেষে দুটো দল ফের মিলিত হলো। মনরোর মুখের দিকে তাকাবার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। উনি একেবারে বিহ্বল হয়ে উঠেছেন। নীলের মনে হলো, সে যেন একজন শল্য চিকিৎসক—প্রিয়জনের প্রাণ বাঁচাতে কোনো রকম সাহায্য বা সরঞ্জাম ছাড়াই তাকে বাধ্য হয়ে একটা বিপজ্জনক অস্ত্রোপচার করতে হচ্ছে। তাই দৃঢ় হয়ে থাকাই তার কর্তব্য।

'ও কিছুতেই এতোদূরে আসতে পারে না,' মনরো বললেন। এখন আবার ফিরে গিয়ে শিবিরের চারদিকে এক মাইল ব্যাসার্ধ জুড়ে জঙ্গলের প্রতিটি ইঞ্চি আমাদের তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে। একমাত্র ব্যাখ্যা হচ্ছে, ও কোনো কারণে ভয় পেয়েছে বা অজ্ঞান হয়ে গেছে কিংবা সাপে কেটেছে।'

নীল কোনো জবাব দিলো না। ফের ওরা সারি বেঁধে চলতে শুরু করলো। ঝোপঝাড়ের ভেতরে চিরুণী-তল্লাশ চালাতে লাগলো। চিৎকার করে চতুর্দিকে সাড়া জাগালো। মাঝে মাঝে বন্দুক ছুঁড়ে, অস্ফুট কণ্ঠে সাড়া পাবার আশায় উৎকর্ণ হয়ে থাকলো। লণ্ঠন হাতে ওদের এগিয়ে আসতে দেখে রাতের পাখিরা ভয় পেয়ে ডানায় শনশনানি তুলে উড়ে যাচ্ছিলো। খানিকটা অস্পষ্ট আভাসে আর খানিকটা অনুমানে ওরা বুঝতে পারছিলো, মাঝে মাঝেই হরিণ, শুয়োর বা গণ্ডার জাতীয় প্রাণীরা ওদের সাড়া পেয়ে ছুটে পালাচ্ছে। আচমকা ঝড় উঠলো। দমকা বাতাস। এবং তারপর বিদ্যুতের ঝলকানি-ভরিয়ে তুললো রাতের

অন্ধকার। নারীকণ্ঠে যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদের মতো তীক্ষ্ণ তার গর্জন। একদল দানব-নর্তকের উন্মত্ত নৃত্যে ভঙ্গিমার মতো ক্রমাগত একের পর এক বিসর্পিল আলোর ঝিলিক যেন দুমড়ে মুচড়ে দিতে লাগলো সমস্ত রাতটাকে। একটা অপার্থিব দিনে প্রকাশ হয়ে গেলো অরণ্যের যতো বিভীষিকা। অনন্ত মহাকালের কূলে আছড়ে পড়া বিশাল আদিম তরঙ্গের মতো একের পর এক উচ্চ নিনাদ তুলে আকাশ থেকে বাজ ভেঙে পড়ছিলো ক্রমাগত। মহাশূন্যে দুরন্ত বেগে ছুটে চলা সেই ভয়ংকর গর্জন শুনে মনে হচ্ছিলো শব্দেরও ওজন আর আয়তন আছে। তারপর হিংস্র বেগে মুষলধারে বৃষ্টি নামলো। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে সে এক বীভৎস আলোড়ন। ডায়াক শিকারীরা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে ঝড়ের সঙ্গে কথা বলতে থাকা ক্রুদ্ধ আত্মাদের সম্পর্কে অস্ফুটে আলোচনা করছিলো, কিন্তু মনরো তাদের তল্লাশি চালিয়ে যেতে বললেন। সারা রাত ধরে বজ্র-বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হয়েই চললো একটানা, ভোরের আগে থামলো না। ভিজে জুবজুবে হয়ে কাঁপতে কাঁপতে সকলে শিবিরে ফিরলো। সবাই ক্লান্ত অবসন্ন। খাওয়াদাওয়ার পর মনরো আবার মরিয়া হয়ে অনুসন্ধান শুরু করতে চান। কিন্তু তিনি জানেন, আর কোনো আশা নেই। দারিয়াকে আর কোনোদিনও জীবিত অবস্থায় দেখা যাবে না। অবসন্নের মতো তিনি আছড়ে পড়লেন। তাঁর মুখখানা ক্লান্ত, পাণ্ডুর আর যন্ত্রণাকাতর।

'বেচারী! হায়রে বেচারী!'

স্বপ্নলজ্জাহীন

কিছু কিছু মানুষ জানার জন্যে পড়েন, সেটা প্রশংসার যোগ্য। কেউ কেউ আবার আনন্দ পাবার জন্যে পড়েন, সেটাও দোষের নয়। কিন্তু শুধুমাত্র অভ্যেসের বশে পড়েন এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয় এবং সেটা না দোষের না প্রশংসার। আমি এই হতভাগ্যদেরই দলভুক্ত। আলাপ-আলোচনা খানিকক্ষণের মধ্যেই আমাকে বিরক্ত করে তোলে। খেলাধুলোয় আমি ক্লান্ত হয়ে উঠি। শুনেছি সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে নিজের চিন্তা-ভাবনা অবসর বিনোদনের এক অফুরান উৎস, কিন্তু আমার চিন্তাধারাগুলির কেমন যেন একটা শুকিয়ে যাবার প্রবণতা আছে। আফিমখোর যেমন তার ধূমপানের নলটার দিকে ছুটে যায়, আমিও তেমনি করে আমার বইয়ের দিকে ধাবিত হই। আর কিছু না পেলে আমি বরঞ্চ আর্মি অ্যান্ড নেভি স্টোর্সের মূল্য তালিকা কিংবা ব্র্যাডশ'র পথপঞ্জিতেও চোখ বোলাতে রাজি এবং সত্যি বলতে কি ওই দুটো নিয়ে আমি বহুবারই ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিব্যি মনের আনন্দে কাটিয়েছি। এক সময় আমি কোনো না কোনো পুরনো-পুস্তক বিক্রেতার বইয়ের তালিকা পকেটে না নিয়ে কক্ষণো বাইরে বেরোতাম না। পড়ার পক্ষে অমন সুস্বাদু জিনিস আর হয় না। এভাবে পড়াটা

অবশ্যই মাদক সেবনের মতো অন্যায় কাজ এবং এ ধরনের বিরাট পড়ুয়ারা নিরক্ষরদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের স্পর্ধা দেখালে আমি অবাক না হয়ে পারি না। কোন্ মহাকালের বিচারে লক্ষবার হাল চাষ করার চাইতে হাজারটা বই পড়া বেশি মূল্যবান? স্বীকার করে নেওয়া যাক পাঠাভ্যাসটা আমাদের কাছে স্রেফ একটা নেশা, ওটা না হলে আমাদের চলে না। দীর্ঘ সময় পড়াশুনো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে যে কি প্রচণ্ড অস্থিরতার আক্রমণ নেমে আসে, তার কি যে আতঙ্ক আর যন্ত্রণা, একটা ছাপানো পৃষ্ঠার দৃশ্য প্রাণের ভেতর থেকে যে কি অপরূপ স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস বয়ে আনে—তা এই শ্রেণীর পাঠকদের মধ্যে কে না জানে? অতএব ইনজেকশনের ছুঁচ বা মদের গোলামদের তুলনায় আমাদের অহেতুক আত্মম্ভরি না হওয়াই ভালো।

নেশাসক্ত মানুষ যেমন তার নেশার মারাত্মক বস্তুটি যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্গে না নিয়ে স্থানান্তরে যেতে পারে না, আমিও তেমনি পর্যাপ্ত পড়ার জিনিস না নিয়ে কখনো বেশি দূরে যেতে ভরসা পাই না। বই আমার কাছে এতোই প্রয়োজনীয় যে ট্রেনে সম্পূর্ণ বইপত্রবিহীন কোনো সহযাত্রীকে দেখলে আমার মনটা যথার্থই আতঙ্কে ভরে ওঠে। কিন্তু কোনো লম্বা সফর শুরু করার সময়েই সমস্যাটা মারাত্মক আকার ধারণ করে। এ ব্যাপারে আমার উচিত-শিক্ষা হয়ে গেছে। একবার জাভার এক শৈল-শহরে অসুস্থ হয়ে তিন মাস আটকে পড়ায়, আমি সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সব কটা বই-ই পড়ে শেষ করে ফেলি। বুদ্ধিমান জাভাবাসীরা যে সমস্ত বই থেকে ফরাসী আর জার্মান ভাষায় জ্ঞান অর্জন করে বলে আমার ধারণা, একজন ওলন্দাজ কখনও সেই সমস্ত স্কুলের বই কিনতে বাধ্য নয়। তাই তখন পঁচিশ বছর বাদে ফের আমাকে বাধ্য হয়ে গ্যয়তের নির্জীব নাটক, লাফতেনের নীতিগল্প এবং কোমল ও নির্ভুল রাসিনের বিয়োগান্ত রচনাগুলো পড়তে হয়। রাসিনের ওপরে আমার অসীম শ্রদ্ধা। কিন্তু আমি স্বীকার করতে বাধ্য, একের পর এক তাঁর নাটকগুলো পড়ে যাওয়া একজন কোলাইটিসের রোগীর পক্ষে খানিকটা শ্রম-সাপেক্ষ কাজ। সেই থেকেই কোথাও যাবার সময় আমি সর্বদা ময়লা পোশাক-আশাক বইবার জন্যে তৈরি করা একটা বিশাল থলেতে সম্ভাব্য সমস্ত রকম পরিস্থিতি ও মেজাজের উপযোগী বই ঠেসেঠুসে বোঝাই করে, সেটা নিয়ে যাতায়াত করি। থলেটার ওজন হয় টন খানেক, শক্ত সমর্থ কুলিরা সেটার ভারে টলমল করতে করতে এগোয়। শুল্ক-ভবনের কর্মচারীরা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, কিন্তু ওটার মধ্যে বই ছাড়া অন্য কিছু নেই শুনে আঁতকে উঠে পিছিয়ে যায়। ওটার একটা অসুবিধে হচ্ছে, হঠাৎ আমার কোনো একটা বিশেষ বই পড়ার ইচ্ছে হলে সর্বদাই দেখা যায় সেটা একেবারে তলায় রয়েছে এবং তখন পুরো থলেটা মেঝেতে ঢেলে খালি না করলে আমার পক্ষে আর সেই বইখানা পাওয়া সম্ভব হয় না। অবিশ্যি এই অসুবিধেটা না থাকলে অলিভ হার্ডির অভিনব ইতিহাস হয়তো কোনোদিনই আমার শোনা হতো না।

তখন আমি মালয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যেখানে-সেখানে থাকছি—রেস্টহাউস

বা হোটেল হলে দু-এক সপ্তাহ আর কোনো প্ল্যান্টার বা জেলা শাসকের ঘাড়ে চাপলে দু-এক দিন, কারণ তাঁদের আতিথেয়তার অন্যায় সুযোগ নেবার কোনো ইচ্ছে আমার ছিলো না। ঠিক যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমি পেনাঙে। ছোট্ট সুন্দর শহর। ওখানকার হোটেলটা বরাবরই আমার খুব পছন্দ। তবে বিদেশীদের ওখানে করার মতো কিছু থাকে না এবং আমার হাতেও সময়টা তখন একটা অর্থহীন বোঝার মতো ঝুলে ছিলো। একদিন সকালবেলা এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমি একখানা চিঠি পেলাম। ভদ্রলোকের শুধুমাত্র নামটাই আমার পরিচিত—মার্ক ফেদারস্টোন। রেসিডেন্ট ছুটিতে থাকায় উনি তখন তেংগারা বলে একটা জায়গার অস্থায়ী রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ চালাচ্ছিলেন। ওখানে একজন সুলতানও আছেন। চিঠি পড়ে মনে হলো, শীগগির ওখানে জল-উৎসব গোছের কোনো ব্যাপার হবে এবং ফেদারস্টোনের ধারণা সেটা আমার ভালো লাগবে। উনি লিখেছেন, আমি ওখানে গিয়ে কয়েকটা দিন ওঁর সঙ্গে থাকলে উনি খুশি হবেন। আমিও ওঁকে তার করে জানিয়ে দিলাম, সেটা আমার পক্ষেও আনন্দের বিষয় হবে এবং পরের দিনই তেংগারার ট্রেনে চেপে বসলাম। ফেদারস্টোন স্টেশনেই আমার সঙ্গে দেখা করলেন। ওঁর বয়স বছর পঁয়ত্রিশের মতো হবে। ভদ্রলোক লম্বা, সুদর্শন, চোখ দুটো সুন্দর, মুখখানা কঠোর, কালো গোঁফজোড়া পাকানো, ভ্রূযুগল রীতিমতো রোমশ। দেখে সরকারী কর্মচারী না বলে বরং একজন সৈনিক বলেই মনে হয়। সাদা পাতলুন আর সাদা টুপিতে সুন্দর সুপ্রতিভ চেহারা। ভদ্রলোক একটু লাজুক, যেটা ওঁর দৃঢ় বলিষ্ঠ চেহারার সঙ্গে যেন ঠিক মানানসই নয়। মনে হলো লেখক নামধারী বিচিত্র জীবের সঙ্গে মেলামেশা করার অভ্যেস না থাকাই এর একমাত্র কারণ এবং আশা রাখলাম সামান্য সময়ের মধ্যেই আমি ওঁকে সহজ করে তুলতে পারবো।

'আমরা আগে ক্লাবে যাবো,' ফেদারস্টোন বললেন। 'আমার চাকরবাকররা আপনার মালপত্রের দেখাশুনো করবে। আপনার চাবিগুলো ওদের দিয়ে দিন, আমরা ফেরার আগেই ওরা জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে রাখবে এখন।'

আমি ওঁকে বললাম যে আমার মালপত্র অনেক এবং সবকিছু স্টেশনে রেখে যাওয়াই ভালো। কিন্তু উনি তা কানে না তুলে বললেন, 'মাল বেশি হওয়ায় কিছু এসে যাবে না। ওগুলো আমার বাড়িতেই বরং বেশি নিরাপদে থাকবে।'

'বেশ,' আমার চাবি, তোরঙ্গের টিকিট এবং বইয়ের ঝোলাটা কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি চীনে-চাকরের জিম্মায় তুলে দিয়ে আমরা স্টেশনের বাইরে অপেক্ষায় দাঁড়ানো একটা গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

'আপনি ব্রিজ খেলেন?' ফেদারস্টোন জিগেস করলেন।

'খেলি।'

'আমি ভেবেছিলাম অধিকাংশ লেখকরাই খেলেন না।'

'তা খেলেন না বটে। সাধারণভাবে লেখকরা মনে করেন, তাস খেলাটা স্বল্প বুদ্ধির লক্ষণ।'

ক্লাবটা একটা বাংলো বাড়ি, সুন্দর কিন্তু জাঁকজমক বর্জিত। বাংলোতে একটা পড়ার ঘর, একটা ঘরে বিলিয়ার্ড খেলার একটা টেবিল আর তাস খেলার ছোট্ট একটা ঘর। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন শুধু দু-একজন বসে বসে ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়ছিলেন, তাছাড়া ক্লাব ফাঁকা। টেনিস কোর্টে গিয়ে দেখি খেলা চলছে। কয়েকজন বারান্দায় বসে খেলা দেখতে দেখতে ধূমপান করছেন আর মদের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। ওঁদের মধ্যে দু-একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। ওদিকে দিনের আলো কমে আসছিলো, খানিকক্ষণের মধ্যে খেলোয়াড়দের পক্ষেও বল দেখতে পাওয়া শক্ত হয়ে উঠলো। আমার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, ফেদারস্টোন তাদের মধ্যে একজনকে তাস খেলার কথা জিগেস করায় তিনি রাজি হলেন। চতুর্থ জনের সন্ধানে এদিক-সেদিক তাকিয়ে ফেদারস্টোনের দৃষ্টি একা একা বসে থাকা এক ভদ্রলোকের ওপরে গিয়ে পড়লো। ওঁর দিকে এগিয়ে গেলেন ফেদারস্টোন। তারপর সামান্য বাক-বিনিময়ের পর দুজনেই আমাদের দিকে ফিরে এলেন। আমরা পায়ে পায়ে তাস খেলার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। খেলাটা ভালোই জমলো। ফেদারস্টোন বাজির হিসেব-নিকেষ শেষ করতেই একজন উঠে বললেন, 'আমি এবারে যাবো।'

'বাগানে ফিরবে?' ফেদারস্টোন জিগেস করলেন।

'হ্যাঁ,' ঘাড় নেড়ে সায় জানালেন ভদ্রলোক। তারপর আমার দিকে ফিরে জিগেস করলেন. 'আপনি কি আগামী কাল এখানে আছেন?'

'আশা করছি।'

উনি বেরিয়ে যেতেই আর একজন বললেন, 'আমিও আমার মেমসাহেবকে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোই। খাওয়াদাওয়া সারতে হবে।'

'তাহলে আমরাও রওনা হতে পারি,' ফেদারস্টোন বললেন।

'আপনি তৈরি থাকলে আমিও তৈরি,' আমি জবাব দিলাম।

গাড়িতে চেপে আমরা ফেদারস্টোনের বাড়ির দিকে রওনা হলাম। রাস্তাটা বেশ দীর্ঘই বলা চলে। অন্ধকারের মধ্যে আমি বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, আমরা একটা মোটামুটি খাড়াই পাহাড় দিয়ে উঠছি।

অবশেষে আমরা রেসিডেন্সিতে গিয়ে পৌঁছলাম। আর পাঁচটা সন্ধ্যার মতো সেদিনের সন্ধ্যাটাও মনোরম ছিলো, কিন্তু তাতে আদৌ কোনো উত্তেজনা ছিলো না। ঠিক অমনতরো সন্ধ্যা আমি আরও কতোগুলো কাটিয়েছি, জানি না। ওই সন্ধ্যাটা আমার মনে কোনো ছাপ রেখে যাবে, এমন আশাও আমি করিনি।

ফেদারস্টোন আমাকে বৈঠকখানা-ঘরে নিয়ে গেলেন। দেখে মনে হলো ঘরটা আরামদায়ক, কিন্তু অতি মাত্রায় সাধারণ। ঘরে সুতীর ছাপানো কাপড়ে ঢাকা বেতের গোটা কতক লম্বা লম্বা আরাম কুর্সি। দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো বেশ কিছু আলোকচিত্র। টেবিলগুলোতে কাগজ, সাময়িকপত্র, অফিসের প্রতিবেদন, তামাকের নল, সিগারেটের হলদে কৌটো আর তামাক রাখার গোলাপি কৌটো—সব মিলিয়ে

ছত্রাকার অবস্থা। একটা তাকে বেশ কিছু বই এলোমেলোভাবে গুঁজে রাখা হয়েছে। আর্দ্রতা এবং উইয়ের প্রকোপে বইগুলোর বাঁধাই রীতিমতো ক্ষতিগ্রস্ত। আমার ঘরটা দেখিয়ে বিদায় নেবার আগে ফেদারস্টোন জিগেস করলেন, 'দশ মিনিটের মধ্যে এক পাত্র জিন পাহিতের জন্যে তৈরি হয়ে নিতে পারবেন?'

'সহজেই পারবো,' ওঁকে বললাম।

স্নান সেরে পোশাক বদলে, সিঁড়ি ভেঙে নিচে গেলাম। কাঠের সিঁড়িতে আমার নেমে আসার শব্দ শুনেই ফেদারস্টোন পানীয় তৈরি করে ফেললেন। আমরা একসঙ্গে রাতের খাওয়াদাওয়া সারলাম। কথাবার্তা বললাম। যে উৎসবটা দেখার জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, সেটা দুদিন বাদে। কিন্তু ফেদারস্টোন বললেন, তার আগেই উনি সুলতানের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। বললেন, 'সুলতান ভারি জমাটি মানুষ। আর ওঁর প্রাসাদটা সত্যিই ভারি মনোরম।'

খাওয়াদাওরার পর আমরা আরও খানিকক্ষণ কথাবার্তা বললাম। ফেদারস্টোন গ্রামোফোন বাজালেন। আমরা ইংলণ্ড থেকে আসা শেষতম সচিত্র পত্রিকাগুলোতে চোখ বোলালাম। তারপর যে যার ঘরে শুতে গেলাম। কিন্তু আমি প্রয়োজনমতো সবকিছু পেয়েছি কিনা দেখার জন্যে ফেদারস্টোন ফের আমার ঘরে এসে হাজির হলেন।

'আপনার সঙ্গে কোনো বইটই নেই বোধহয়?' উনি বললেন, 'আমার কাছে পড়ার মতো কিছু নেই কি না!'

'বই?' আঙুল তুলে আমি বইয়ের ঝোলাটার দিকে দেখালাম। বিশ্রীভাবে ফুলে-ফেঁপে ওঠা ঝোলাটাকে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। দেখে মনে হয় যেন মদ খেয়ে বেসামাল একটা কুঁজো বিটকেলে বামন-ভূত।

'ওর মধ্যে বই রেখেছেন? আমি তো ভেবেছিলাম ওর মধ্যে আপনার নোংরা পোশাক কিংবা শিবিরে ব্যবহারের খাট বিছানা অথবা অন্য কিছু রয়েছে! তা আমাকে পড়তে দেবার মতো কিছু আছে নাকি?'

'নিজেই খুঁজে দেখুন না!'

ফেদারস্টোনের চাকরবাকরেরা ব্যাগটার তালা খুলেছিলো। কিন্তু তার পরেই ভেতরের দৃশ্যটা প্রকাশিত হওয়ায় তারা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছিলো—আর কিছু করার মতো সাহস পায়নি। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় আমি জানি, ওটাকে কিভাবে খালি করতে হয়। ঝোলাটাকে কাত করে ফেলে, আমি ওটার চামড়ার তলিটা আঁকড়ে ধরে পেছন দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। ফলে টানাটানিতে বই-গুলোকে ফেলে ঝোলাটা শূন্য হয়ে বেরিয়ে এলো। ঘরের মধ্যে বইয়ের একটা নদী ছড়িয়ে পড়লো আর বিহ্বলতার একটা বিচিত্র অভিব্যক্তি ছড়িয়ে পড়লো ফেদারস্টোনের সারা মুখে।

'আপনি এই এতো বই নিয়ে ঘুরে বেড়ান? কি অদ্ভুত কাণ্ড!'

ফেদারস্টোন নিচু হয়ে দ্রুত বইগুলোকে উলটে পালটে বইয়ের নামগুলো

দেখে নিতে লাগলেন। সমস্ত রকমের বই-ই ছিলো। কবিতার বই, উপন্যাস, দর্শন, সমালোচনা সাহিত্য (সবাই বলে, বইয়ের সম্পর্কে লেখা বইগুলো পড়া নিরর্থক—কিন্তু ওগুলো অবশ্যই খুব সুখপাঠ্য।), জীবনী, ইতিহাস। অসুস্থ অবস্থায় পড়ার মতো বই। সুস্থ অবস্থায় মস্তিষ্ক যখন কোনো বিষয় নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকতে চায়, তখনকার বই। সর্বদাই যে সমস্ত বই পড়তে ইচ্ছে হয় অথচ বাড়িতে তাড়াহুড়োর জীবনে যা পড়ার মতো সময় কখনই পাওয়া যায় না, তেমন বই। মালবাহী জাহাজে চেপে সমুদ্রপথে এঁকেবেঁকে চলার সময় আর বিশ্রী আবহাওয়ায় গোটা কেবিন যখন ক্যাঁচম্যাঁচ করতে থাকে, পতন এড়াতে বাংক আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলে রাখতে হয় তখনকার বই। রোমাঞ্চকর অভিযানে যখন হালকা মালপত্র নিয়ে বেরুতে হয়, তখন স্রেফ আয়তন দেখে বেছে নেওয়া বই। তাছাড়া যখন আর কিছুই পড়া যায় না, সেই সময়গুলোতে পড়ার মতো বই। অনেক দেখেশুনে অবশেষে ফেদারস্টোন একখানা সদ্য প্রকাশিত বায়রনের জীবনী তুলে নিলেন।

'আরে! এটা কি?' ফেদারস্টোন বললেন, 'কিছুদিন আগে আমি এটারই একটা সমালোচনা পড়েছি।'

'আমার ধারণা বইটা খুবই ভালো। তবে আমি এখনও পড়িনি।'

'এটা আমি নিতে পারি? আজকের রাতটা এতেই দিব্যি চলে যাবে।'

'অবশ্যই নেবেন! আপনার যা ইচ্ছে হয়, নিয়ে যান।'

'না, এটাই যথেষ্ট। আচ্ছা, শুভরাত্রি। কাল সকাল সাড়ে আটটায় প্রাতরাশ।'

পরদিন সকালে এক তলায় নেমে চাকরের মুখে শুনলাম, ফেদারস্টোন ভোর ছটায় কাজে বেরিয়েছেন—তবে খুব শীগগিরি ফিরবেন। ওঁর প্রতীক্ষায় থাকার অবকাশে আমি ওঁর বইয়ের তাকগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিলাম। তারপর উনি আসার পর দুজনে মিলে জলখাবার খেতে বসে ফেদারস্টোনকে বললাম, 'আপনার দেখছি ব্রিজের ওপরে প্রচুর বই!'

'হ্যাঁ। যা বেরোয় তার প্রত্যেকটাই আমি কিনি। ও ব্যাপারে আমার দারুণ আগ্রহ।'

'গতকাল আমরা যাঁর সঙ্গে খেললাম, তিনি বেশ তো ভালোই খেলেন!'

'কোন্ জন? হার্ডি?'

'তা জানি না। যিনি স্ত্রীকে নিয়ে চলে যাবার কথা বলছিলেন, তিনি নন। অন্য জন।'

'হ্যাঁ, ও-ই হার্ডি। ভালো খেলে বলেই ওকে খেলতে বলেছিলাম। ক্লাবে ও বেশি আসে না।'

'আশা করি আজ রাতে আসবেন।'

'তা আমি জোর করে বলতে পারি না। ওর বাগান এখান থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে। শুধু ব্রিজ খেলার জন্যে গাড়ি হাঁকিয়ে আসার পক্ষে দূরত্বটা একটু বেশি।'

'উনি কি বিবাহিত ?'

'না। মানে · হ্যাঁ, তবে ও'র স্ত্রী ইংলণ্ডে আছেন।'

ফেদারস্টোনের কথা বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিলো যা আমার কাছে খানিকটা অদ্ভুত বলে মনে হলো। কথাগুলো যেন রুদ্ধকণ্ঠে বলা। আচমকা উনি যেন আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। যেন রাত্রিবেলা পথ চলতে চলতে একটা আলোকিত জানলা দিয়ে ভেতরের আরামদায়ক ঘরটা দেখার জন্যে কেউ মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো, কিন্তু হঠাৎ একটা অদৃশ্য হাত এসে জানলার পর্দা নামিয়ে দিলো। কথা বলার সময় ও'র চোখ দুটো অভ্যেসের বশে অন্যের চোখের দিকে অকপট দৃষ্টি মেলে রাখে, কিন্তু আমার চোখ দুটোকে উনি এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিলো, ও'র মুখে ফুটে ওঠা বেদনার অভিব্যক্তিটা শুধুমাত্র আমার কল্পনা নয়। কি বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। ফেদারস্টোনও চুপ করে রইলেন। বুঝতে পারছিলাম, আমার এবং আমাদের আলোচনা থেকে ও'র মনটা এমন কোনো বিষয়বস্তুতে চলে গেছে যা আমার সম্পূর্ণ অজানা। একটু বাদেই উনি ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—ছোট্ট কিন্তু বুঝতে ভুল হয় না। মনে হলো যেন সচেষ্ট প্রয়াসে উনি নিজেকে সামলে নিলেন।

'জলখাবারটা খেয়েই আমি অফিসে যাবো,' ফেদারস্টোন বললেন। 'আপনি তখন কি করবেন ?'

'আমার জন্যে ভাববেন না। আমি একটু ধীরেসুস্থে ঘুরে ফিরে শহরটা দেখবো।'

'দেখার মতো তেমন কিছুই কিন্তু নেই।'

'তাহলে তো ভালোই। দেখার জিনিস দেখে দেখে আমার বিরক্তি ধরে গেছে।'

সকালবেলাটা ফেদারস্টোনের বারান্দায় বসে বসেই দিব্যি আনন্দে সময় কাটিয়ে দিলাম। রেসিডেন্সিটা একটা পাহাড়ের চূড়ায়। বাগানটা বেশ বড়ো এবং যথেষ্ট যত্ন সহকারে সেটার দেখাশুনো করা হয়। বড়ো বড়ো গাছ থাকায় বাগানটাকে দেখতে প্রায় ইংলণ্ডের পার্কের মতো। কৃষ্ণকায় রোগা চেহারার তামিলরা সুন্দর সাবলীল ভঙ্গিমায় কাস্তে দিয়ে বাগানের আগাছা সাফ করছিলো। নিচের দিকে মসৃণ গতিতে এঁকেবেঁকে ছুটে চলা প্রশস্ত নদীটার ধারে ধারে নিবিড় ঘন অরণ্য এবং তার বিপরীত দিকে যতোদূর চোখ যায় জঙ্গলে মোড়া তেংগারার বিস্তীর্ণ পর্বতমালা। ইংলণ্ডের লনের মতো পরিপাটি করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা বাগানটার সঙ্গে দূরের ওই বন্য অরণ্যের মধুর বৈপরীত্য কল্পনাকে যেন সজাগ করে তোলে। বসে বসে আমি বই পড়লাম আর ধূমপান করলাম। মানুষের সম্পর্কে কৌতূহলী হওয়াটাই আমার কাজ। তাই নিজের কাছেই জানতে চাইলাম, গা-ছমছমে করে তোলা এই অপূর্ব দৃশ্যশোভার পরম শান্তি ফেদারস্টোনের ওপরে কি ধরনের প্রভাব ফেলেছে। এই দৃশ্যের মধ্যেই উনি বাস করেন. এর প্রতিটি রূপের সঙ্গেই উনি পরিচিত। উনি দেখেছেন ভোরবেলা নদীর বুক থেকে জেগে ওঠা হালকা কুয়াশা কিভাবে সমস্ত অঞ্চলটাতে একটা ফ্যাকাশে ভূতুড়ে আচ্ছাদন

ছড়িয়ে দেয়, উনি দেখেছেন এখানকার দুপুরের দীপ্ত ঐশ্বর্য এবং সব শেষে উনি দেখেছেন, কোনো অজানা দেশে সন্তর্পণে এগিয়ে চলা সৈন্যবাহিনীর মতো ছায়াময় সান্ধ্য-গোধূলি নিঃশব্দে অরণ্য থেকে বেরিয়ে এসে কিভাবে মুহূর্তের মধ্যে এখানকার সবুজ লন, ফুলেভরা গাছগাছালি আর বাতাসে ঢেউ-দোল দারুচিনি গাছগুলোকে নীরব-রাত্রির আবরণে ঢেকে দেয়। ভাবছিলাম, এই কোমল অথচ গা-ছমছমে বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যশোভা ওঁর অজ্ঞাতসারে ওঁর স্নায়ুর ওপরে কোনো প্রভাব ফেলেছে কিনা, ওঁর নিঃসঙ্গতাকে কোনো অলৌকিক আরোপিত বৈশিষ্ট্যে রঞ্জিত করে তুলেছে কিনা এবং তার ফলস্বরূপ ওঁর এই জীবন—দক্ষ প্রশাসক, খেলোয়াড় এবং ভদ্রজনোচিত জীবন—মাঝে মাঝে ওঁর নিজের কাছেই খানিকটা অবাস্তব বলে মনে হয় কিনা। নিজের কল্পনায় আমি নিজেই হাসছিলাম, কারণ গত রাত্রির আলোচনায় ভদ্রলোকের মধ্যে অবশ্যই কোনো রকম অস্বাভাবিকত্বের ইঙ্গিত ছিলো না। বেশ ভালো লেগেছিলো ভদ্রলোককে। উনি অক্সফোর্ডে পড়াশুনো করেছেন, লন্ডনে একটা ভালো ক্লাবের সদস্য ছিলেন। মনে হয়েছিলো, সামাজিক ব্যাপারগুলোকে উনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। উনি একজন ভদ্রলোক এবং জীবনে যে সমস্ত ইংরেজের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ হয়েছে তাদের তুলনায় উনি উচ্চ শ্রেণীর মানুষ—এ ব্যাপারে উনি সামান্য সচেতন। খাওয়ার ঘরে সাজিয়ে রাখা রুপোর স্মারকগুলো দেখে বুঝেছিলাম, উনি খেলাধুলোয় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। উনি টেনিস এবং বিলিয়ার্ড খেলেন। ছুটিতে গেলে শিকার করেন এবং শরীরের ওজন কম রাখার জন্যে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকেন। কাজ থেকে অবসর নেবার পর কি করবেন, তা নিয়ে ফেদারস্টোন অনেক কথাই বলেছেন। একজন গ্রামীণ ভদ্রলোকের জীবনযাত্রা ওঁর কাছে ভীষণ আকাঙ্ক্ষিত। লিসেস্টারশায়ারে ছোট্ট একটা বাড়ি, কয়েকজন শিকারী বন্ধু আর ব্রিজ খেলার মতো কয়েকজন প্রতিবেশী—ব্যাস। অবসরকালীন ভাতা উনি পাবেন, তাছাড়া নিজেরও সামান্য কিছু অর্থ আছে। কিন্তু তার আগে—এখন—উনি কঠোর পরিশ্রম করেন এবং নিজের কাজটা চমকপ্রদভাবে না হলেও, অবশ্যই সুদক্ষভাবে সম্পন্ন করেন। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীরা ফেদারস্টোনকে নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন। কিন্তু উনি যে ধরনের মানুষ সেই ধাঁচটা আমার এতো পরিচিত যে তাতে আমি আর তেমন আগ্রহ খুঁজে পাই না। ফেদারস্টোন যেন এমন একটা উপন্যাস যা সযত্ন-আন্তরিকতায় সুদক্ষভাবে রচিত হলেও খানিকটা সাধারণ--ফলে মনে হয় পুরো বইটাই আগে পড়া…তাই কৌতূহলহীন অন্যমনস্কতায় একের পর এক পৃষ্ঠা উলটে যেতে হয়…কারণ জানাই আছে, বইটা কোনোমতেই মনে কোনো বিস্ময় বা উত্তেজনা জাগিয়ে তুলবে না।

কিন্তু মানুষ এক দুজ্ঞেয় জীব এবং যে মানুষ অন্য কারুর ক্ষমতার দৌড় জানে বলে জাহির করে, সে একটি নির্বোধ।

বিকেলবেলা ফেদারস্টোন আমাকে সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে

গেলেন। সুলতানেরই একটি ছেলে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। ছেলেটি লাজুক, সুস্মিত এবং সে সুলতানের দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করে। তার গায়ে পরিপাটি নীল স্যুট, কিন্তু কোমরে হলুদ জমির ওপরে সাদা ফুলের ছাপ আঁকা সুন্দর একটা সারং জড়ানো, মাথায় লাল রঙের ফেজ টুপি আর পায়ে অ্যামেরিকান জুতো। মুর স্থাপত্য রীতিতে গড়া সুলতানের প্রাসাদটা যেন বিশাল একটা পুতুল-ঘর। প্রাসাদটা চড়া হলদে রঙে রাঙানো—ওটাই এখানকার রাজকীয় রঙ। আমাদের একটা বিশাল ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। ঘরটা যে ধরনের আসবাবে সাজানো, ইংলণ্ডের যে কোনো সৈকতাবাসেই তেমন আসবাবের সন্ধান মিলবে—তবে কুর্সিগুলো হলদে রঙের রেশমী কাপড়ে ঢাকা। ঘরের মেঝেতে ব্রাসেলসের গালচে, দেয়ালে গিল্টি করা জমকালো ফ্রেমে বাঁধানো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তোলা সুলতানের ছবি। একটা আলমারিতে সম্পূর্ণ কুরুশের কাজ করা সমস্ত রকম ফলফলাদির এক বিরাট সংগ্রহ। বেশ কয়েকজন অনুচরসহ সুলতান ঘরে এসে ঢুকলেন। ভদ্রলোকের বয়স সম্ভবত বছর পঞ্চাশ, বেঁটেখাটো শক্তসমর্থ চেহারা, পরনে পাতলুন, গায়ে হলদে আর সাদায় বড়োবড়ো চৌখুপি নকশা কাটা টিউনিক —কিন্তু শরীরের মধ্যদেশে হলদে রঙের ভারি সুন্দর একটা সারং জড়ানো আর মাথায় সাদা ফেজ। উনি আমাদের কফি, মিঠাই আর চুরুট দিলেন। ভদ্রলোক অমায়িক, তাই কথাবার্তা চালাতে কোনো রকম অসুবিধে হলো না। বললেন, উনি কোনোদিন থিয়েটারে যাননি বা তাস খেলেননি—কারণ উনি ধর্মভীরু। ওঁর চারজন স্ত্রী এবং চব্বিশটি সন্তান। জীবনে সুখের পথে ওঁর একমাত্র বাধা এই যে, সাধারণ শোভনতার খাতিরে নিজের সময়টা ওঁকে চার স্ত্রীর মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে হয়। উনি বললেন, এর ফলে একজনের সঙ্গে একটা ঘণ্টা যেন একটা মাসের মতো দীর্ঘ হয়ে ওঠে আবার আর একজনের সঙ্গে থাকলে ওই সময়টাকেই মনে হয় যেন মোটে পাঁচটা মিনিট। আমি বললাম, অধ্যাপক আইনস্টাইন কিংবা বার্গসন এক সময় ঠিক এই মন্তব্যই করেছিলেন এবং এই প্রশ্নে পৃথিবীকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছিলেন। এর একটু পরেই আমরা সুলতানের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, সুলতান আমাকে সাদা রঙের কয়েকটা সুন্দর মালয়ী বেতের ছড়ি উপহার দিলেন।

সন্ধ্যাবেলা আমরা ক্লাবে গেলাম। ভেতরে ঢুকতেই আগের দিন আমরা যাদের সঙ্গে তাস খেলেছিলাম তাদের মধ্যে একজন কুর্সি ছেড়ে উঠে জিগেস করলো, 'এক বাজি খেলা হবে নাকি?'

'কিন্তু চতুর্থ জন কোথায়?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'খেলতে পেলে খুশি হবার মতো লোক এখানে অনেকেই আছে।'

'গতকাল আমরা যাঁর সঙ্গে খেলেছিলাম, তিনি কোথায়?' ভদ্রলোকের নামটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

'হার্ড? সে এখানে নেই।'

'ওর জন্যে অপেক্ষা করার কোনো অর্থ হয় না,' ফেদারস্টোন বললেন।

'ও ক্লাবে খুব কমই আসে। কাল রাতে আমি তো ওকে দেখে অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম!'

কেন জানি না মনে হলো, এই দুজনের ওই অতি সাধারণ কথাগুলোর পেছনে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি খেলা করছে। হার্ডি আমার মনে কোনো ছাপই ফেলতে পারেনি এবং তাকে দেখতে কেমন, তাও আমার মনে নেই। সে ছিলো আমাদের ব্রিজের টেবিলে স্রেফ চার নম্বর খেলোয়াড়। মনে হলো তার সম্পর্কে এঁদের দুজনেরই মনোভাব যেন খানিকটা প্রতিকূল। অবিশ্যি তাতে আমার কিছুই এসে-যায় না, হার্ডির বদলে নতুন যিনি এলেন তার সঙ্গে খেলেও আমি দিব্যি আনন্দ পেলাম। আগের দিনের তুলনায় এবারকার খেলাটা অবশ্যই অনেকটা জমাটি মেজাজে হালকা চালে খেলা হলো। সকলেই খুব হাসাহাসি করলাম। নতুন খেলোয়াড়টির সম্পর্কে অন্য দুজনের মনে কম সংকোচবোধ থাকাই এর কারণ, নাকি হার্ডির উপস্থিতিতে তখন তাঁরা স্বেচ্ছায় নিজেদের খানিকটা সংযত করে রেখেছিলেন—তা আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। সাড়ে আটটায় খেলা ভাঙলো, খাওয়াদাওয়া সেরে নেবার জন্যে আমি আর ফেদারস্টোন বাড়িতে ফিরে গেলাম।

খাওয়াদাওয়ার পর আমরা দুজনে আরাম কুর্সি'তে শরীর বিছিয়ে চুরুট টানছিলাম। যে কোনো কারণেই হোক কথাবার্তাটা ঠিক স্বচ্ছন্দভাবে এগুচ্ছিলো না। আমি একটার পর একটা নতুন প্রসঙ্গ তুলে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু কোনোটাতেই ফেদারস্টোনের মনে আগ্রহ জাগাতে পারছিলাম না। অবশেষে মনে হতে লাগলো, ফেদারস্টোনের যা কিছু বলার ছিলো তা সবই উনি গত চব্বিশ ঘণ্টায় বলে ফেলেছেন। ওঁর নিশ্চুপতায় আমি যেন খানিকটা দমে গেলাম। নৈঃশব্দ্য ক্রমশ দীর্ঘতর হতে লাগলো। কেন জানি না আবছা আবছা আমার যেন মনে হচ্ছিলো, ওঁর এই নীরবতার একটা তাৎপর্য আছে যেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। সামান্য অস্বস্তি লাগছিলো। হঠাৎ অনুভব করলাম ফেদারস্টোন এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আমি একটা বাতির পাশে বসে রয়েছি আর উনি রয়েছেন ছায়ার আড়ালে, তাই ওঁর মুখে অভিব্যক্তির খেলা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ওঁর আয়ত চোখ দুটি ভারি উজ্জ্বল, আধো অন্ধকারেও সেই চোখ দুটো যেন সামান্য জ্বলজ্বল করছে বলে মনে হচ্ছিলো আমার। ঠিক যেন প্রতিফলিত আলোয় ঝিকিয়ে ওঠা নতুন জুতোর বোতাম। ভাবছিলাম কেন উনি আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে রয়েছেন। আমিও ওঁর দিকে তাকালাম এবং আমার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকা ওঁর চোখে চোখ পড়তেই মৃদু হাসলাম।

'কাল রাতে আপনি যে বইটা দিলেন, সেটা মনকে ভীষণ টেনে রাখে,' আচমকা ফেদারস্টোন বললেন। মনে হলো ওঁর কণ্ঠস্বরটা যেন ঠিক স্বাভাবিক নয়। কথাগুলো যেন ওঁর ঠোঁট থেকে বেরিয়ে এলো, যেন ভেতর থেকে ঠেলে বের করে দেওয়া হলো কথাগুলোকে।

'ও, বায়রনের জীবনীটা ?' আমি হালকা সুরে বললাম, 'এর মধ্যেই পড়ে ফেলেছেন ?'

'বেশ খানিকটাই পড়েছি। তিনটে অব্দি পড়লাম।'

'শুনেছি বইটা নাকি খুবই ভালো হয়েছে। বায়রন সম্পর্কে আমার অবিশ্যি ততোটা আগ্রহ নেই। ও'র মধ্যে অনেক কিছুই মারাত্মকভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর। তাই খানিকটা অস্বস্তি লাগে।'

'আচ্ছা, বোনের সঙ্গে ও'র সম্পর্কের কাহিনীটা কতোদূর সত্যি বলে আপনি মনে করেন ?'

'অগাস্টা লী ? আমি ও ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানি না। আজ অব্দি 'অ্যাস্তাতে' কখনও পড়িনি।'

'আপনার কি মনে হয় ও'রা সত্যিই পরস্পরকে ভালোবাসতেন ?'

'সম্ভবত তাই। প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, অগাস্টাই একমাত্র মহিলা যাঁকে উনি সত্যি সত্যি ভলোবেসেছিলেন। তাই নয় কি ?'

'ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারেন ?'

'সত্যিই পারি না। ব্যাপারটা তেমন জঘন্য বলে মনে না হলেও, ভীষণ অস্বাভাবিক লাগে। হয়তো 'অস্বাভাবিক' শব্দটাও এখানে সঠিক হলো না। ব্যাপারটা আমার কাছে বোধাতীত। যে ধরনের অনুভূতিতে এমন একটা ব্যাপারকে সম্ভব বলে মনে হতে পারে, তেমন অনুভূতির কাছে আমি কিছুতেই নিজেকে ছুঁড়ে দিতে পারি না। জানেন তো, লেখকরা যাদের নিয়ে লেখেন এভাবেই নিজেকে তাদের জায়গায় দাঁড় করিয়ে তাদের হৃদয় দিয়ে তাদের চরিত্রকে অনুভব করেন।'

বুঝতে পারছিলাম, আমার বক্তব্যটা তেমন স্পষ্ট করে বোঝানো গেলো না। কিন্তু আমি একটা অনুভূতিকে, অবচেতনের একটা আচরণকে বর্ণনা করার চেষ্টা করছিলাম—যেটা অভিজ্ঞতার ফলে আমার কাছে সুপরিচিত, অথচ আমি জানি কোনো শব্দসমষ্টির সাহায্যেই সেটাকে নিখুঁতভাবে বোঝানো সম্ভব নয়। বললাম, 'অবিশ্যি অগাস্টা ও'র সৎ-বোন। কিন্তু অভ্যেস যেমন প্রেমকে বিনষ্ট করে, তেমনি আমার ধারণা অভ্যেস প্রেমের জাগরণকেও বাধা দেয়। দুটি মানুষ সারা জীবন ধরে পরস্পরকে চেনে, ঘনিষ্ঠভাবে তারা একসঙ্গে বাস করে আসছে—এমন পরিস্থিতিতে কিভাবে বা কেন সেই চকিত-স্ফুলিঙ্গ ঝলসে উঠবে যার ফলশ্রুতি প্রেম, তা আমি কল্পনা করতে পারি না। এসব ক্ষেত্রে এক পারস্পরিক স্নেহের বাঁধনেই তাদের যুক্ত থাকার কথা আর স্নেহের চাইতে বড়ো শত্রু প্রেমের আর কিছু আছে বলে আমার জানা নেই।'

আবছা আলোয় আমি ফেদারস্টোনের ভারী বিষণ্ণ মুখখানিতে মুহূর্তের জন্যে এক ঝলক মৃদু হাসির অস্পষ্ট রেখা ফুটে উঠতে দেখলাম।

'তাহলে আপনি শুধুমাত্র প্রথম দর্শনের প্রেমেই বিশ্বাস করেন ?'

'হয়তো তাই, কিন্তু সেটা শর্তাধীন। পরস্পরকে দেখার আগে দুজনের মধ্যে

বিশ বারও দেখা হতে পারে। 'দেখা' ব্যাপারটাতে একটা সক্রিয় আর একটা নিষ্ক্রিয় দিক আছে। যাদের সঙ্গে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয় তাদের অধিকাংশের সম্পর্কেই আমাদের আগ্রহ এতো কম যে আমরা কখনও তাদের দিকে তাকাবার জন্যে আদৌ তৎপর হয়ে উঠি না। মানুষটা মনে যেটুকু ছাপ রেখে যায়, আমরা শুধু সেটুকুই বয়ে বেড়াই।'

'কিন্তু এমনও তো শোনা যায় যে দুজন দুজনকে বেশ কয়েক বছর ধরে চেনে, কারুরই কোনোদিন মনে হয়নি যে অন্যজনের সম্পর্কে তার মনে কোনো কোমল অনুভূতি রয়েছে, অথচ তারাই একদিন হঠাৎ দুম করে বিয়ে করে বসলো। এটা আপনি কি করে ব্যাখ্যা করবেন?'

'দেখুন, আপনি যদি আমাকে যুক্তিযুক্ত আর সঙ্গতিসম্পন্ন কথা বলার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন তাহলে আমি বলবো যে তাদের ভালোবাসাটা একটু ভিন্ন ধরনের। শত হলেও, কামনা-বাসনাই তো বিয়ের একমাত্র কারণ নয়—হয়তো সব চাইতে জোরালো কারণও নয়। নিঃসঙ্গতার জন্যে কিংবা দুজন দুজনার সুবন্ধু বলে অথবা সুবিধের খাতিরেও মানুষ বিয়ে করতে পারে। যদিও আমি বলেছি যে স্নেহ প্রেমের সব চাইতে বড়ো শত্রু, কিন্তু সেটা যে একটা ভীষণ ভালো বিকল্পও বটে তা আমি কক্ষণো অস্বীকার করবো না। আমি সঠিক বলতে প্যারবো না, তবে স্নেহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিয়েটাই হয়তো সব চাইতে বেশ সুখের হয়।'

'টিম হার্ডি'র সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?'

ফেদারস্টোনের আকস্মিক প্রশ্নটা শুনে আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম, কারণ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রশ্নটার কোনোই সম্পর্ক নেই।

'তেমন করে কিছু ভেবে দেখিনি, তবে বেশ ভালো বলেই তো মনে হলো।'

'কেন?'

'ওকে কি ঠিক আর পাঁচজনের মতো মনে হলো?'

'হ্যাঁ! কেন, ওর মধ্যে কোনো বিশেষত্ব আছে নাকি? আগে বললে আরও একটু খেয়াল করে দেখতাম।'

'ও খুব চুপচাপ, তাই না? যে ওর কথা কিচ্ছু জানে না, সে বোধহয় আর দ্বিতীয় বার ওর কথা চিন্তা করবে না।'

আমি লোকটার চেহারা মনে করার চেষ্টা করতে লাগলাম। তাস খেলার সময় শুধু যে জিনিসটা আমার নজরে এসেছিলো তা হচ্ছে ওর সুন্দর হাত দুটি। অলস ভাবনায় মনে হয়েছিলো, একজন প্ল্যান্টারের হাত এতো সুন্দর হবে বলে আশা করা যায় না। কিন্তু আর পাঁচজনের তুলনায় একজন প্ল্যান্টারের হাত কেন অন্য রকম হবে, তা আমি চিন্তা করার কথা ভাবিনি। ওর হাত দুটো খানিকটা বড়োসড়ো, তবে সুগঠিত। লম্বা লম্বা আঙুল, নখগুলোও সুন্দর। পুরুষালি, অথচ অদ্ভুত অনুভূতিশীল। হাত দুটো আমি দেখেছিলাম, তবে তা নিয়ে আর ভাবিনি। কিন্তু লেখক হলে দীর্ঘ দিনের অভ্যেস আর সহজাত প্রবৃত্তির বশে

এমন অনেক স্মৃতিই মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে, যেগুলোর সম্পর্কে মানুষ নিজেও সচেতন থাকে না। মাঝে মাঝে অবিশ্যি বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো মিল থাকে না—যেমন, অবচেতন মনে থাকা কোনো মোটাসোটা কালো চেহারার মহিলা বাস্তবে হয়তো নেহাতই ছোটোখাটো, সাধারণ—কিন্তু এহ বাহ্য। প্রকৃত সত্যের চাইতে অস্পষ্ট স্মৃতি অনেক সময়েই অনেক বেশি সঠিক হতে পারে। এবং এখন স্মৃতির অতল থেকে মানুষটির একটা ছবি খুঁজে বের করতে গিয়ে আমি কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তা অনুভব করলাম। ওর মুখটা পরিষ্কার করে কামানো, ডিম্বাকৃতি, কিন্তু শীর্ণ নয়। বিষুব সূর্যের তাপে দীর্ঘ দিন ধরে পুড়ে মুখটা তামাটে হয়ে গেছে, অথচ তার তলায় তলায় কেমন যেন একটা অদ্ভুত ফ্যাকাশে ভাব। নাক-মুখ-চোখ ভোঁতা ভোঁতা। গোল চিবুকটাতে যেন খানিকটা দুর্বলতার আভাস—জানি না এটা আমার মনে পড়লো, নাকি এইমাত্র কল্পনা করে নিলাম। মাথার ঘন বাদামী চুলগুলো সবেমাত্র ধূসর হয়ে উঠতে শুরু করেছে। দীর্ঘ এক-গুচ্ছ চুল অনবরত ওর কপালে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর ও অভ্যেসের বশে এক ঝাঁকুনিতে সেগুলোকে পেছনে ঠেলে সরিয়ে দেয়। বাদামী চোখ দুটো শান্ত, আয়ত আর হয়তো বা একটু বিষণ্ণ। ওর ওই চোখ দুটোতে এক ধরনের ছলোছলো কোমলতা আছে যা ভীষণ হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠতে পারে বলে আমার ধারণা।

খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর ফেদারস্টোন ফের বলতে লাগলেন, 'এতোগুলো বছর বাদে এখানে টিম হার্ডির সঙ্গে আমার দেখা হওয়াটাই খানিকটা আশ্চর্য-জনক। কিন্তু মালয়ে এমনটিই ঘটে থাকে। সকলেই নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এবং দেশের এক অঞ্চলে যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো, সম্পূর্ণ অন্য এক জায়গায় ফের তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সিবুকুর কাছাকাছি একটা তালুকে থাকার সময় টিমের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আপনি ওখানে কখনও গেছেন?'

'না। সেটা কোথায়?'

'উত্তরে, শ্যামের দিকে। গেলে আপনার ভালো লাগবে। জায়গাটা মালয়ের অন্য যে কোনো জায়গার মতো, কিন্তু বেশ ভালো। ওখানে ছোট্ট একটা জমাটি ক্লাব ছিলো। সেখানে স্কুলের শিক্ষক, পুলিসের বড়োকর্তা, ডাক্তারবাবু, পাদ্রী সাহেব আর সরকারী এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক যেতেন। আর যেতো কয়েকজন প্ল্যান্টার এবং তিন চার জন মহিলা। আমি তখন সেখানকার সহকারী জেলা অফিসার। সেটা আমার প্রথম দিককার চাকরি। ওখান থেকে মাইল পঁচিশেক দূরে টিম হার্ডির একটা তালুক ছিলো। সেখানে ও আর ওর বোন থাকতো। ওদের সামান্য কিছু পয়সা-কড়ি ছিলো, তাই দিয়ে ওরা ওই জায়গাটা কিনেছিলো। তখন রবারের দিব্যি রমরমা বাজার, টিমের ব্যবসাও আদৌ খারাপ চলছিলো না। আমাদের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিলো। অবিশ্যি বাগান-মালিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-তার ব্যাপারটা ভাগ্যের ওপরে নির্ভর করে। ওদের মধ্যে কয়েকজন খুবই ভালো, কিন্তু ওরা ঠিক...' অহঙ্কারী না শোনায় এমন একটা শব্দ বা শব্দসমষ্টি খুঁজতে খুঁজতে ফেদারস্টোন ফের বললেন, 'মানে, দেশে থাকলে কেউ ওই ধরনের লোকের

সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে চাইবে না। কিন্তু টিম আর অলিভ ছিলো একেবারে আমাদের নিজস্ব শ্রেণীর মানুষ। আমি যা বলতে চাইছি, আশা করি আপনি তা বুঝতে পেরেছেন।'

'অলিভ কি ওর বোন?'

'হ্যাঁ। ওদের অতীত খানিকটা দুর্ভাগ্যজনক। ওরা যখন খুবই ছোটো—সাত আট বছর বয়েস—তখন ওদের মা-বাবার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। মা নেন অলিভকে আর টিম থেকে যায় ওর বাবার সঙ্গে। টিম তখন ক্লিফটনে চলে যায়, শুধু ছুটির সময় সে দেশে ফিরতো। তার বাবা নৌ বিভাগ থেকে অবসর নিয়ে ফোওয়েতে থাকতেন। ওদিকে অলিভ মায়ের সঙ্গে ইতালিতে চলে যায়। ফ্লোরেন্সে ও লেখাপড়া করে। ইতালিয় আর ফরাসী ভাষায় ও নিখুঁতভাবে কথা বলতে পারতো। এতোগুলো বছর টিম আর অলিভের মধ্যে কোনোদিনও দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু ওরা পরস্পরকে নিয়মিত চিঠি লিখতো। যতোদূর বুঝেছি, বাবা মা যতোদিন একসঙ্গে ছিলেন ততোদিন ভাই বোনকে ঝগড়াঝাঁটি আর রাগা-রাগিতে ভরা একটা ঝোড়ো আবহাওয়ার মধ্যে বাস করতে হয়েছে—দুটি বিবাহিত নরনারীর মধ্যে মনের মিল না থাকলে যেমনটি হয় আর কি। এর ফলে দুই ভাই-বোন বাধ্য হয়ে শুধু নিজেদের নিয়েই থাকতো। কেউই ওদের তেমন দেখা শুনো করতো না। তারপর মিসেস হার্ডি মারা গেলেন, অলিভ ইংলণ্ডে বাবার কাছে ফিরে এলো। ওর বয়েস তখন আঠারো আর টিমের সতেরো। এক বছর বাদে যুদ্ধ লাগলো। টিম যুদ্ধে যোগ দিলো। ওদের বাবার বয়েস তখন পঞ্চাশের ওপরে, তিনিও পোর্টসমাউথে কি একটা কাজ পেয়ে গেলেন। ভদ্রলোক বোধহয় প্রচুর পরিমাণে মদ খেতেন। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং দীর্ঘকাল রোগে ভুগে মারা যান। টিমদের বোধহয় কোনো আত্মীয় স্বজন ছিল না, এক প্রাচীন বংশের ওরাই শেষ বংশধর। ডরসেটশায়ারে ওদের সুন্দর একটা বাড়ি ছিলো, বহু পুরুষ আগেকার পুরনো বাড়ি—কিন্তু সে বাড়িতে বাস করার মতো সামর্থ্য ওদের কোনোদিনও হয়নি। চিরদিনই সেটা ভাড়া দেওয়া থাকতো। মনে আছে বাড়িটার ছবি আমি দেখেছিলাম। ধূসর পাথর দিয়ে তৈরি একেবারে রাজকীয় অট্টালিকা—সদর দরজায় বংশের প্রতীক চিহ্ন, খাড়া গরাদ লাগানো সুন্দর জানলা। ওদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিলো, ওই বাড়িতে বাস করার মতো যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করা। এই নিয়ে ওরা অনেক কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা করতো। দুজনের কেউই বিয়ে করার কথা বলতো না। এমনভাবে কথাবার্তা বলতো যেন ওরা দুটিতে চিরদিন একসঙ্গে থাকবে, এটাই স্থির হয়ে আছে। ব্যাপারটা খানিকটা মজাদার, কারণ দুজনেরই তখন নেহাতই কাঁচা বয়েস।'

'তখন ওদের বয়েস কতো?' আমি জিগেস করলাম।

'টিমের সম্ভবত পঁচিশ ছাব্বিশ, আর অলিভ তার থেকে এক বছরের বড়ো। আমি প্রথম যখন সিবুকুতে যাই তখন ওরা আমার সঙ্গে ভীষণ ভালো ব্যবহার

করেছিলো। সম্ভবত আমাকে দেখেই ওদের ভালো লেগে গিয়েছিলো। ওখানকার অধিকাংশ লোকের চাইতে আমার সঙ্গে ওদের অনেক বেশি মিল ছিলো। ওখানে ওরা তেমন জনপ্রিয় ছিলো না। সম্ভবত আমার সাহচর্য ওদের খুশি করেছিলো।'

'জনপ্রিয় ছিলো না কেন?'

'ওরা খানিকটা চুপচাপ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। অন্যদের চাইতে নিজেদের সংসর্গই যে ওদের বেশি পছন্দ, সেটা খুব স্পষ্টই বোঝা যেতো। আপনি কখনও লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, কিন্তু এতে মানুষ রেগে যায়। কাউকে ছাড়াই আপনার দিব্যি চলে যায়, এটা বুঝতে পারলে মানুষ ক্ষুব্ধ হয়, বিরক্ত হয়ে ওঠে।'

'বড্ড ঝামেলার ব্যাপার, তাই না?'

'টিম নিজেই নিজের মালিক, তার আর্থিক সংস্থান আছে—অন্য বাগান-মালিকদের কাছে এটা খানিকটা ক্ষোভের কারণ ছিলো। যাতায়াতের জন্যে তাদের হয়তো একটা পুরনো ফোর্ডের ওপরে নির্ভর করতে হয়, ওদিকে টিম সুন্দর একটা গাড়ির মালিক। টিম আর অলিভ ক্লাবে গেলে সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতো, প্রতিযোগিতামূলক টেনিস বা ওই ধরনের অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করতো—কিন্তু বোঝা যেতো, ওরা ওখান থেকে চলে যেতে পারলেই খুশি হয়। ওরা অন্যদের সঙ্গে বাইরে খাওয়াদাওয়া করতো, মধুর ব্যবহারে নিজেদের উপস্থিতি ভারি মনোরম করে তুলতো। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যেতো, যতো শীগগিরি সম্ভব ওরা বাড়িতে ফিরতে পারলে বাঁচে। অবিশ্যি কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই এজন্যে ওদের দোষ দেবে না। বাগান মালিকদের বাড়িতে আপনি তেমন গেছেন কিনা জানি না। তাদের ঘরদোর কেমন যেন বিষাদময়। এক গাদা পলকা আসবাব, রুপোর গৃহসজ্জা, বাঘের ছাল আর অখাদ্য খাবারদাবার। কিন্তু হার্ডি'রা নিজেদের বাংলোটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিলো। খুব একটা জাঁক জমক কিছু নেই—কিন্তু সহজ, ঘরোয়া আর আরামদায়ক। বসার ঘরটা ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চলের যে কোনো বাড়ির বৈঠকখানা ঘরের মতো। বোঝা যেতো নিজেদের জিনিসপত্রগুলো ওদের খুব প্রিয় এবং সেগুলো বহুদিনের পুরনো। থাকার পক্ষে বাড়িটা অতি চমৎকার। বাংলোটা টিমের তালুকের মাঝখানে, ছোট্ট একটা টিলার এক ধারে। ওখান থেকে তাকালে রবার গাছগুলোর মাথার ওপর দিয়ে দূরের সমুদ্রটা দেখা যায়। অলিভ ওর বাগান নিয়ে খুব খাটতো এবং বাগানটা ছিলো সত্যিই অপূর্ব। কলাবতী ফুলের অমন শোভা আমি আর কোনোদিনও দেখিনি। সপ্তাহ শেষের দিনগুলোতে আমি ওদের ওখানে যেতাম। ওখান থেকে সমুদ্র গাড়িতে মাত্র আধঘন্টার পথ। আমরা সঙ্গে খাবারদাবার নিয়ে যেতাম। স্নান করতাম, নৌকো চালাতাম। টিম ওখানে একটা নৌকো রেখে দিয়েছিলো। ভারি চমৎকার ছিলো দিনগুলি। জীবনকে অতোটা উপভোগ করা যায় তা আমি আগে জানতাম না। সৈকতটা ভারি সুন্দর এবং সত্যিই অস্বাভাবিক রোম্যান্টিক। সন্ধ্যাবেলা আমরা পেশেন্স বা দাবা খেলতাম কিম্বা গ্রামোফোন বাজাতাম।

রান্নাবান্নাও ভীষণ ভালো হতো। সাধারণভাবেসকলে যা খেতো, তার তুলনায় ওদের বাড়ির খাওয়াদাওয়াটা ছিলো অন্য রকম। অলিভ ওদের রাঁধুনিকে সমস্ত রকম ইতালিয় রান্নাবান্না শিখিয়ে দিয়েছিলো এবং আমরাও ওদের ওখানে গিয়ে এন্তার ম্যাকারনী, রিসোত্তো, নচ্চি আর ওই ধরনের খাবারগুলো গিলতাম। আমি ওদের হিংসে না করে পারতাম না, এতো হাসিখুশি আর শান্তিময় ছিলো ওদের জীবন। ওরা যখন বলাবলি করতো চিরদিনের মতো ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে ওরা কি করবে, তখন আমি বলতাম—এখানকার ফেলে যাওয়া জীবনটার জন্যে চিরদিন ওদের দুঃখ করতে হবে।

'এখানে আমরা সত্যিই খুব সুখে আছি,' অলিভ বলতো।

'টিমের দিকে ও এক বিশেষ ভঙ্গিমায় তাকাতো। তাকাতো ধীরে ধীরে, দীর্ঘ পল্লবগুলোর তলা দিয়ে এক আকর্ষণীয় বঙ্কিম দৃষ্টিতে।

'বাইরের তুলনায় নিজেদের বাড়িতে ওরা ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। সেখানে ওরা ভীষণ সহজ আর আন্তরিক। সকলেই এটা স্বীকার করতো এবং আমিও বলতে বাধ্য যে প্রত্যেকেরই ওদের বাড়িতে যেতে ভালো লাগতো। প্রায়ই ওরা একে তাকে বাড়িতে যেতে বলতো। মানুষকে সহজ করে তোলার গুণটা ওদের ছিলো। মানে, যাকে বলে সুখের সংসার। পরস্পরের প্রতি ওদের আন্তরিক অনুরাগ কারুরই নজর এড়াতো না। তবে লোকে ওদের যতোই অমিশুকে আর আত্মকেন্দ্রিক বলুক না কেন, ওদের ওই পারস্পরিক স্নেহ-প্রীতির মনোভাব প্রত্যেকেরই মনকে স্পর্শ করতো। সবাই বলতো, ওরা স্বামী-স্ত্রী হলেও ওদের মধ্যে এর চাইতে বেশি অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে পারতো না এবং কয়েকটি দম্পতির অবস্থা দেখে মনে হতো, ওদের জীবনের তুলনায় অধিকাংশ বিবাহিত জীবনই যেন ব্যর্থ। ওরা দুটিতে যেন একই সময় একই কথা ভাবতো। কিছু কিছু নিজস্ব রঙ্গরসিকতায় ওরা শিশুর মতো হাসতো। ওদের পারস্পরিক সম্পর্ক এতোই মধুর ওরা এতোই সুখী আর খুশিয়াল ছিলো যে মনে হতো ওদের সঙ্গে থাকাটা যেন সত্যিই এক আত্মিক সঞ্জীবনী। তাছাড়া একে আর কি বলা যায়, জানি না। কয়েকটা দিন ওদের বাংলোয় কাটিয়ে এলে আপনারও মনে হতো, ওদের খানিকটা শান্তি আর শান্ত-আনন্দ যেন আপনার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে···আপনার আত্মাটাকে যেন স্বচ্ছ শীতল জলধারায় ধুইয়ে দেওয়া হয়েছে—নিজেকে তখন অদ্ভুত পরিশুদ্ধ বলে মনে হতো আপনার।'

ফেদারস্টোনকে এভাবে আপ্রাণ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কথা বলতে দেখাটা আশ্চর্যের ব্যাপার। সাদা রঙের বাম-ফ্রিজার কোটে মানুষটাকে এতো সপ্রতিভ লাগছিলো, গোঁফ জোড়া এতো সুন্দরভাবে ছাঁটা, ঘন কোঁকড়া চুলগুলো এমন সযত্নে পরিপাটি করে আঁচড়ানো যে ওঁর মুখে এতো অজস্র কথা আমাকে খানিকটা অস্বস্তিতে ফেলে দিলো। তবে আমি বুঝতে পারছিলাম, অন্তর দিয়ে অনুভব করা একটা আবেগকে উনি নিজস্ব অপরিকল্পিত উপায়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন।

'অলিভ হার্ডি দেখতে কি রকম ছিলো?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'দেখাচ্ছি। আমার কাছে ওর বেশ কিছু ছবি আছে।'

কুর্সি থেকে উঠে উনি তাক থেকে আমাকে একটা বড়োসড়ো অ্যালবাম এনে দিলেন। যথারীতি সাধারণ কিছু ছবি। কিছু গ্রুপ, কিছু একলা। পরনে সাঁতারের পোশাক, শর্টস কিংবা টেনিসের পোশাক। চোখ ধাঁধানো রোদে মুখ কোঁচকানো অথবা হাসির দমকে বিকৃত। হার্ডিকে আমি ছবি দেখেই চিনতে পারলাম। কপালের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়া একগুচ্ছ চুল। দশ বছরে খুব একটা বদলায়নি। তবে ছবিতে মানুষটাকে বেশ সুন্দর, সজীব আর তরুণ দেখাচ্ছে। অভিব্যক্তিতে একটা সতর্ক ভঙ্গিমা, যেটা রীতিমতো আকর্ষণীয়। সামনাসামনি যখন দেখেছি, তখন এটা আমি লক্ষ্য করিনি। জীবনের প্রতি আগ্রহে ওর চোখ দুটো যেন ঝিলমিলিয়ে উঠছে, ফিকে হয়ে আসা ছবিতেও এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। ওর বোনের ছবিগুলোও দেখলাম। সাঁতারের পোশাক পরে থাকায় বোঝা যাচ্ছে মেয়েটি সুগঠিতা, পুরুষ্ট কিন্তু ছিপছিপে শরীর, পা দুটি লম্বা কিন্তু পাতলা।

'দুজনকে দেখতে অনেকটা এক রকম,' আমি বললাম।

'হ্যাঁ। অলিভ এক বছরের বড়ো হলেও ওদের দিব্যি যমজ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়—এতো বেশি মিল। দুজনেরই ডিমের মতো মুখ, ফ্যাকাশে রঙ—গালেও কোনো রঙের ছোপ নেই। দুজনেরই কোমল বাদামী চোখ দুটি এতো করুণ আর টলটলে যে দেখে মনে হবে, ওরা যাই করুক না কেন আপনি কিছুতেই ওদের ওপরে রাগ করতে পারবেন না। দুজনের মধ্যেই এক ধরনের অমনোযোগী অন্যমনস্ক সৌষ্ঠব ছিলো যার জন্যে ওরা যা পরতো তাতেই মানিয়ে যেতো, অগোছালো থাকলেও আকর্ষণীয় লাগতো। টিম এখন বোধহয় সেটা খুইয়ে ফেলেছে, তবে আমি প্রথম যখন ওকে দেখি তখন ওর মধ্যে অবশ্যই ওই জিনিসটা ছিলো। ওরা আমাকে সর্বদাই ট্যুয়েলফথ নাইটের সেই ভাই-বোন দুটির কথা মনে করিয়ে দিতো। আমি কাদের কথা বলছি, বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই ?'

'ভায়োলা আর সিবাস্টিয়ান।'

'ওদের কখনও যেন ঠিক এ যুগের মানুষ বলে মনে হতো না। এলিজাবেথের যুগের কি যেন একটা রয়ে গিয়েছিলো ওদের মধ্যে। তখন আমার বয়েসটা খুবই কম, যে কোনো কারণেই হোক ওদের আমার আশ্চর্য রকমের রোম্যান্টিক লাগতো —শুধুমাত্র এটাই এর কারণ বলে মনে হয় না। কল্পনায় আমি দেখতে পেতাম, ওরা যেন প্রাচীন ইল্লিরিয়ার অধিবাসী।'

ছবিগুলোর দিকে ফের এক ঝলক তাকিয়ে বললাম, 'মনে হচ্ছে ভাইয়ের চাইতে মেয়েটির ব্যক্তিত্ব অনেক বেশি।'

'তা ঠিক। অলিভকে আপনি সুন্দরী বলতেন কি না জানি না, তবে ওর চেহারাটা ছিলো সাংঘাতিক আকর্ষণীয়। ওর মধ্যে কবিতার মতো কি যেন একটা ছিলো—যেন একটা গীতিকবিতার মাধুর্য—যা ওর চালচলন, ওর কাজকর্ম, ওর সমস্ত কিছুকেই রঙীন করে তুলতো···ওকে সাধারণ চিন্তা ভাবনার উর্ধ্বে তুলে রাখতো। ওর অভিব্যক্তিতে এমন এক অকপট সারল্য ছিলো, চালচলন ছিলো

এমন তেজোময় আর সংস্কারমুক্ত যে তা সাধারণ সৌন্দর্যকে স্রেফ নীরস আর নিষ্প্রভ করে তুলতো।'

'আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন আপনি ওর প্রেমে পড়েছিলেন,' ফেদার স্টোনের কথায় বাধা দিয়ে আমি বললাম।

'তা পড়েছিলাম বইকি, ভয়ঙ্করভাবেই পড়েছিলাম। আমি তো ভেবেছিলাম আপনি প্রথমেই এটা অনুমান করে নেবেন।'

'প্রথম দর্শনেই প্রেম নাকি ?'

'হ্যাঁ, সম্ভবত তাই। কিন্তু প্রথম মাসখানেক আমি তা বুঝতে পারিনি। আচমকা বুঝতে পারলাম, ওর সম্পর্কে আমার মনে যে অনুভূতিটা রয়েছে—কি করে বোঝাবো জানি না—সমস্ত কিছু তোলপাড় করে দেওয়া একটা প্রচণ্ড আলোড়নময় অনুভূতি, যা আমার অস্তিত্বের প্রতিটি অণুতে অণুতে ছড়িয়ে পড়েছে—আসলে তা প্রেম এবং তখনই বুঝলাম সেটা প্রথম থেকেই ছিলো। ওর ফ্যাকাশে ত্বকের মসৃণতা, কপালের ওপরে অবাধ্য চুলগুলোর আলতো হয়ে লুটিয়ে পড়ার ধরন, বাদামী রঙের চোখ দুটিতে সুগম্ভীর মিষ্টতা—সব মিলিয়ে ভারি লোভনীয় ওর রূপ। কিন্তু শুধুমাত্র রূপ নয়, ওর মধ্যে আরও কিছু ছিলো। ওর কাছে থাকলে মনের মধ্যে যেন একটা স্বস্তির অনুভূতি জেগে উঠতো, মনে হতো এবারে নিশ্চিন্ত মনে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা যায়, আমি যা নই তার ভান করার আর কোনো প্রয়োজন নেই। মনে হতো ওর পক্ষে কোনো রকম নীচতার আশ্রয় নেওয়া সম্ভব নয়, পরশ্রীকাতর বা পরনিন্দাকারী হিসেবে ওকে কল্পনা করাও অসম্ভব। ওর মধ্যে একটা স্বাভাবিক উদারতা ছিলো। কোনো কথাবার্তা না বলে একটা ঘন্টা ওর সঙ্গে চুপচাপ কাটিয়ে দিলেও মনে হতো দিব্যি সুন্দরভাবে কেটে গেলো সময়টা।'

'এ এক দুর্লভ গুণ,' আমি বললাম।

'সঙ্গী হিসেবে অলিভ ছিলো অপূর্ব। কিছু করার প্রস্তাব জানালে ও সর্বদা খুশি হয়েই তাতে লেগে পড়তো। আমার চেনাজানা মেয়েদের মধ্যে দাবি আদায় করে নেবার প্রবণতা ওর ছিলো সব চাইতে কম। কেউ কথা দিয়ে শেষ মুহূর্তে নিরাশ করলেও ওর ব্যবহারে কোনো রকমফের ঘটতো না। পরের বার দেখা হলে মানুষটার সঙ্গে ও আগের মতোই আন্তরিক ব্যবহার করতো, আগের মতোই অচঞ্চল হয়ে থাকতো।'

'আপনি ওকে বিয়ে করলেন না কেন ?'

ফেদারস্টোনের চুরুটটা নিভে গিয়েছিলো। ওটার শেষাংশটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উনি ধীরে সুস্থে ফের একটা চুরুট ধরিয়ে নিলেন। খানিকক্ষণ আমার প্রশ্নটার কোনো জবাবই দিলেন না। নিজের একান্ত গোপন কথা উনি একটা অজানা অচেনা লোককে বিশ্বাস করে বলে দেবেন—একটা প্রচণ্ড সভ্য রাষ্ট্রে যাঁদের বাস, তাঁদের কাছে এটা আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমি এতে অভ্যস্ত ছিলাম। পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাঁদের বাস; তাঁরা এক ভয়াবহ

নিঃসঙ্গতায় দিন যাপন করেন। যে সমস্ত কথা হয়তো কয়েক বছর ধরে তাঁদের জাগরণের চিন্তা আর রাতের স্বপ্নকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে, তা তাঁরা এমন কাউকে বলে স্বস্তি পেতে চান যাঁর সঙ্গে জীবনে তাঁর আর হয়তো কোনোদিনই দেখা হবে না। আমার কেমন যেন মনে হয়, মানুষটা লেখক হলে ওঁদের আস্থা আরও সহজে আসে। ওঁরা মনে করেন, ওঁদের কাহিনী এক নৈর্ব্যক্তিক পথে লেখকের মনে আগ্রহের সঞ্চার করে এবং তার ফলে ওঁদের পক্ষে মন খুলে কথা বলা আরও সহজ হয়ে ওঠে। তাছাড়া নিজস্ব অভিজ্ঞতায় আমরা প্রত্যেকেই জানি, নিজের সম্পর্কে কথা বলতে কখনই খারাপ লাগে না।

'ওকে বিয়ে করেননি কেন?'

'করতে চাইতাম, ভীষণভাবেই চাইতাম,' অবশেষে ফেদারস্টোন জবাব দিলেন। 'কিন্তু ওকে তা জিগেস করতে দ্বিধা জাগতো। ও সব সময়েই আমার সঙ্গে এতো ভালো ব্যবহার করতো, ওর সঙ্গে মানিয়ে চলা এতো সহজ, আমরা এতো ভালো বন্ধু—অথচ সর্বদাই মনে হতো ওর মধ্যে যেন কি একটা রহস্য রয়ে গেছে। ও ভীষণ সহজ সরল অকপট আর স্বাভাবিক—কিন্তু ওর নিরাসক্তির গভীরতম কেন্দ্রবিন্দুটাকে যেন কিছুতেই অতিক্রম করা যেতো না। রহস্য নয়, মনের গভীরে ও যেন প্রাণের কোনো গোপনতাকে সর্বদা সতর্ক প্রহরায় আড়াল করে রাখতো—যাতে কোনোদিন কোনো জীবিত মানুষ তার হদিশ না পায়। জানি না কথাটা আমি স্পষ্ট করে বোঝাতে পারলাম কি না।'

'মনে হয় পেরেছেন।'

'এ জন্যে আমি ওর প্রথম জীবনের ইতিহাসকে দায়ী করেছিলাম। ওরা কক্ষণো ওদের মায়ের কথা বলতো না। কিন্তু কেন জানি না আমার ধারণা হয়েছিলো. উনি ছিলেন স্নায়বিক রোগগ্রস্ত এক আবেগপ্রবণ মহিলা। উনি নিজের সুখশান্তিকে ধ্বংস করেছিলেন এবং ওদের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের কাছেই বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিলেন। আমার সন্দেহ, ফ্লোরেন্সে উনি খানিকটা অস্থির জীবন যাপন করতেন। অলিভের ওই অপরূপ প্রশান্তি অর্জনের মূলে কারণ ওর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সন্নিষ্ঠ প্রয়াস। নানান ধরনের লজ্জাজনক ঘটনার তথ্য থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে ও নিজের চতুর্দিকে নিরাসক্তির এক দুর্গ গড়ে তুলেছিলো। অবিশ্যি ওর ওই নিরাসক্তি—নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার ভঙ্গিমাটুকুও—ছিলো সাংঘাতিক আকর্ষণীয়। যদি ও কোনোদিনও ভালোবাসে, যদি কখনও ওর সঙ্গে বিয়ে হয় তাহলে অবশেষে সেই গোপন রহস্যের কেন্দ্রে পৌঁছনো যাবে—এ কথা ভাবলেও এক অদ্ভুত উত্তেজনা হতো। মনে হতো ওর সঙ্গে যদি সেই রহস্যের অংশ ভাগ করে নেওয়া যায় তাহলে সেটা হবে জীবনের সব চাইতে বড়ো প্রাপ্তি। হয়তো স্বর্গের আনন্দ তাতে থাকবে না। কিন্তু আমার মনে হতো, রহস্যটা যেন সেই রূপকথার দুর্গে নিষিদ্ধ কুঠুরির মতো। সব কটা ঘরই খোলা, কিন্তু চাবি বন্ধ করে রাখা শেষ ঘরটাতে না যাওয়া অব্দি আমার শান্তি নেই।'

হঠাৎ একটা টক-টক শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি, দেয়ালের অনেক উঁচুতে

বাদামী রঙের একটা টিকটিকি। একেবারে নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে টিকটিকিটা একটা পতঙ্গকে লক্ষ্য করছিলো। আচমকা সেটা দ্রুত এগুতে লাগলো, কিন্তু পতঙ্গটা উড়ে যেতেই টিকটিকিটা যেন একটা ঝাঁকুনি খেয়ে ফের সেই অদ্ভুত নিশ্চল অবস্থায় ফিরে গেলো।

'আরও একটা কারণে আমি দ্বিধা করছিলাম। আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে আমাকে ও আর আগের মতো ওদের বাংলোতে যেতে দেবে না—এই চিন্তাটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না। ওদের বাংলোয় যেতে আমার ভীষণ ভালো লাগতো, ওর সঙ্গ আমাকে অসামান্য সুখে ভরিয়ে তুলতো। কিন্তু জানেনই তো, মাঝে মাঝে মানুষ কিছুতেই নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। তাই শেষ অব্দি একদিন আমি কথাটা ওকে জিগেস করলাম—প্রায় দৈবক্রমেই ঘটে গেলো ব্যাপারটা। একদিন সন্ধ্যাবেলা খাওয়াদাওয়ার পর আমরা দুজনে বারান্দায় বসে ছিলাম। এক সময় আমি ওর হাতটা তুলে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতটা টেনে নিলো ও।

'এমন করলে কেন'? আমি ওকে জিগেস করলাম।

'কেউ আমাকে স্পর্শ করলে আমার খুব একটা ভালো লাগে না'। মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে মৃদু হাসলো অলিভ। 'আমার কথায় তুমি আঘাত পেলে? কিছু মনে করো না, লক্ষ্মীটি। আসলে এটা আমার একটা আশ্চর্য অনুভূতি, আমি কিছুতেই এটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি না'।

'তুমি কখনও বুঝতে পেরেছো কিনা জানি না, কিন্তু আমি তোমার প্রচণ্ড অনুরাগী'।

'আমাকে তখন নিশ্চয়ই খুব বোকা বোকা দেখাচ্ছিলো। এর আগে আমি কখনও কাউকে বিয়ের প্রস্তাব জানাইনি কি না!' ফেদারস্টোন ছোট্ট একটা আওয়াজ করলেন। আওয়াজটা ঠিক চাপা হাসির নয়, আবার দীর্ঘশ্বাসও নয়। 'সত্যি বলতে কি, সেই থেকে আর কাউকেই জানাইনি। এক মিনিট অলিভ কিছুই বললো না! তারপর বললো, শুনে খুব খুশি হলাম। কিন্তু তুমি তার চাইতে বেশি কিছু হও, তা আমি চাই না'।

'কেন'?

'আমি কোনোদিনও টিমকে ছেড়ে যেতে পারবো না'।

'কিন্তু ধরো, সে যদি বিয়ে করে'?

'কোনোদিনও করবে না'।

'আমি তখন এতোদূর এগিয়ে গেছি যে ভাবলাম, প্রসঙ্গটা নিয়ে ওর সঙ্গে আরও কথাবার্তা বলি। কিন্তু গলাটা এমন শুকিয়ে গেছে যে কোনো কথাই বেরুচ্ছে না। উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। তবু বললাম, 'আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি, অলিভ। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই—দুনিয়ার আর কোনো কিছুই এমন করে চাই না'।

'আলতো করে আমার বাহুতে একখানা হাত রাখলো অলিভ, ঠিক যেন একটা

ফুল ঝরে পড়লো মাটিতে।

'না। লক্ষ্মীটি শোনো, আমি তা পারবো না'।

'আমি চুপ করে রইলাম। কারণ আমি যা বলতে চাইছিলাম, তা আমার পক্ষে বলা শক্ত। এমনিতেই আমি একটু লাজুক। তা ছাড়া অলিভ একটা মেয়ে—আমি ওকে একথা বলতে পারি না যে স্বামীর সঙ্গে বাস করা আর ভাইয়ের সঙ্গে বাস করা ঠিক এক ব্যাপার নয়। ও একটা সুস্থ স্বাভাবিক মেয়ে। ও নিশ্চয়ই সন্তানের মা হতে চায়। প্রাকৃতিক প্রবৃত্তিগুলোকে দমিয়ে রাখাটা আদপেই যুক্তিসঙ্গত নয়, সেটা যৌবনের একেবারে অর্থহীন অপচয়।

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত অলিভই আগে কথা বললো, 'ওসব কথা বরং থাক, কেমন ? জানো, দু-একবার আমার মনে হয়েছে, হয়তো তুমি আমাকে ভালোবাসো। টিমও সেটা লক্ষ্য করেছে। আমার কিন্তু তখন দুঃখ হয়েছে। কারণ আমার ভয় হয়েছিলো, হয়তো এর ফলে আমাদের বন্ধুত্বটা ভেঙে যাবে। আমি তা চাই না, মার্ক! আমাদের তিনজনের মধ্যে এতো মিল…এতো আনন্দে আমাদের সময় কাটে। এখন তুমি না থাকলে আমরা যে কি করবো জানি না'।

'সেটা আমিও ভেবেছি'।

'তোমার কি মনে হয়, তার কোনো প্রয়োজন আছে' ?

'না, আমি তা চাই না। এখানে আসতে যে আমার কতোটা ভালো লাগে, তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। এর আগে আমি কোথাও এতো আনন্দে থাকিনি'।

'তুমি আমার ওপরে রাগ করোনি তো' ?

'রাগ করবো কেন ? তোমার তো কোনো দোষ নেই! এর অর্থ শুধু এই যে তুমি আমাকে ভালোবাসো না। বাসলে, টিমের জন্যে তুমি এতোটুকুও চিন্তা করতে না'।

'তুমি ভারি মিষ্টি', গলা জড়িয়ে ধরে আলতো করে আমার গালে একটা চুমু দিলো অলিভ। আমার কেমন যেন মনে হলো, এই ঘটনাটাই ওর মনের মধ্যে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কটাকে সুনির্দিষ্ট করে দিলো। আমাকে ও নিজের দ্বিতীয় ভাই হিসেবে গ্রহণ করে নিলো।

'কয়েক সপ্তাহ বাদেই টিম ইংলণ্ডে ফিরে গেলো। ওদের ডরসেটের বাড়ি থেকে ভাড়াটে উঠে যাবে। যদিও অন্য একজন ভাড়াটে ঠিক হয়ে এসেছিলো তবু টিমের মনে হলো, কথাবার্তা চালাবার জন্যে তার সেখানে থাকা উচিত। বাগানের কাজকর্মের জন্যে তার কয়েকটা নতুন যন্ত্রপাতিরও দরকার ছিলো। টিম ঠিক করলো এই সঙ্গে সে সেগুলোও কিনে আনবে। সব মিলিয়ে মাস তিনেকের বেশি সময় লাগবে না। অলিভ ঠিক করলো, ও আর শুধু শুধু টিমের সঙ্গে যাবে না। ইংলণ্ডে ও প্রায় কাউকেই চেনে না, বলতে গেলে সেটা ওর কাছে বিদেশ। তাই এখানে একা থাকতেও ওর কোনো আপত্তি নেই, এই সময়টাতে ও বরং বাগানটার দেখাশুনো করতে পারবে। অবিশ্যি দেখাশুনো করার জন্যে একজন ম্যানেজার ওরা রাখতে পারে, কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই এক কথা নয়। রবারের বাজার পড়ে

আসছে। ইতিমধ্যে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তাই দুজনের মধ্যে একজনের বাগানে থাকাটাই ভালো। টিমকে কথা দিলাম, আমি অলিভের দেখাশুনো করবো এবং অলিভ প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময়ে আমাকে ডেকে পাঠাবে। আমি ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম বলে কোনো কিছুই বদলে যায়নি। আমরা এমনভাবে মেলামেশা করছিলাম যেন কিছুই হয়নি। টিমকে ও কিছু বলেছিলো কিনা জানি না। কিন্তু টিম এমন কোনো ইঙ্গিত প্রকাশ করেনি যাতে বোঝা যায় যে ব্যাপারটা সে জানে। আমি অবিশ্যি অলিভকে সেই আগের মতোই ভালো-বাসতাম, কিন্তু সেটা মনে মনে। আমার আত্মসংযম যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। আসলে আমার মনে হতো, আমার কোনো আশা নেই। মনে হতো শেষ অব্দি আমার ভালোবাসাটা অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে এবং আমরা দুজনে স্রেফ দুটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েই থাকবো। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে, সেটা কোনোদিনই হয়নি। এটা আমার পক্ষে এতো প্রচণ্ড আঘাত যে আমি কোনোদিনই এটা সামলে উঠতে পারলাম না।

'টিমকে বিদায় জানাতে অলিভ পেনাঙে গেলো। যখন ফিরে এলো, আমি স্টেশন থেকে ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিলাম। টিমের অনুপস্থিতিতে আমি ওদের বাংলোয় রাত কাটাতে পারতাম না, কিন্তু প্রতি রোববারই যেতাম। জলখাবার সেরে নিয়ে সমুদ্র-স্নান করতাম দুজনে। অনেকেই সহৃদয়তা দেখাবার প্রচেষ্টায় অলিভকে তাদের বাড়িতে গিয়ে থাকতে বলতো, কিন্তু অলিভ তাতে রাজি হতো না। নিজেদের বাগান ছেড়ে ও খুব কমই বেরুতো। আসলে ওর অনেক কাজ। প্রচুর পড়াশুনোও করতো। একাকীত্বের একঘেয়েমিতে কখনও বিরক্ত হতো না। মনে হতো নিজেকে নিয়েই ও দিব্যি সুখে আছে। কেউ বাড়িতে গেলে ও স্রেফ কর্তব্যের খাতিরে তাদের আপ্যায়ন করতো। ও চাইতো না কেউ ওকে অভদ্র বলে মনে করুক। কিন্তু ওই কর্তব্যটুকুই ওকে জোর করে করতে হতো। ও আমাকে বলেছে, শেষ অতিথিটিকে বিদায় নিতে দেখলে ও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবতো, এবারে ও বিনা বাধায় বাংলোয় শান্তিময় নির্জনতাটুকু আবার উপভোগ করতে পারবে। অলিভ ভারি অদ্ভুত মেয়ে। ওই বয়সের একটা মেয়ের পক্ষে পার্টি বা ওখানকার অন্যান্য ছোটোখাটো আনন্দ অনুষ্ঠান সম্পর্কে অমন নির্লিপ্ত উদাসীন হয়ে থাকাটা সত্যিই আশ্চর্যজনক। আত্মিক দিক দিয়ে, বুঝতে পারলেন, ও ছিলো সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর।

'অলিভকে যে আমি ভালোবাসি তা লোকে কি করে জানলো, আমি জানি না। আমার ধারণা আমি নিজে কোনোদিনও কাউকে কিছু বলিনি। কিন্তু এখানে সেখানে অনেকের কাছেই এমন ইঙ্গিত পেলাম যে তারা ব্যাপারটা জানে। জানতে পারলাম যে তাদের ধারণা, আমার জন্যেই অলিভ ওর ভাইয়ের সঙ্গে দেশে যায়নি। মিসেস সার্গিসন বলে এক মহিলা—এক পুলিস-গিন্নি—তো আমাকে জিগেস করেই বসলেন, কবে ওঁরা আমাকে অভিনন্দন জানাতে পারবেন। আমি অবিশ্যি এমন ভান দেখালাম যেন বুঝতেই পারছি না উনি কি বলতে চাইছেন,

কিন্তু ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে উৎরোলো না। কি চমৎকার অবস্থা! অলিভের কাছে আমি এতোই তুচ্ছ যে ও হয়তো ইতিমধ্যে পুরোপুরি ভুলেই গেছে, আমি ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। আমার প্রতি ও নির্দয় ছিলো, তা বলবো না—আমার ধারণা ওর পক্ষে কারুর ওপরেই নির্দয় হওয়া সম্ভব নয়—কিন্তু দিদি ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করে, আমার সঙ্গে ও ঠিক তেমনি সাধারণ ব্যবহার করতো। আমার চাইতে ও দু-তিন বছরের বড়ো ছিলো। আমাকে দেখলে ও সর্বদাই ভীষণ খুশি হয়ে উঠতো, কিন্তু আমার জন্যে নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে হাজির করার কথা ওর কোনোদিনই মনে হয়নি। আমার সঙ্গে ও আশ্চর্য রকমের ঘনিষ্ঠ ছিলো, কিন্তু সে সম্পর্কে ও নিজে আদৌ সচেতন ছিলো না। আসলে সারা জীবন ধরে চেনা মানুষটার সামনে কেউই নিজেকে বিশেষভাবে বিন্যস্ত করার কথা ভাবে না। ওর কাছে আমি যেন মানুষ নই, একটা পুরনো কোট—পরতে আরাম লাগে বলে পরে এবং পরে যা ইচ্ছে হয় তাই করে। আমি পাগল নই যে বুঝবো না, আমার প্রতি ওর মনোভাব প্রেম থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে।

'টিমের যেদিন ফেরার কথা তার তিন-চার সপ্তাহ আগে একদিন ওদের বাংলোয় গিয়ে দেখি, অলিভ কাঁদছে। আমি চমকে গেলাম। চিরদিনই ও ভীষণ শান্ত-সংযত। কোনোদিন কোনো কারণেই আমি ওকে বিচলিত হতে দেখিনি।

'জিগেস করলাম, 'কি ব্যাপার, কি হয়েছে'?

'কিছু না'।

'বলো লক্ষ্মীটি! কাঁদছিলে কেন'?

'তোমার চোখ দুটো এতো তীক্ষ্ন না হলেও পারতো,' অলিভ একটু হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো। 'আসলে আমারই বোকামো। এইমাত্র আমি টিমের কাছ থেকে একটা তার পেলাম, ও ফেরার দিনটা পেছিয়ে দিয়েছে'।

'আহারে বেচারী! তুমি নিশ্চয়ই খুব হতাশ হয়ে পড়লে, তাই না'?

'আমি দিন গুনছিলাম। ভাবছিলাম কবে ও ফিরবে'।

'দিনটা কেন পেছোলো, কিছু লিখেছে'?

'না, লিখেছে চিঠিতে জানাবে। আমি তোমাকে তারটা দেখাচ্ছি'।

'দেখলাম ও ভীষণ বিচলিত। ওর ধীরস্থির শান্ত চোখ দুটি আতঙ্কে ভরা, দুই ভুরুর মাঝখানে উদ্বেগের সামান্য কুঞ্চন। শোবার ঘরে গিয়ে ও মুহূর্তের মধ্যে তারবার্তাটা নিয়ে ফিরে এলো। পড়তে পড়তে অনুভব করলাম, ও একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে। যতোদূর মনে পড়ে তারটায় লেখা ছিলো: 'কোনোমতেই সাত তারিখে জাহাজে চাপতে পারছি না। ক্ষমা কোরো, লক্ষ্মীটি। চিঠিতে সব জানাচ্ছি। আন্তরিক ভালোবাসা সহ—টিম'।

'বললাম, 'যে যন্ত্রটা ও নিয়ে আসবে, সেটা হয়তো এখনও তৈরি হয়নি। সেটা না নিয়ে ও জাহাজে চাপতে পারছে না'।

'সেটা পরের জাহাজে এলে কি এমন ক্ষতি হতো? শেষ অব্দি ওটা তো

কিছুদিন পেনাঙে আটকে থাকবেই'।

'হয়তো বাড়ির ব্যাপারেও কিছু হতে পারে'।

'তাহলে সেটা আমাকে লেখেনি কেন? ও নিশ্চয়ই জানে আমি কি ভীষণ দুশ্চিন্তায় রয়েছি'!

'হয়তো সেটা ওর মাথায় আসেনি। আসলে বাড়ির লোক যে কিছুই জানে না, দূরে গেলে মানুষ সেটা ঠিক বুঝতে পারে না'।

'অলিভ ফের মৃদু হাসলো, তবে এবারে ওর হাসিতে খুশির পরিমাণ একটু বেশি।

'হয়তো তুমি ঠিকই বলছো। সত্যি বলতে কি, টিম একটু ওই রকমই। সব সময়েই ও খানিকটা ঢিলেঢালা, হালকা মেজাজের। হয়তো আমিই তিলকে তাল করে তুলছি। আমার এখন ধৈর্য ধরে ওর চিঠিটার জন্যে অপেক্ষা করা উচিত'।

'অলিভ যথেষ্ট আত্মনিয়ন্ত্রণসম্পন্ন মেয়ে। দেখলাম ইচ্ছেশক্তির আপ্রাণ প্রয়াসে ও নিজেকে সামলে নিলো। ওর দুই ভুরুর মাঝখানে জেগে ওঠা ছোট্ট রেখাটা মিলিয়ে গেলো, ফের সেই শান্ত প্রসন্ন কোমল মেয়েটি হয়ে উঠলো ও। চিরদিনই ও শান্ত, কিন্তু ওর সেদিনকার কোমলতা ছিলো এতোই স্বর্গীয় যে তা হৃদয়কে যেন ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়ে যায়। বাকি সময়টুকুতে দেখেছিলাম, সাধারণ বুদ্ধির সচেষ্ট প্রয়োগে ও মনের অস্থিরতাকে চেপে রেখেছে। ও যেন একটা অমঙ্গলের পূর্বাভাষ বুঝতে পেরেছিলো। যেদিন ডাক আসার কথা, তার আগের দিনও আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেদিন ওর মানসিক উদ্বেগটাকে আরও বেশি করুণ লেগেছিলো, কারণ উদ্বেগটা লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল ও। ডাক আসার দিনগুলোতে আমি একটু ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু ওকে কথা দিলাম, খবরটা শোনার জন্যে আমি পরে ওদের বাগানে যাবো। সেদিন সবেমাত্র রওনা দেবার কথা ভাবছি, এমন সময় ওদের সহিস গাড়ি নিয়ে এসে জানালো, ওদের আয়া খবর পাঠিয়েছে আমি যেন তক্ষুনি ওদের মালিকানের সঙ্গে দেখা করতে যাই। আয়া একটি বয়স্কা মহিলা, বেশ ভালো। আমি ওকে দু-এক ডলার বখশিস দিয়ে বলেছিলাম, বাগানে কোনো রকম গোলমাল হলে আমাকে যেন সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয়। এক লাফে আমি নিজের গাড়িতে উঠে পড়লাম। ওখানে পেঁাছে দেখি, আয়া আমার জন্যে সিঁড়িতেই অপেক্ষা করছে। বললো, 'আজ সকালে একটা চিঠি এসেছে'।

'ওর কথায় বাধা দিয়ে আমি এক ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। বৈঠকখানা ঘরটা ফাঁকা। ডাকলাম, 'অলিভ'! বারান্দায় ঢুকতেই আচমকা একটা আওয়াজ শুনে আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন হিম হয়ে উঠলো। আয়াটা আমার পেছন পেছন আসছিলো, এবারে ও অলিভের ঘরের দরজাটা খুলে দিলো। যে আওয়াজটা আমি শুনেছিলাম, সেটা অলিভের কান্নার আওয়াজ। ঘরে ঢুকে দেখি অলিভ বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে রয়েছে আর ওর মাথা থেকে পা অব্দি সর্বশরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে কান্নার দমকে।

'ওর কাঁধে হাত রেখে জিগেস করলাম, 'কি হয়েছে, অলিভ' ?

'কে' ? চিৎকার করে আচমকা এক লাফে উঠে দাঁড়ালো ও, যেন এক প্রচণ্ড আতঙ্কে ওর বোধশক্তি লুপ্ত হয়ে গেছে। তারপর বললো, 'ও তুমি' ! আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো ও—মাথাটা পেছন দিকে হেলানো, চোখ দুটো বোজা আর অজস্র ধারায় অশ্রু নেমে আসছে দুচোখ দিয়ে। 'টিম বিয়ে করেছে', রুদ্ধকণ্ঠে বললো অলিভ, যেন এক নিদারুণ যন্ত্রণায় মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠলো ওর।

'স্বীকার করতেই হবে, মুহূর্তের জন্যে এক উচ্ছ্বসিত আনন্দে আমি তখন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলাম। যেন ছোট্ট একটা বৈদ্যুতিক অভিঘাত শিহরণ জাগিয়ে তুললো আমার হৃৎপিণ্ডের গভীরে। মনে হলো এবারে আমার একটা সুযোগ এসেছে, হয়তো এবারে ও আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে। জানি ভয়ঙ্কর স্বার্থপরতা। কিন্তু খবরটা আমি পেয়েছিলাম একেবারে আচমকা আর আমার ওই মনোভাবও স্থায়ী ছিলো মাত্র এক মুহূর্ত। তারপরেই অলিভের নিদারুণ দুর্দশায় আমার মন গলে গেলো এবং তখন একমাত্র যে অনুভূতিটা আমি অনুভব করছিলাম, তা গভীর বেদনার, কারণ অলিভ এতে অসুখী। হাত বাড়িয়ে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে বললাম, 'লক্ষ্মীটি শোনো, আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। কিন্তু এখানে নয়—চলো আমরা বৈঠকখানায় বসে একটু আলোচনা করি'।

'বৈঠকখানার সোফায় বসে আমি আয়াকে হুইস্কি আর সাইফন নিয়ে আসতে বললাম। কড়া করে একটা পানীয় মিশিয়ে ওকে জোর করে একটু খাইয়ে দিলাম। তারপর ওকে জড়িয়ে ধরে, ওর মাথাটা আমার কাঁধে রাখলাম। ওকে নিয়ে আমি যা খুশি তাই করছিলাম, ও কোনোটাতেই বাধা দিচ্ছিলো না। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিলো ওর সমস্ত মুখখানা।

'কি করে ও পারলো ? কি করে' ? গুমরে উঠলো অলিভ।

'শোনো লক্ষ্মীটি', আমি বললাম, 'আগে হোক বা পরে হোক, একদিন তো এটা হতোই ! টিম একটা যুবক। তুমি কি করে আশা করেছিলে যে ও কোনো-দিনও বিয়ে করবে না ? এটাই তো স্বাভাবিক'।

'না না না,' হাঁপিয়ে উঠলো অলিভ।

'ওর শক্ত মুঠিতে একটা চিঠি ধরা রয়েছে দেখলাম। অনুমানে মনে হলো, ওটা টিমেরই চিঠি। জিগেস করলাম, 'কি লিখেছে' ?

'সন্ত্রস্ত ভঙ্গিমায় চিঠিটা ও বুকের কাছে আঁকড়ে রাখলো, যেন সেটা আমি ওর কাছ থেকে নিয়ে নেবো।

'লিখেছে, ওর আর কিছু করার ছিল না। লিখেছে, বাধ্য হয়েই বিয়েটা করতে হলো। কি অর্থ এর' ?

'দ্যাখো অলিভ, তুমি তো জানো—টিম দেখতে তোমার মতোই আকর্ষণীয়। ভারি সুন্দর চেহারা। হয়তো ও পাগলের মতো কোনো মেয়েকে ভালোবেসে ফেলেছে, মেয়েটিও তাই'।

'ওর মন এতো দুর্বল' ! অলিভ বিলাপের সুরে বললো।

'জিগেস করলাম, 'ওরা কি এখানে রওনা হচ্ছে' ?

'গতকাল ওরা জাহাজে চেপেছে। লিখেছে, ও বিয়ে করায় নাকি কিছুই এসে যাবে না—সবই আগের মতো থাকবে। পাগল ! এরপর আমি আর এখানে থাকি কি করে' ?

'অলিভ মৃগীরোগীর মতো কাঁদতে শুরু করলো। অমন শান্ত প্রকৃতির মেয়েকে আবেগে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তে দেখাটাও ভারি কষ্টের। চিরদিনই আমার মনে হয়েছে. ওর ওই অপরূপ অবিচল প্রশান্তি আসলে একটা মুখোশের মতো ওর মনের গভীর আবেগপ্রবণতাকে আড়াল করে রেখেছে। কিন্তু দুঃখ কষ্টের কাছে ওর অমন বেসামাল অবস্থা আমাকে স্রেফ ভেঙে চুরমার করে ফেললো। দুহাতে জড়িয়ে ধরে আমি ওকে চুমু খেলাম—চুমু খেলাম ওর চোখে, ওর ভিজে গাল দুটিতে, ওব চুলে। আমি কি করছি তা ও বোধহয় বুঝতেও পারেনি। আমিও তখন আবেগে এতো বিহ্বল যে আমারও কোনো বোধ ছিলো না বললেই চলে।

'এখন আমি কি করবো' ? করুণ সুরে প্রশ্ন করলো অলিভ।

'আমাকে বিয়ে করো না কেন' ?

'অলিভ আমার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো, আমি ছাড়লাম না। বললাম, 'আর যাই হোক. তাহলে তোমার সমস্যাটার একটা সমাধান তো হয়' !

'কি করে আমি তোমাকে বিয়ে করবো' ? অলিভ কঁকিয়ে উঠলো। 'আমি যে তোমার চাইতে বেশ কয়েক বছরের বড়ো' !

'কি বাজে বকছো ? মোটে তো দু-তিন বছর। ওতে আমি পরোয়া করি নাকি' ?

'না, না' !

'কেন না' ?

'আমি তোমাকে ভালোবাসি না'।

'তাতে কি এসে যায় ? আমি তো তোমাকে ভালোবাসি' !

'আর কি বলেছিলাম, আমি জানি না। বলেছিলাম আমি ওকে সুখী করতে চেষ্টা করবো। বলেছিলাম ও নিজে থেকে আমাকে যতোটুকু দেবে, তার চাইতে বেশি আমি কোনোদিনও ওর কাছ থেকে কিছু চাইবো না। আমি ওকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। আমার মনে হচ্ছিলো, টিম যেখানে থাকবে ও সেখানে থাকতে চায় না। তাই বলেছিলাম, শীগগিরি আমি বদলি হয়ে অন্য কোনো জেলায় চলে যাবো। ভেবেছিলাম হয়তো এতে ওর লোভ হবে। আমাদের দুজনার মধ্যে সমঝোতা যে খুব বেশি, সেটা ও অস্বীকার করতে পারেনি। খানিকক্ষণ বাদে ও যেন একটু শক্ত হলো। মনে হলো ও আমার কথাগুলো শুনছিলো। মনে হলো এবারে ও বুঝতে পারছে যে ও আমার আলিঙ্গনের মধ্যে রয়েছে এবং এতে ও শান্তি পাচ্ছে। ওকে আমি কয়েক ফোঁটা হুইস্কি খাওয়ালাম।

একটা সিগারেট দিলাম। অবশেষে মনে হলো এবারে ওর সঙ্গে একটু হালকা রসিকতা করা যায়।

'বললাম, 'বুঝলে, সত্যি বলতে কি আমি কিন্তু খুব একটা খারাপ মানুষ নই। এর চাইতে খারাপ মানুষও তো তোমার জুটতে পারতো'!

'তুমি আমাকে চেনো না,' অলিভ বললো, 'আমার সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না'।

'জেনে নিতে পারবো'।

'তুমি ভীষণ ভালো, মার্ক,' অলিভ সামান্য হাসলো।

'তুমি 'হ্যাঁ' বলো, অলিভ'! আমি মিনতি করে বললাম।

'একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বহুক্ষণ নিচের দিকে তাকিয়ে রইলো, একটুও নড়লো না। নিজের বাহুতে আমি ওর দেহের কোমলতা অনুভব করছিলাম। আমি প্রতীক্ষা করছিলাম। ভীষণ বিচলিত লাগছিলো নিজেকে, প্রতিটা মুহূর্তকে মনে হচ্ছিলো অন্তহীন।

'বেশ,' শেষ অব্দি অলিভ বললো। আমার আবেদন আর ওর জবাবের মাঝখানে যে খানিকটা সময় কেটে গেছে, সে সম্পর্কে ওর যেন কোনো খেয়ালই নেই।

'আমি তখন আবেগে এত বিহ্বল যে আমার আর কিছুই বলার ছিলো না। আমি ওর ঠোঁটে চুমু খেতে চাইছিলাম—কিন্তু ও মুখ ঘুরিয়ে রাখলো, কিছুতেই দিলো না। আমি অবিলম্বে বিয়েটা সেরে ফেলতে চাইছিলাম, কিন্তু ও কিছুতেই তাতে রাজি নয়। ও টিমের ফিরে আসা অব্দি অপেক্ষা করতে চাইছিলো। কখনও কখনও মানুষের মনের ভাবনা চিন্তাগুলোকে এতো পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায় যে তা মুখের কথাকেও ছাপিয়ে যায়। আমিও বুঝতে পারছিলাম, টিম যা লিখেছে তা ও ঠিক বিশ্বাস করে নিতে পারছে না। এখনও ওর মনে একটা করুণ আশা রয়ে গেছে যে পুরো ব্যাপারটাই একটা ভুল, আসলে শেষ অব্দি টিমের বিয়েটা হয়নি। কথাটা বুঝতে পেরে আমি মনের মধ্যে একটা নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম। কিন্তু আমি ওকে এতো ভালোবাসতাম যে আমি তা সহ্য করে গেলাম। আমি তখন যে কোনো দুঃখ-যন্ত্রণাই সহ্য করতে প্রস্তুত। আমি ওকে পুজো করতাম। আমরা যে বিয়ের জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সে কথাও ও কাউকে জানাতে বারণ করলো। ও আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলো, টিম না ফেরা অব্দি কথাটা আমি কাউকে বলবো না। বললো, সবাই ওকে অভিনন্দন জানাবে —এই ভাবনাটাই ওর কাছে অসহ্য। এমন কি টিমের বিয়ের খবরটাও ও কাউকে জানাতে দেবে না। এ ব্যাপারে ওর জেদ কিছুতেই ভাঙার নয়। আমার ধারণা অলিভ ভেবেছিলো, খবরটা ছড়িয়ে পড়লে তার মধ্যে একটা নিশ্চয়তার রঙ ধরবে এবং অলিভ সেটা চাইছিলো না।

'কিন্তু ব্যাপারটা ওর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিলো। পূর্বদেশে খবর জিনিসটা ভারি রহস্যজনক ভাবে ছড়ায়। প্রথমে টিমের বিয়ের খবরটা পেয়ে

অলিভ ওদের আয়ার শ্রুতির নাগালের মধ্যে কি বলেছিলো, আমি জানি না। তবে হার্ডি'র সহিস কথাটা নিয়ে গিয়ে সার্গিসনদের কানে তোলে এবং পরের বার আমি ক্লাবে যেতেই মিসেস সার্গিসন আমাকে আক্রমণ করে বসেন—'শুনলাম টিম হার্ডি নাকি বিয়ে করেছে' ?

'তাই বুঝি' ? কোনো কিছু স্বীকার না করে আমি বললাম।

'আমার অভিব্যক্তিহীন মুখের দিকে তাকিয়ে উনি মৃদু হেসে বললেন, ও'র আয়ার মুখে গুজবটা শুনে উনি অলিভকে ফোন করে জিগেস করেছিলেন, কথাটা সত্যি কিনা। অলিভ খানিকটা অদ্ভুতভাবে তার জবাব দিয়েছে। কথাটা ও ঠিক স্বীকার করেনি, কিন্তু বলেছে টিমের কাছ থেকে ও একটা চিঠি পেয়েছে এবং চিঠিতে টিম লিখেছে যে সে বিয়ে করেছে।

'অলিভ একটা অদ্ভুত মেয়ে,' মিসেস সার্গিসন বললেন। 'আমি বিস্তারিত ভাবে সব কিছু জানতে চাওয়ায় ও বললো, বিস্তারিত কিছুই ও জানে না। জিগেস করলাম, আনন্দে তোমার রোমাঞ্চ হচ্ছে না? ও তার কোনো জবাবই দিলো না।

'অলিভ টিমকে প্রচণ্ড ভালোবাসে, মিসেস সার্গিসন'। আমি বললাম, 'তাই স্বাভাবিক কারণেই টিমের বিয়ের খবরটা অলিভের কাছে একটা বিরাট আঘাত। টিমের স্ত্রীর সম্পর্কে ও কিছুই জানে না। তার জন্যেই ওর ভীষণ চিন্তা'।

'আচমকা মিসেস সার্গিসন প্রশ্ন করলেন, 'তা আপনারা কবে বিয়ে করছেন' ?

'কি অস্বস্তিকর প্রশ্ন' ! কথাটা আমি হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

'মহিলা তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, 'শপথ করে বলতে পারবেন যে আপনি বিয়ের ব্যাপারে ওর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নন' ?

'জেনেশুনে মহিলাকে মিথ্যে কথাটা বলতে ইচ্ছে করছিলো না। ও'কে নিজের চরকায় তেল দেবার কথাটাও আমি বলতে চাইছিলাম না। ওদিকে অলিভকে কথা দিয়েছি, টিম না ফেরা অব্দি আমি কাউকে কিছু বলবো না। তাই নিজেকে আড়াল করার চেষ্টায় বললাম, 'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি মিসেস সার্গিসন, বলার মতো কিছু হলে আপনিই সব চাইতে প্রথম সেটা শুনতে পাবেন। এখন শুধু এটুকু বলতে পারি যে অলিভকে আমি বিয়ে করতে চাই—পৃথিবীতে আর কোনো কিছুই তেমন করে চাই না'।

'টিম বিয়ে করেছে শুনে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি,' মিসেস সার্গিসন বললেন। 'আশা করি অলিভও খুব শীগগিরি আপনাকে বিয়ে করবে। ওরা দুজনে দুজনকে নিয়ে বড্ড বেশি ডুবে থাকতো, বড্ড বেশি অন্তরঙ্গতা—কেমন যেন একটা বিশ্রী অস্বাস্থ্যকর জীবন'।

'বলতে গেলে প্রায় প্রতিদিনই আমি অলিভের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। বুঝতে পারতাম আমি ওকে প্রেম নিবেদন করি, ও তা চায় না। যেতে আসতে ওকে শুধু চুমু দিয়েই আমি খুশি থাকতাম। আমার সঙ্গে ও খুব ভালো

ব্যবহার করতো—সদয় আর সুচিন্তিত ব্যবহার। বুঝতে পারতাম আমাকে দেখলে ও খুশি হয়, আমার চলে যাবার সময় হলে ওর মন খারাপ হয়। সাধারণত খানিকক্ষণের মধ্যেই ওর চুপ করে যাওয়া স্বভাব। কিন্তু এই সময়টাতে ও এতো কথা বলতো যা আমি আগে কখনও দেখিনি। অথচ ভবিষ্যৎ কিংবা টিম এবং তার স্ত্রীর কথা ও কক্ষনো বলতো না। ওর ফ্লোরেন্সের জীবন এবং ওর মায়ের সম্পর্কে অনেক কথা বলতো। মায়ের সঙ্গে থাকার সময় এক বিচিত্র নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছে ও। তখন ওর বেশির ভাগ সময়ই কাটতো চাকরবাকর আর গৃহশিক্ষিকাদের সঙ্গে। আমার সন্দেহ, ওর মা তখন কোনো না কোনো ইতালিয় কাউন্ট আর রুশ রাজকুমারদের সঙ্গে একের পর এক প্রেম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার ধারণা অলিভের যখন চৌদ্দ বছর বয়েস, তখনই পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিস ওর জানা হয়ে গিয়েছিলো। কাজেই ওর পক্ষে সম্পূর্ণ রীতিনীতি বর্জিত জীবনই স্বাভাবিক। আঠারো বছর বয়েস অব্দি যে দুনিয়ায় ও বাস করেছে সেখানে নিয়ম বা নীতির কথা কেউ উল্লেখও করতো না, কারণ সেখানে ওগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিলো না।

'যাই হোক, আস্তে আস্তে অলিভ যেন ফের ওর শান্ত স্বভাব ফিরে পেতে লাগলো। ওকে অমন ক্লান্ত আর বিবর্ণ না দেখালে ধরেই নিতাম যে টিমের বিয়ের খবরটার সঙ্গে ও নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। ঠিক করলাম টিম এসে পৌঁছুলেই আমি অলিভকে বিয়েটা সেরে ফেলার জন্যে জোর করবো। অল্প কয়েক দিনের ছুটি আমি চাইলেই পেতে পারি এবং ছুটিটা শেষ হবার আগেই আমি হয়তো অন্য কোনো জায়গায় বদলির বন্দোবস্ত করে ফেলতে পারবো। অলিভের এখন যা প্রয়োজন তা হচ্ছে হাওয়া বদল করা এবং নতুন নতুন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা।

'টিমের জাহাজ কবে পেনাঙে পৌঁছুবে, সে খবরটা আমরা অবিশ্যি এক দিনের মধ্যেই জেনে গেলাম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সে ট্রেন ধরার আগেই অলিভ সময়মতো সেখানে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে কিনা। ডাকঘরের প্রতিনিধিকে আমি লিখে দিলাম, পাকা খবরটা পেয়েই সে যেন পরিস্থিতিটা আমাকে তার করে জানিয়ে দেয়। তার পেয়ে সেটা অলিভের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখি, ও তক্ষুনি টিমের কাছ থেকে একটা তার পেয়েছে। জাহাজ নির্ধারিত সময়ের আগেই লেগে গেছে এবং টিম পরের দিনই এসে পৌঁছুচ্ছে। সকাল আটটায় ট্রেন আসার কথা, কিন্তু সেটা আসতে এক থেকে ছ ঘন্টা দেরি হতে পারে। আমার কাছে মিসেস সার্গিসনের একখানা আমন্ত্রণলিপি ছিলো। উনি অলিভকে লিখেছেন, অলিভ যেন আমার সঙ্গে ওঁর বাড়িতে গিয়ে সেখানেই রাতটা কাটায়। তাহলে ট্রেন আসার সঠিক খবরটা না আসা অব্দি ওকে আর আগে ভাগে স্টেশনে গিয়ে বসে থাকতে হবে না।

'আমি একটা প্রচণ্ড স্বস্তি পেলাম। মনে হলো, অবশেষে আঘাতটা যখন আসবে তখন সেটা অলিভকে আর তেমন করে দুঃখ দিতে পারবে না। এ কদিন ও নিজেকে তৈরি করে নিতে যা করেছে, তাতে এবারে তার একটা প্রতিক্রিয়া হতে

বাধ্য। হয়তো ভাইয়ের বউকে ওর ভালো লেগে যাবে। ওদের তিনজনের মধ্যে ভালোমতো বনিবনা না হবার কোনো কারণই নেই। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে অলিভ জানালো, টিম আর তার স্ত্রীকে আনতে ও স্টেশনে যাবে না।

'বললাম, 'ওরা কিন্তু ভীষণ হতাশ হবে'!

'আমি বরঞ্চ এখানেই অপেক্ষা করবো,' মৃদু হেসে অলিভ বললো। 'তুমি আর আমার সঙ্গে তর্ক কোরো না, মার্ক'। আমি একেবারে মনোস্থির করে ফেলেছি'।

'আমি যে আমার বাড়িতে সকালের জলখাবার তৈরি করার কথা বলে দিলাম!'

'বেশ তো। তুমি স্টেশনে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করো, তোমার বাড়িতেই ওদের নিয়ে যাও, ওদের জলখাবার খাওয়াও। তারপর ওরা না হয় এখানে আসবে। গাড়িটা আমি অবশ্যই পাঠিয়ে দেবো'।

'তুমি না থাকলে ওরা ওখানে জলখাবার খেতে চাইবে বলে মনে হয় না'।

'নিশ্চয়ই খাবে। ট্রেনটা সময় মতো চললে, ওরা এখানে পৌঁছুবার আগে খাওয়ার কথা চিন্তা করবে না। ট্রেনে আসতে আসতেই ওদের খিদে পেয়ে যাবে। তখন কিছু না খেয়ে ওরা এই এতোটা পথ গাড়ি হাঁকিয়ে আসতে চাইবে না'।

'আমি একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। এতোদিন কতো ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে ও টিমের পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করেছে আর আজ ও বাদে আমরা সবাই মিলে আনন্দ করে জলখাবার খাবো, অথচ ও একেবারে একা একা বাড়িতে পড়ে থাকতে চাইছে —এটা আমার কাছে কেমন যেন অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো ও খানিকটা বিচলিত এবং যে অচেনা মেয়েটি ওর জায়গাটা কেড়ে নিতে আসছে ও তার সঙ্গে দেখা করার সময়টা যথাসম্ভব পেছিয়ে দিতে চাইছে। ব্যাপারটা অযৌক্তিক, কারণ দেখাসাক্ষাৎটা এক ঘন্টা আগে বা পরে হলে কিছুই এসে যায় না। কিন্তু আমি জানতাম মেয়েরা ভারি বিচিত্র এবং যে কোনো কারণেই হোক আমার মনে হচ্ছিলো, অলিভের মেজাজের যা হাল তাতে আমার পক্ষে ওই ব্যাপারে ওকে জোর করাটা ঠিক হবে না।

'রওনা হবার সময় আমাকে একটা ফোন কোরো,' অলিভ বললো, 'তাহলে আমি বুঝতে পারবো তোমরা কখন এসে পৌঁছুবে'।

'বেশ, তবে আমি কিন্তু ওদের সঙ্গে আসতে পারবো না। ওইটে আমার লাহাদে যাবার দিন'।

'মামলা শোনার জন্যে সপ্তাহে একদিন আমাকে লাহাদ শহরে যেতে হতো। শহরটা বেশ দূরে, নদী পার হয়ে যেতে হয় এবং তাতে এতোটা সময় লাগে যে রাত গভীর হবার আগে আমি কিছুতেই ফিরে আসতে পারি না। ওখানে সামান্য কয়েকজন ইউরোপীয় থাকতেন, একটা ক্লাবও ছিলো। খানিকটা সামাজিকতা রক্ষার খাতিরে এবং সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা তা দেখার জন্যে সাধারণত আমাকে ওই ক্লাবেও যেতে হতো।

'তাছাড়া টিম এই প্রথম তার বউকে বাড়িতে নিয়ে আসছে'। আমি ফের বললাম, 'আমার মনে হয় না এখানে আমার উপস্থিতি ওর ভালো লাগবে। তবে তুমি যদি রাত্তির বেলা এখান থেকে খেয়ে যেতে বলো, আমি খুশি হয়েই আসবো'।

'তখন এটা আর আমার বাড়ি থাকবে না, যে আমি নেমন্তন্ন করবো। তাই নয় কি'? অলিভ মৃদু হাসলো, 'ওটা তুমি বরঞ্চ নতুন বউকেই জিগেস কোরো'।

'এতো হালকা সুরে ও কথাটা বললো যে আমার মনটা আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। মনে হলো অবশেষে পরিবর্তিত পরিস্থিতিটা মেনে নেবার জন্যে ও মনোস্থির করে ফেলেছে এবং তার চাইতেও বড়ো কথা, এটা ও খুশি হয়েই মেনে নিচ্ছে। ও আমাকে রাত্তির বেলা খেয়ে যেতে বললো। সাধারণত আমি রাত আটটা নাগাদ ওদের বাড়ি থেকে বিদায় নিতাম এবং বাড়িতে ফিরে খেতাম। সেদিন ও আমার সঙ্গে ভীষণ মিষ্টি ব্যবহার করেছিলো, যেটাকে প্রায় কোমলই বলা চলে। বহুদিন আমি অতো সুখ অনুভব করিনি। সেদিনের মতো আর কোনোদিনও আমি ওকে অমন পাগলের মতো ভালোবাসিনি। বেশ কয়েক পাত্র জিন পাহিত পান করলাম, খোশ মেজাজে খাওয়াদাওয়া সারলাম। ওকে হাসালাম। দুঃখের যে বোঝাটা এতোদিন ওকে চেপে রেখেছিলো, মনে হলো অবশেষে ও যেন সেটাকে দূরে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। এই কারণেই একেবারে শেষে যা ঘটেছিলো তা আমাকে খুব একটা বিচলিত করে তুলতে পারেনি। ও বললো, 'তোমার কি মনে হয় না, একটি অবিবাহিতা মেয়ের সঙ্গ ছেড়ে এবারে এখান থেকে তোমার যাওয়া উচিত'?

'এমন শান্ত খুশিয়াল ভঙ্গিতে ও কথাটা বললো যে আমি নির্দ্বিধায় জবাব দিলাম, 'তুমি যদি মনে করে থাকো তোমার সুনামের সামান্য কিছু অংশ এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহলে বলতে হবে তুমি নিজের সঙ্গে ছলনা করছো। গত এক মাস আমি যে প্রতিদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছি তা সিবুকুর মহিলারা জানেন না—এটা নিশ্চয়ই তুমি মনে করো না? এখানকার সাধারণ অভিমত হচ্ছে, ইতিমধ্যে আমাদের যদি বিয়ে না হয়ে থাকে তাহলে এবারে অবিলম্বে সেটা সেরে ফেলা উচিত। আমরা যে বিয়ের জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেটা বরঞ্চ সবাইকে জানিয়ে দিই—কি বলো?'

'ওহ্ মার্ক, আমাদের বিয়ের কথাটা তুমি অমন গুরুতর সত্যি বলে ধরে নিও না লক্ষ্মীটি'!

'তাহলে আর কিভাবে ধরবো বলে তুমি আশা করো'? আমি হেসে বললাম, 'কথাটা তো সত্যিই'।

'না,' অলিভ মাথাটা সামান্য নাড়লো। 'সেদিন আমি ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। তুমি আমার সঙ্গে ভীষণ মিষ্টি ব্যবহার করেছিলে। সেদিন আমি 'হ্যাঁ' বলেছিলাম, কারণ তখন আমার এমন করুণ অবস্থা যে আমি 'না' বলতে পারিনি। কিন্তু এখন আমি নিজেকে সামলে নিয়েছি। আমাকে তুমি নিষ্ঠুর

ভেবে না, মার্ক ! সেদিন আমি ভুল করেছিলাম। জানি এটা ভীষণ অন্যায়, কিন্তু আমাকে তোমার ক্ষমা করতেই হবে'।

'তুমি বড্ড বাজে বকছো! আমার বিরুদ্ধে তোমার তো কোনো অভিযোগ নেই !'

অলিভ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। ওর ভাবভঙ্গি একেবারে শান্ত। দুচোখে মৃদু হাসির আভাস। বললো, 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি না, কাউকেই পারি না। বিয়ের কথা চিন্তা করাই আমার পক্ষে অসম্ভব'।

'আমি তক্ষুনি কোনো জবাব দিলাম না। ওই মুহূর্তে ওর মানসিক অবস্থাটা কেমন যেন অদ্ভুত বলে মনে হলো আমার। তাই ভাবলাম জোরাজুরি না করাই ভালো। তারপর বললাম, 'গায়ের জোরে তো আর তোমাকে বিয়ের বেদীর কাছে টেনে নিয়ে যেতে পারবো না' !

'আমি ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম, আমার হাতে নিজের হাত তুলে দিলো ও। ওকে আমি জড়িয়ে ধরলাম, নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার কোনো চেষ্টাই ও করলো না। যথারীতি আমি ওর গালে চুমু দিলাম, ও তাও সহ্য করলো প্রতিদিনের মতো।

'পরদিন সকালে ট্রেন আসার সময় আমি স্টেশনে গেলাম। অন্তত এই একবার ট্রেনটা সময় মতো এলো। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, টিমদের কামরাটা সেখান দিয়ে পেরিয়ে যাবার সময় টিম আমাকে দেখে হাত নাড়লো। আমি যতোক্ষণে হেঁটে গিয়ে ওদের কামরার কাছে পেঁছিুলাম তার মধ্যেই টিম কামরা থেকে লাফিয়ে নেমে ওর বউকে হাত ধরে নামাতে শুরু করেছে। উষ্ণ আন্তরিকতায় টিম আমার হাতটা আঁকড়ে ধরলো।

'অলিভ কোথায়' ? প্লাটফর্মে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলো ও। তারপর বললো, এই হচ্ছে স্যালি'।

'মেয়েটির সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে আমি ওদের বুঝিয়ে বললাম কেন অলিভ আসেনি।

'ভীষণ ভোর ভোর পেঁীছে গেলাম, তাই না ?' মিসেস হার্ডি বললো।

'আমি ওদের জানিয়ে দিলাম যে ঠিক করা হয়েছে, ওরা আগে আমার বাড়িতে গিয়ে একটু জলখাবার খেয়ে নেবে এবং তারপর গাড়িতে চেপে বাড়ি যাবে।

'আমার একটু স্নান করতে ইচ্ছে করছে,' মিসেস হার্ডি বললো।

'বেশ তো, করে নেবেন,' আমি বললাম।

'মেয়েটি সত্যিই দারুণ সুন্দরী। ভীষণ ফর্সা, বড়ো বড়ো দুটি নীল চোখ, ছোট্ট সোজা নাক। দুধে-আলতায় গায়ের রঙটা একেবারে অপূর্ব। অনেকটা অবিশ্যি কোরাসের মেয়েদের মতো দেখতে এবং একটু ন্যাকা বা আহ্লাদী বলেও মনে হতে পারে, কিন্তু সেটাও আকর্ষণীয়। গাড়িতে চেপে আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। ওরা দুজনেই স্নান করবে, টিম দাড়ি কামাবে। মাত্র দুটি মিনিট আমি টিমের সঙ্গে একা হতে পেরেছিলাম। সেই অবকাশে টিম জিগেস করলো,

অলিভ তার বিয়েটা কিভাবে নিয়েছে। বললাম, ও ভীষণ ভেঙে পড়েছিলো।

'আমি সেই রকমই আশঙ্কা করেছিলাম,' সামান্য ভ্রূ কুঁচকে টিম বললো। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিলো না'।

'ওর কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। সেই মুহূর্তে মিসেস হার্ডি ঘরে ঢুকে নিজের হাতখানা স্বামীর বাহুতে গলিয়ে দিলো। টিম ওর হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে তাতে মৃদু চাপ দিলো। তারপর যে দৃষ্টিতে সে স্ত্রীর দিকে তাকালো তাতে খানিকটা খুশি আর খানিকটা কৌতুকময় স্নেহ মেশানো, যেন ওকে সে ঠিক গুরুত্ব দিচ্ছে না— অথচ ওর সৌন্দর্যের জন্যে সে গর্বিত এবং নিজের মালিকানাটাও সে দিব্যি উপভোগ করছে। মেয়েটি সত্যিই ভারি মিষ্টি। একটুও লাজুক নয়। ভালোভাবে পরিচয় হবার দশ মিনিটের মধ্যেই ও আমাকে স্যালি বলে ডাকতে বললো। সদ্য সদ্য এসে পৌঁছনোয় তখন ও অবিশ্যি খুবই উত্তেজিত। আগে ও কখনও পূবদেশে আসেনি, তাই যা দেখছে সব কিছুতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। স্পষ্টই বোঝা যায় টিমের প্রেমে মেয়েটা একেবারে আপাদমস্তক ডুবে আছে। ওর চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যেও টিমের দিক থেকে অন্যত্র সরছে না, টিমের প্রতিটি কথা ও মন দিয়ে শুনছে। যাই হোক, দিব্যি আনন্দ করে প্রাতরাশ সেরে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম। ওরা ওদের গাড়িতে চেপে বাড়ির দিকে রওনা হলো আর আমি আমার গাড়িতে উঠলাম লাহাদে যেতে হবে বলে। কথা দিলাম, সেখান থেকে আমি সোজা ওদের বাগানে চলে যাবো। আমার বাড়ি এই যাতায়াতের পথে পড়বে না বলে এক প্রস্থ বাড়তি পোশাকও আমি সঙ্গে নিয়ে নিলাম। স্যালিকে অলিভের পছন্দ না হবার মতো কোনো কারণ আমি দেখতে পেলাম না। মেয়েটি অকপট, খুশিয়াল আর সাদাসিধে। ভীষণ ছেলেমানুষ, বয়েস উনিশের বেশি নয়। ওর অপরূপ সৌন্দর্যের আবেদন অলিভের কাছে ব্যর্থ হতে পারে না। একটা যুক্তিসংগত অজুহাত দেখিয়ে সারাটা দিন ওদের তিনজনকে শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে রাখতে পেরেছি বলে আমি খুশিই হয়েছিলাম। কিন্তু লাহাদ থেকে রওনা হবার সময় মনে হচ্ছিলো, আমি যখন ওদের ওখানে গিয়ে পৌঁছুবো তখন আমাকে দেখে ওরা সবাই খুব খুশি হবে। ওদের বাংলোটা অব্দি গাড়ি চালিয়ে গিয়ে দু-তিন বার ভেঁপু বাজালাম। আশা করেছিলাম কেউ নিশ্চয়ই আসবে, কিন্তু একটি প্রাণীও এলো না। বাড়িটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। একেবারে নিস্তব্ধ নিঝুম। আমি অবাক হয়ে গেলাম। ব্যাপারটা কিছুই আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। ওরা নিশ্চয়ই বাড়ির ভেতরে আছে। ভারি অদ্ভুত তো—ভাবলাম আমি। তারপর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। সিঁড়ির মাথায় কি একটা জিনিসে যেন হোঁচট খেলাম। বিরক্তিতে একটা গালি দিয়ে, জিনিসটা কি দেখার জন্যে একটু নিচু হয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালাম। অনুভবে মনে হলো, ওটা একটা শরীর। তারপরেই একটা চিৎকার এবং আমি দেখলাম শরীরটা আয়ার। আমি

ছুঁতেই ও কুঁকড়ে সরে গিয়ে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে।

'কি হয়েছে? ব্যাপারটা কি'? আমি চিৎকার করে উঠলাম। তারপরেই নিজের বাহুতে আমি কার যেন হাতের স্পর্শ পেলাম। কে যেন বললো: 'হুজুর, হুজুর'! ঘুরে তাকিয়ে অন্ধকারের মধ্যেও চিনতে পারলাম, লোকটা টিমের চাকরগুলোর সর্দার। ভয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে লোকটা কথা বলতে শুরু করলো। আতঙ্কিত হয়ে আমি ওর কথাগুলো শুনলাম। সে যা বললো, তা বলা যায় না—তা বড়ো ভয়ঙ্কর। লোকটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমি এক ছুটে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। বৈঠকখানা-ঘরটা অন্ধকার। আলো জ্বালতেই প্রথমে যা দেখতে পেলাম তা হচ্ছে, স্যালি একটা আরামকুর্সিতে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে রয়েছে। আমার আকস্মিক আবির্ভাবে ও চমকে চিৎকার করে উঠলো। আমি তখন আর কথা বলতে পারছি না। শুধু ওকে জিগেস করলাম ঘটনাটা সত্যি কি না। স্যালি তা স্বীকার করতেই আমার মনে হলো আচমকা ঘরটা যেন আমার চতুর্দিকে ঘুরতে শুরু করেছে। বাধ্য হয়েই আমাকে বসে পড়তে হলো।

'টিম আর স্যালি গাড়ি নিয়ে বাড়ির সীমানার ভেতরকার রাস্তায় ঢুকতেই টিম ওদের আসার খবর জানাতে গাড়ির ভেঁপুটা বাজাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে চাকরবাকর আর আয়া ওদের অভ্যর্থনা জানাতে বাইরে ছুটে আসে এবং তখনই একটা গুলির আওয়াজ শোনা যায়। সবাই অলিভের ঘরে ছুটে গিয়ে দেখতে পায়, আরশির সামনে একটা রক্তের পুকুরের মধ্যে পড়ে রয়েছে অলিভ। টিমের রিভলভার দিয়ে ও নিজেকে গুলি করেছে।

'জিগেস করলাম, 'ও কি মরে গেছে'?

'না। ওরা ডাক্তার ডেকে পাঠিয়েছিলো। তারপর টিম ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে'।

'আমি তখন কি করছিলাম তা আমি নিজেই জানি না। কোথায় যাচ্ছি তা স্যালিকে বলতেও ইচ্ছে হলো না। কুর্সি থেকে উঠে টলতে টলতে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। গাড়িতে উঠে সহিসকে যতো জোরে সম্ভব গাড়িটা হাসপাতালের দিকে চালাতে বললাম। ছুটতে ছুটতে হাসপাতালে গিয়ে ঢুকলাম। জিগেস করলাম, ও কোথায় আছে। ওরা আমার পথ আটকাবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু আমি ওদের ঠেলে সরিয়ে দিলাম। আমি জানতাম বেসরকারী ঘরগুলো কোনদিকে। কে একজন আমার হাত টেনে ধরলো, আমি এক ঝটকায় তাকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। আবছা আবছা বুঝতে পারছিলাম যে ডাক্তার নির্দেশ দিয়েছেন, কেউ যেন ওর ঘরে না যায়। আমি তা গ্রাহ্যও করলাম না। দরজার কাছে একজন আর্দালি ছিলো, সে হাত বাড়িয়ে আমাকে ঢুকতে বাধা দিলো। গালাগাল দিয়ে লোকটাকে আমি পথ ছাড়তে বললাম। সম্ভবত খুব চেঁচামেচি করছিলাম, তখন আমি আর আমাতে ছিলাম না। দরজা খুলে গেলো, ডাক্তার বেরিয়ে এলেন।

'কে এতো গোলমাল করছে' ? উনি বললেন। 'ও, আপনি। তা কি চান আপনি' ?

'ও কি মরে গেছে' ? আমি জিগেস করলাম।

'না, তবে জ্ঞান নেই। এখন অব্দি একবারও জ্ঞান ফেরেনি। আর মাত্র দু-এক ঘণ্টার ব্যাপার'।

'আমি ওকে দেখতে চাই'।

'আপনি তা পারেন না'।

'ও আমার বাগদত্তা'।

'আপনি' ? সেই মুহূর্তেও আমি বুঝতে পারলাম, ডাক্তার এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'তাহলে তো দেখতে না দেবার কারণ আরও বেশি'।

'উনি কি বলতে চাইলেন আমি বুঝতে পারলাম না। আমি তখন আতঙ্কে বিহ্বল। চিৎকার করে বললাম, 'আপনি চেষ্টা করলে ওকে নিশ্চয়ই বাঁচাতে পারবেন' !

'উনি মাথা নাড়লেন, 'একবার দেখলে আপনি আর ওঁকে বাঁচাতে চাইতেন না'।

'আতঙ্ক আর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর চারদিকের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে পুরুষ কন্ঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ শুনে জিগেস করলাম, 'কে কাঁদছে' ?

'ওর ভাই'।

'আমার বাহুতে কার যেন হাতের স্পর্শ পেলাম। তাকিয়ে দেখি মিসেস সার্গিসন। বললেন, 'আহা বেচারা ! আপনার জন্যে আমার ভীষণ খারাপ লাগছে' !

'কেন ও এ কাজ করলো' ? আমি গুমরে উঠলাম।

'এখান থেকে চলুন'। মিসেস সার্গিসন বললেন, 'আপনি থেকে তো আর কিছু করতে পারবেন না' !

'না, আমি এখানেই থাকবো'।

'ঠিক আছে,' ডাক্তার বললেন, 'আমার ঘরে গিয়ে বসুন'।

'আমি তখন এমন ভেঙে পড়েছি যে মিসেস সার্গিসনই আমাকে হাত ধরে ডাক্তারের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। তখনও আমি নিজেকে বোঝাতে পারছি না যে ঘটনাটা সত্যি। মনে হচ্ছিলো সবই যেন একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন এবং শীগগিরি এই দুঃস্বপ্ন থেকে আমি ঘুম ভেঙে জেগে উঠবো। জানি না কতোক্ষণ আমরা ওখানে বসেছিলাম। তিন ঘণ্টা। চার ঘণ্টা। অবশেষে ডাক্তার ঘরে ঢুকে বললেন, 'সব শেষ'।

'তখন আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না, কাঁদতে শুরু করলাম। কে আমার সম্পর্কে কি ভাবলো না ভাবলো, তা আমি গ্রাহ্যও করিনি। আমি

তখন প্রচণ্ড অসুখী।

'পরদিন আমরা ওকে সমাধিস্থ করলাম।

'মিসেস সার্গিসন আমার বাড়িতে এসে খানিকক্ষণ আমার কাছে বসে রইলেন। উনি আমাকে সঙ্গে করে ক্লাবে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্লাবে যাবার মতো মানসিক অবস্থা আমার ছিলো না। উনি খুবই স্নেহময়ী, কিন্তু উনি চলে যেতে আমি খুশি হলাম। একটু পড়াশুনো করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু শব্দগুলোর কোনো অর্থই আমার বোধগম্য হলো না। মনে হচ্ছিলো আমার ভেতরটা যেন মরে গেছে। চাকর এসে ঘরের আলোগুলো জেলে দিয়ে গেলো। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা। চাকরটা ফের ঘরে এসে বললো, এক মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। জিগেস করলাম, মহিলাটি কে। ও তা সঠিকভাবে জানে না। তবে ওর ধারণা, উনি নিশ্চয়ই পুতাতান বাগানের সাহেবের নতুন বউ। ভেবে পেলাম না ও কি চায়। দরজার কাছে গিয়ে দেখি চাকরটা ঠিকই বলেছে—স্যালিই বটে। ওকে ঘরে আসতে বললাম। লক্ষ্য করলাম ওর মুখটা মড়ার মতো সাদা। ওর জন্যে দুঃখ হলো। ওই বয়সের একটা মেয়ের পক্ষে সত্যিই এ এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা, স্বামীর ঘরে নতুন কনের এক মর্মান্তিক আগমন। স্যালি ঘরে এসে বসলো। দেখলাম ও ভীষণ বিচলিত। সাধারণ কথাবার্তা বলে আমি ওকে সহজ করে তোলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও বিশাল দুটি নীল চোখ মেলে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকায় আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিলো। ওর চোখ দুটোতে শুধু নিবিড় আতঙ্কের ছায়া। আচমকা আমার কথায় বাধা দিয়ে ও বললো, 'এখানে একমাত্র আপনাকেই আমি চিনি। তাই আপনার কাছেই আসতে বাধ্য হলাম। আপনি আমাকে এখান থেকে চলে যাবার ব্যবস্থা করে দিন'।

'আমি হতবাক হয়ে গেলাম, 'কি বলছেন আপনি'?

'আমি চাই না আপনি আমাকে কোনো প্রশ্ন করবেন। শুধু চাই, আপনি আমাকে এখান থেকে যাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। এক্ষুণি। আমি ইংলণ্ডে ফিরে যেতে চাই'।

'কিন্তু টিমকে আপনি এখন এভাবে ফেলে যেতে পারেন না! লক্ষ্মীটি একটু শুনুন, নিজেকে আপনার সামলে নিতেই হবে। আমি জানি এটা আপনার পক্ষে ভারি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। কিন্তু টিমের কথাটা একটু ভেবে দেখুন! ওর প্রতি আপনার যদি একটুও ভালোবাসা থাকে তাহলে ওর দুঃখটা অন্তত একটু কমাবার চেষ্টা করুন'।

'ওহ্, আপনি কিছু জানেন না'! ও চিৎকার করে উঠলো। 'আমি আপনাকে বলতেও পারবো না। সে বড়ো ভয়ঙ্কর কথা! আমি আপনাকে মিনতি করছি, আমাকে সাহায্য করুন! আজ রাতে কোনো ট্রেন থাকলে আমাকে তাতেই তুলে দিন। পেনাং অব্দি যেতে পারলেই আমি কোনো একটা জাহাজে উঠে পড়তে পারবো। এখানে আমি আর একটা রাতও থাকতে পারবো না।

থাকলে পাগল হয়ে যাবো'।

'আমি তখন সম্পূর্ণ হতভম্ব হয়ে গেছি। জিগেস করলাম, 'টিম জানে'?

'গতকাল রাত্তির থেকে আমি আর টিমকে দেখিনি। আর দেখবোও না কোনোদিন। তার চাইতে বরং মরবো'।

'আমি একটু সময় হাতে পাবার চেষ্টা করছিলাম। তাই বললাম, 'কিন্তু আপনার জিনিসপত্র না নিয়ে আপনি যাবেন কি করে? আপনার সঙ্গে কোনো মালপত্র আছে কি'?

'না থাকলেই বা কি এসে যায়'? স্যালি অধৈর্য কণ্ঠে বললো, 'পথে যেটুকু দরকার হবে তা আমার কাছেই আছে'।

'টাকা পয়সা কিছু আছে'?

'যথেষ্ট। কিন্তু আজ রাতে কোনো ট্রেন আছে কি'?

'হ্যাঁ, সেটা মাঝরাতের ঠিক পরেই এখানে এসে পেঁছুবে'।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আপনি তাহলে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন তো? আর ততোক্ষণ অব্দি আমি এখানে একটু থাকতে পারি'?

'আপনি আমাকে একটা বিশ্রী পরিস্থিতিতে ফেলছেন। কোন্‌টা করা সব চাইতে ভালো হবে তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কিন্তু একটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছেন'।

'সব কিছু জানলে আপনি বুঝতে পারতেন, এটাই একমাত্র পথ'।

'এতে এখানে কিন্তু সাংঘাতিক কেচ্ছা রটবে। লোকে কে কি বলবে আমি জানি না। কিন্তু টিমের ওপরে তার কি প্রতিক্রিয়া হবে, আপনি ভেবে দেখেছেন'? আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম। খুবই খারাপ লাগছিলো। ফের ওকে বললাম, 'ঈশ্বর জানেন, যেটা আমার ব্যাপার নয় আমি তাতে নাক গলাতে চাই না। কিন্তু আমাকে সাহায্য করতে হলে, আমি যে সঠিক কাজ করছি তা বোঝার জন্যে, ঘটনার খানিকটা অন্তত আমার অবশ্যই জানা উচিত। কাজেই কি এমন হয়েছে তা আপনাকে বলতে হবে'।

'আমি পারবো না। শুধু এটুকু বলতে পারি যে আমি সব জানি'।

'দুহাতের অঞ্জলিতে মুখ ঢেলে স্যালি শিউরে উঠলো। তারপর নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিলো, যেন একটা বীভৎস দৃশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলো নিজেকে।

'আমাকে বিয়ে করার কোনো অধিকার ওর ছিলো না। ওহ্, কি বিকৃতি'!

'কথা বলতে বলতে ওর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ন হয়ে উঠলো। আমার ভয় হতে লাগলো, হয়তো ওর ওপরে মৃগীরোগের একটা আক্রমণ নেমে আসবে। অমন সুন্দর পুতুল-পুতুল মুখখানা আতঙ্কে বিকৃত। চোখের দৃষ্টি অপলক—যেন চোখ দুটো ও আর কোনোদিনও বুজতে পারবে না।

'জিগেস করলাম, 'আপনি কি ওকে আর ভালোবাসেন না'?

'এর পরেও'?

'আমি যদি আপনাকে সাহায্য না করি, কি করবেন' ?

'আমার ধারণা এখানে একজন যাজক বা ডাক্তার আছেন। তাঁদের একজনের কাছে আমাকে নিয়ে যেতে আপনি নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না' ?

'এখানে আপনি এলেন কি করে' ?

'চাকরদের সর্দারটা আমাকে গাড়িতে করে নিয়ে এসেছে। কোত্থেকে ও যেন একটা গাড়ি যোগাড় করে এনেছিলো'।

'আপনি যে চলে এসেছেন তা টিম জানে' ?

'ওর জন্যে একটা চিঠি রেখে এসেছি'।

'আপনি যে এখানে আছেন, তা ও জানতে পারবে'।

'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, ও আমাকে থামাবার চেষ্টা করবে না। তেমন সাহসই ওর হবে না। ঈশ্বরের দোহাই, আপনিও সে চেষ্টা করবেন না। আমি আপনাকে বলছি, এখানে আর একটা রাত থাকলেও আমি পাগল হয়ে যাবো'।

'আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আর যাই হোক, নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার মতো বয়স ওর হয়েছে'।

আমি এ কাহিনীর লেখক, বহুক্ষণ কোনো কথা বলিনি। এবারে আমি ফেদারস্টোনকে জিগেস করলাম, 'স্যালি কি বলতে চেয়েছিলো, আপনি বুঝেছিলেন ?'

উনি বহুক্ষণ ধরে এক খেপাটে দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন 'ওর কথার একটি মাত্র অর্থই হতে পারে। কিন্তু তা মুখে বলা চলে না। হ্যাঁ, আমি সবই বুঝতে পেরেছিলাম। ওর কথাতেই সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। আহা, বেচারী অলিভ ! হয়তো অযৌক্তিক—কিন্তু সেই মুহূর্তে ভয়ার্ত চোখ আর হালকা রঙের চুলওলা ওই সুন্দর পুতুল-পুতুল চেহারার স্যালিকে দেখে আমি কেমন যেন আতঙ্ক অনুভব করেছিলাম। আমার ঘৃণা হয়েছিলো। খানিকক্ষণ আমি কিছুই বলিনি। তারপর বললাম, ও যা বলবে আমি তাই করবো। আমাকে ও একটা ধন্যবাদও জানালো না। বোধহয় ওর সম্পর্কে আমার মনোভাবটা ও বুঝতে পেরেছিলো। নৈশভোজের সময় আমি জোরাজুরি করে ওকে একটু কিছু খাওয়ালাম। ও জিগেস করলো, স্টেশনে যাবার আগে পর্যন্ত সময়টা ও একটু শুয়ে নিতে পারে এমন কোনো ঘর আছে কি না। বাড়তি ঘরটা ওকে দেখিয়ে দিয়ে আমি বৈঠকখানা-ঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওহ্ ঈশ্বর, জীবনে আর কোনোদিনও সময় অমন মন্থর গতিতে কাটেনি। মনে হচ্ছিলো ঘড়িতে বারোটা আর বাজবে না। স্টেশনে ফোন করে জানলাম, ট্রেন দুটো নাগাদ আসবে—তার আগে নয়। মাঝরাতে স্যালি বৈঠকখানা-ঘরে এলো, ঘণ্টা দেড়েক আমরা সেখানেই বসে রইলাম। পরস্পরকে কারুরই কিছু বলার ছিলো না, কেউই কিছু বললাম না। তারপর আমি ওকে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিলাম।'

'কোনো সাঙ্ঘাতিক কেচ্ছা রটেছিলো কি?'

'জানি না,' ফেদারস্টোন ভ্রূ কুঁচকে বললো। 'আমি অল্প কয়েকদিন ছুটির জন্যে দরখাস্ত দিয়েছিলাম। তারপর অন্য জায়গায় বদলি হয়ে গেলাম। শুনেছিলাম টিম তার বাগানটাগান বিক্রি করে দিয়ে অন্য একটা কিনেছে। কিন্তু কোথায় তা জানতাম না। এখানে প্রথমবার ওকে দেখে আমি রীতিমতো চমকে গিয়েছিলাম।'

ফেদারস্টোন উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে হুইস্কি আর সোডা মিশিয়ে নিলেন। চারদিকে নেমে আসা নৈঃশব্দ্যের মধ্যে সমবেত দাদুরির একঘেয়ে কর্কশ চিৎকার। হঠাৎ বাড়ির কাছাকাছি একটা গাছ থেকে একটা রাতজাগা পাখি ডাকতে শুরু করলো। প্রথমে নিচু স্বরে তিনটে ডাক, তারপর ধাতব সুরে পাঁচটা, তারপর চারটে। পর্দার ভিন্ন ভিন্ন সুরে ক্রমাগত একটানা পাগলের মতো ডাক—একটার পর আর একটা। বাধ্য হয়েই মানুষকে ওই ডাক শুনতে হয়, একের পর এক ডাকগুলোকে গুনে যেতে হয় এবং যেহেতু সংখ্যাটা আগে থেকে জানা যায় না, তাই ডাকগুলো স্নায়ুতন্ত্রীকে অত্যাচারে জর্জরিত করে তোলে।

'চুলোয় যাক পাখিটা', ফেদারস্টোন বললেন। 'আজ রাতের ঘুমটা গোল্লায় গেলো।'

মুক্তির পথ

চিরদিনই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোনো মহিলা যদি একবার কাউকে বিয়ে করবে বলে মনঃস্থির করে ফেলে, তাহলে একমাত্র তাৎক্ষণিক পলায়ন ছাড়া আর কোনো কিছুই সেই মানুষটিকে রক্ষা করতে পারে না। সব সময় তা-ও হয় না। যেমন, একবার আমার এক বন্ধু অনিবার্য ভবিতব্যকে মারাত্মকভাবে নিজের সামনে দেখতে পেয়ে কোনো এক বন্দর থেকে একটা জাহাজে চেপে বসে (নিজের বিপদ এবং তার জন্যে অবিলম্বিত ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সে এতোই সচেতন ছিলো যে মালপত্র বলতে একটা দাঁত মাজার বুরুশ ছাড়া আর কিছুই সে নেয়নি) এবং পুরো একটা বছর গোটা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু নিজেকে নিরাপদ মনে করে (সে বলেছিলো, মেয়েরা বড্ড চঞ্চলমতি—বারো মাসে ও আমাকে পুরোপুরি ভুলে যাবে) সে আবার ওই বন্দরে গিয়ে নামতেই, প্রথম যাকে জাহাজ-ঘাট থেকে তার দিকে উচ্ছল ভঙ্গিতে হাত নাড়তে দ্যাখে—সে সেই ছোটখাট্টো মহিলাটি, যার কাছ থেকে সে একদিন পালিয়ে গিয়েছিলো। শুধুমাত্র একজনকে আমি

জানি, যে এহেন পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলো। তার নাম রজার চেয়ারিং। সে যখন রুথ বার্লোর প্রেমে পড়ে তখন সে আর কচি যুবকটি ছিলো না এবং নিজেকে সতর্ক করে তোলার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও তার ছিলো। রুথ বার্লোর একটা সহজাত গুণ (নাকি দক্ষতা বলবো?) ছিলো, যা অধিকাংশ পুরুষকেই প্রতিরোধহীন করে তুলতো এবং সেটাই রজারকে তার স্বাভাবিক বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং পার্থিব জ্ঞান থেকে বিচ্যুত করে দিলো। রজার তাসের ঘরের মতো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। রুথ বার্লোর ওই গুণটি করুণ রস সম্পর্কিত। মিসেস বার্লোর (মিসেস বলার কারণ, উনি ইতিপূর্বে দুবার বিধবা হয়েছেন) কালো চোখ দুটি সত্যিই অপূর্ব এবং অমন মর্মস্পর্শী চোখ আমি আগে কখনও দেখিনি। মনে হতো এক্ষুণি বুঝি চোখ দুটো জলে ভরে উঠবে। মনে হতো, পৃথিবীতে ও অনেক দুঃখ পেয়েছে এবং অমন দুঃখ পাবার কথা কেউ কখনও ভাবতেও পারে না। রজার চেয়ারিঙের মতো শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ চেহারা আর অগাধ অর্থের অধিকারী হলে সম্ভবত আপনিও ভাবতেনঃ আমি এই অসহায় বেচারীর সমস্ত বিপদ-আপদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবো···ওই দুটি আয়ত অপরূপ চোখ থেকে দুঃখ বেদনা মুছে দিতে পারলে কি ভালোই না লাগবে! রজারের কাছে শুনেছি, প্রত্যেকেই মিসেস বার্লোর সঙ্গে ভীষণ খারাপ ব্যবহার করেছে। ও এমন এক হতভাগিনী যার জীবনে কোনো কিছুই সঠিকভাবে চলেনি। বিয়ে করলে, স্বামী ওকে ধরে পিটিয়েছে। চাকরি করতে গেলে, কোনো দালাল ওকে ঠকিয়েছে। বাড়িতে রাঁধুনি রাখলে, সে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে। কোনোদিনও ওর কোনো বাচ্চাকাচ্চা হয়নি, হলেও সেটা নির্ঘাৎ মারা যেতো।

রজার যখন বললো, শেষ অব্দি সে রুথকে বিয়েতে রাজি করিয়েছে তখন আমি তাকে শুভেচ্ছা জানালাম। রজার বললো, 'আশা করি তোমরা দুজনে পরস্পরের ভালো বন্ধু হবে।' বললো, 'জানো তো, ও তোমাকে একটু ভয় পায়। ওর ধারণা, তুমি নিষ্ঠুর।'

'কি কাণ্ড! আমার সম্পর্কে ওর এ কথা মনে হবার কি কারণ থাকতে পারে, আমি জানি না।'

'তুমি তো ওকে পছন্দ করো, তাই নয় কি?'

'ভীষণ।'

'বেচারীর খুব খারাপ সময় গেছে। ওর জন্যে আমার ভীষণ দুঃখ হয়!'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম। তার চাইতে কমিয়ে কিছু বলতে পারলাম না। কিন্তু আমি জানতাম, মহিলা নেহাতই নীরস এবং এটা ওর একটা ফন্দি। আমার নিজস্ব বিশ্বাস, ও নিজে ভীষণ নির্মম ও কঠিন।

ওর সঙ্গে প্রথম দেখার দিনে আমরা একসঙ্গে ব্রিজ খেলেছিলাম এবং আমার

জুড়ি হয়ে খেলার সময় ও দু-দুবার আমার সেরা তাসের ওপরে রঙ খেলেছিলো। আমি তখন দেবদূতের মতোই প্রশান্তি দেখিয়েছিলাম। কিন্তু আমার মনে হয়েছিলো, কারুর চোখে অশ্রু যদি ঘনাতেই হয় তো আমার চোখেই সেটা ঘনিয়ে ওঠা উচিত—ওর চোখে নয়। সেদিন সন্ধ্যার শেষে আমার কাছে বেশ কিছু টাকা হারার পর ও বলেছিলো ও আমাকে একটা চেক পাঠিয়ে দেবে, কিন্তু কোনোদিনই তা পাঠায়নি। এবং তখন আমি এ কথা না ভেবে পারিনি যে পরের বার যখন আমাদের দেখা হবে তখন ওর নয়—আমার মুখেই একটা করুণ অভিব্যক্তি ফুটিয়ে রাখা উচিত।

রজার তার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলো। ওকে সুন্দর সুন্দর জড়োয়ার গহনা দিলো। এখানে, সেখানে এবং সর্বত্র ওকে নিয়ে বেড়াতে গেলো। খুব শীগগির ওদের বিয়ে হবে, একথাও ঘোষণা করে দেওয়া হলো। রজার তখন ভীষণ সুখী। সে একটা ভালো কাজ করতে চলেছে। শুধু তাই নয়—যে কাজটা তার করার ভীষণ ইচ্ছে ছিলো, সেটাই সে করতে যাচ্ছে। পরিস্থিতিটা ঠিক স্বাভাবিক নয়, কাজেই এমতাবস্থায় যতোটা খুশি হওয়া উচিত রজার যে নিজের ওপরে তার চাইতে একটু বেশিই খুশি হয়ে উঠবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

তারপর, একবারে হঠাৎ, রজারের মন থেকে প্রেম ছুটে গেলো। কেন, তা আমি জানি না। রুথের আলাপ-আলোচনা শুনে শুনে রজার ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলো, তেমন সম্ভাবনা খুবই কম—কারণ রুথ কখনও অন্তরঙ্গভাবে কোনো আলাপসালাপ করতো না। হয়তো ওর ওই করুণ মূর্তি রজারের হৃদয়তন্ত্রীকে আর তেমন করে মোচড় দিতো না এবং হয়তো স্রেফ এটাই এর কারণ। কিন্তু সে যাই হোক না কোন, রজারের চোখ খুলে গেলো এবং আবার সে আগের মতোই বাস্তব পৃথিবীর বিচক্ষণ মানুষ হয়ে উঠলো। রুথ বার্লো যে তাকে বিয়ে করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে সম্পর্কে তীক্ষ্মভাবে সচেতন হয়ে সে একটা পবিত্র শপথ নিলো—কোনো প্ররোচনাতেই সে রুথ বার্লোকে বিয়ে করবে না। কিন্তু তার তখন উভয় সঙ্কট। নিজের কাণ্ডজ্ঞান ফিরে পাওয়ায় সে তখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে, কোন্ ধরনের মহিলার সঙ্গে তাকে খেলতে হবে। আবার রুথের কাছে মুক্তি চাইলেও রুথ যে একটা অত্যধিক উঁচু অঙ্কে ওর আহত অনুভূতিগুলোর মূল্য নির্ধারণ করবে (ওর নিজস্ব করুণ ভঙ্গিমায়) সে বিষয়েও ও সম্পূর্ণ সচেতন। তাছাড়া একজন পুরুষের পক্ষে এক মহিলাকে প্রথমে উৎসাহ দেখিয়ে পরে ফিরিয়ে দেওয়াটা চিরদিনই একটা বিশ্রী ব্যাপার। তখন প্রত্যেকের পক্ষেই ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে পুরুষটিই অন্যায় করেছে।

রজার নিজের বুদ্ধি বিবেচনা স্থির রাখলো। কথায় বা কাজে সে এমন কোনো ইঙ্গিত প্রকাশ করলো না যাতে বোঝা যায় রুথ বার্লোর সম্পর্কে তার মনোভাব বদলে গেছে। রুথের সমস্ত ইচ্ছে-অনিচ্ছের প্রতি সে আগের মতোই

মনোযোগী হয়ে রইলো। ওকে সে রাত্রিবেলা রেস্তোরাঁয় খাওয়াতো, একসঙ্গে খেলতে যেতো, ওকে ফুল পাঠাতো, ওর সঙ্গে সুন্দর সমবেদী ব্যবহার করতো। ওরা স্থির করেছিলো, নিজেদের সুবিধেমতো একটা বাড়ি খুঁজে পেলেই ওরা বিয়ে করবে—তাই দুজনেই পছন্দমতো বাড়ি দেখতে শুরু করলো। দালালরা রজারকে খবর দেয় আর রজার রুথকে নিয়ে বাড়ি দেখতে যায়। সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বাড়ি পাওয়া খুবই কঠিন। রজার আরও কয়েক-জন দালালের অফিসে আবেদন করলো। ওরা একটার পর একটা বাড়ি দেখে চললো। মাটির তলায় মদের ভাণ্ডার থেকে শুরু করে ছাদের তলায় চিলে-কোঠা অব্দি ওরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে। কোনো বাড়ি বড্ড বড়ো, কোনোটা ভীষণ ছোটো। কোনোটা শহরের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে, কোনোটা প্রচণ্ড কাছাকাছি। কোনোটার ভাড়া খুব বেশি, কোনোটার অনেক কিছুই মেরামত করে নেওয়া দরকার। কোনোটাতে ভীষণ গুমোট, কোনোটাতে প্রচণ্ড বাতাস। কোনোটা বড্ড অন্ধকার আবার কোনোটা ভীষণ ম্যাড়মেড়ে। রজার সর্বদাই এমন একটা খুঁত খুঁজে বের করে, যার ফলে বাড়িটা আর ভাড়া নেবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে না। অবিশ্যি তাকে সন্তুষ্ট করা খুবই কঠিন। নিখুঁত বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও রুথ সোনাকে বাস করতে বলা তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং তাই সেই নিখুঁত বাড়িটাকেই খুঁজে বের করতে হবে। বাড়ি খোঁজা একটা বিরক্তিকর এবং শ্রমসাধ্য কাজ। সামান্য কিছুদিনের মধ্যেই রুথ খিটখিটে হয়ে উঠতে শুরু করলো। ওকে একটু ধৈর্য ধরে থাকার জন্যে রজার কাতর অনুরোধ জানালো। কোথাও নিশ্চয়ই সেই বাড়িটা রয়ে গেছে যেটা ওরা এতো কষ্ট করে খুঁজছে এবং সেটা খুঁজে পাবার জন্যে শুধু সামান্য একটু অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। ওরা শত শত বাড়ি দেখলো, হাজার হাজার সিঁড়ি ভাঙলো, অসংখ্য রান্নাঘর পরিদর্শন করলো এবং রুথ ক্লান্ত হয়ে উঠলো, একাধিকবার মেজাজ খারাপ করলো।

'শীগগিরি তুমি যদি একটা বাড়ি খুঁজে বের করতে না পারো, তাহলে আমাকে নতুন করে আমার পরিস্থিতিটা বিচার করে দেখতে হবে।' রুথ বলে, 'তুমি এভাবে চললে বেশ কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের বিয়েটা হবে না।'

'ও কথা বোলো না,' রজার বলে। 'তোমাকে আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি একটু ধৈর্য ধরে থাকো, সোনা! একেবারে সদ্য সদ্য নাম শোনা কয়েক-জন দালালের কাছ থেকে আমি সবেমাত্র কয়েকটা সম্পূর্ণ নতুন তালিকা পেয়েছি। ওর মধ্যে অন্তত গোটা ষাটের বাড়ি অবশ্যই আছে।'

ফের ওরা সন্ধান শুরু করে। দু বছর ধরে ক্রমাগত একের পর এক অসংখ্য বাড়ি দেখে যায়। রুথ ক্রমশ নিশ্চুপ ও বিরক্ত হয়ে ওঠে। ওর করুণ সুন্দর চোখ দুটিতে এমন এক অভিব্যক্তি জেগে ওঠে যেটাকে প্রায় বিষাদই বলা চলে। মানুষের সহিষ্ণুতারও একটা সীমা-মাত্রা আছে। পরীর মতো ধৈর্য মিসেস বার্লোর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও-ও বিদ্রোহ করে বসে।

'তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও, কি না ?'

ওর কণ্ঠস্বরে এক অনভ্যস্ত কাঠিন্য, কিন্তু তাতে রজারের শান্ত ভঙ্গিমার কোনো পরিবর্তন হয় না।

'চাই বই কি! একটা বাড়ি পেয়ে গেলেই আমরা বিয়ে করবো। ভালো কথা, এই মাত্র আমি একটা খবর পেয়েছি—এটা হয়তো আমাদের পছন্দমতো হতে পারে।'

'এই মুহূর্তে আর কোনো বাড়ি দেখতে যাবার মতো শারীরিক অবস্থা আমার নেই।'

'বেচারী! হ্যাঁ, তোমাকে যেন একটু ক্লান্ত বলেই মনে হচ্ছে!'

রুথ বালো শয্যা নিলো। রজারের সঙ্গে ও দেখা করতে যায় না। খবরা-খবর নেবার জন্যে ওর বাসাবাড়িতে গিয়ে এবং ওকে ফুল পাঠিয়েই রজারকে তুষ্ট থাকতে হয়। কিন্তু সে আগের মতোই অক্লান্ত পরিশ্রমী এবং প্রেমময়। প্রতিদিনই সে রুথকে চিঠি লিখে জানায়, তাদের জন্যে সে আরও একটা বাড়ির খবর পেয়েছে। এইভাবে এক সপ্তাহ কেটে যাবার পর সে এই চিঠিখানা পেলো ঃ

'রজার—

তুমি আমাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসো বলে মনে হয় না। আমি এমন এক জনের সন্ধান পেয়েছি যে আমার সমস্ত ভার নেবার জন্যে উদগ্রীব এবং আজই আমি তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। রুথ।'

একজন বিশেষ পত্রবাহক মারফৎ রজার তার জবাব পাঠালো ঃ

'রুথ—

তোমার সংবাদটা আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে। এ আঘাত আমি কোনোদিনও সামলে উঠতে পারবো না। তবে তোমার সুখের প্রশ্নটাই আমার কাছে সব চাইতে প্রথম বিবেচ্য বিষয়। তাই এই সঙ্গে আমি সাতটা তালিকা পাঠালাম, এগুলো আজই সকালের ডাকে এসে পৌঁছেছে। আমি সুনিশ্চিত, এর মধ্যে থেকে তুমি অবিকল তোমার প্রয়োজন মাফিক একটা বাড়ি খুঁজে পাবে।

রজার।'

বিচক্ষণ পর্যটক শুধুমাত্র কল্পনাতেই সফর সাঙ্গ করেন। একজন প্রবীণ ফরাসী ভদ্রলোক (আসলে তিনি ছিলেন একজন অভিনেতা) এক সময় 'ঘরে বসে ভ্রমণ' নামে একটি বই লিখেছিলেন। বইটা আমি পড়িনি এবং সেটা কি নিয়ে লেখা তা-ও আমি জানি না। কিন্তু বইয়ের নামটা আমার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। কল্পনার সফরে আমি গোটা দুনিয়াকে চক্কর মেরে আসতে পারি। তাপচুল্লির তাকে রাখা একটা মূর্তি আমাকে বার্চের বিশাল অরণ্য আর গোল-গম্বুজময় সাদা গির্জার দেশ রাশিয়ায় নিয়ে যেতে পারে। আমি দেখতে পাই ভলগার বিশাল বিস্তার। দেখতে পাই, ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে ওঠা একটা গ্রামের শেষ প্রান্তে অসংস্কৃত ভেড়ার চামড়ার কোট পরা দাড়িওয়ালা মানুষগুলো একটা শরাবখানায় বসে মদ খাচ্ছে। নেপোলিয়ন যেখান থেকে মস্কো শহরটাকে প্রথম দেখেছিলেন, সেই ছোট্ট পাহাড়টায় দাঁড়িয়ে আমি মস্কোর বিশালত্বের দিকে চোখ মেলে তাকাই। মনে হয় পাহাড় থেকে নামলেই আমি অ্যালিয়োশা, ভ্রনস্কি এবং আরও অনেককে দেখতে পাবো—আমার অসংখ্য বন্ধুদের চাইতেও তাদের সঙ্গে আমার অনেক বেশি অন্তরঙ্গ পরিচয়। আবার চীনেমাটির একটা পাত্রের দিকে চোখ পড়তেই আমি চীনের তীব্র কটু ঘ্রাণ অনুভব করি। মনে হয় ধান ক্ষেতের মধ্যে সরু আলপথ দিয়ে আমাকে ডুলিতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিংবা গাছগাছালিতে ভরা একটা পাহাড়ের প্রান্ত দিয়ে আমি এগিয়ে চলেছি ক্রমাগত। উজ্জ্বল প্রভাতে ক্লান্তিকর পথ পেরিয়ে যেতে যেতে মনের আনন্দে গল্প-গুজব করছে আমার বাহকেরা। মাঝে মাঝেই শুনতে পাচ্ছি দূরের কোনো মঠ থেকে ভেসে আসা রহস্যময় সুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি। পিকিঙের পথে ঘাটে ধূলিমলিন জনতার ভিড়। এক সার উটকে পথ করে দেবার জন্যে ভিড়টা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। আলতো পায়ে এগিয়ে চলেছে উটগুলো, মঙ্গোলিয়ার পাথুরে মরুভূমি থেকে ওরা বয়ে আনছে চামড়া আর নানান ধরনের আশ্চর্য ওষুধ। ইংলণ্ডে—লণ্ডনেও এক একটা শীতের বিকেলে মেঘগুলো যখন ভারি হয়ে অনেকটা নিচুতে ঝুঁকে থাকে, আলোটা অস্পষ্ট হয়ে যায়—তখন মনটা কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে ওঠে। কিন্তু তখন জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে আপনি দেখতে পাবেন, প্রবাল দ্বীপের সৈকতে অসংখ্য নারকেল গাছ ভিড় জমিয়ে রেখেছে। সৈকতের রূপোলি বালু সূর্যের আলোয় এমন ঝিলমিলিয়ে ওঠে যে হাঁটতে গেলে আপনি সেদিকে চোখ মেলে তাকাতে পারবেন না। মাথার ওপরে ময়না গান গেয়ে যায়, সফেন তরঙ্গ ক্রমাগত আছড়ে পড়ে তীরের শৈল-শ্রেণীতে।....আসলে তাপচুল্লির পাশে বসে যে সফরগুলোকে

সেরে ফেলা যায় সেগুলোই সব চাইতে সেরা সফর, কারণ তাতে অলীক কল্পনার ছবিগুলো আর নষ্ট হতে পারে না।

কিন্তু এমন মানুষও আছে যারা লবণ দিয়ে কফি খায়। তারা বলে এর ফলে কফিতে একটা কটু, নোনতা আস্বাদ হয়—যেটা খেতে অদ্ভুত এবং দারুণ। তেমনি রোম্যান্সের জ্যোতির্বলয়ে ঘেরা এমন কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলো চোখে দেখলে আপনার মোহভঙ্গ হওয়া অনিবার্য, কিন্তু তখন সেগুলো আপনার কাছে আবার এক নতুন আস্বাদ বয়ে আনবে। হয়তো সেখানে আপনি এক পরিপূর্ণ সৌন্দর্য প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু আপনি যা পেলেন তা যে কোনো সৌন্দর্যের চাইতে অনেক বেশি জটিল। এ যেন কোনো মহান চরিত্রের কিছু ছোটোখাটো দুর্বলতা—যা মানুষটিকে হয়তো একটু কম প্রশংসনীয় করে তুললেও, অবশ্যই অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে।

হনলুলুতে যাবার জন্যে আমার আদৌ কোনো প্রস্তুতি ছিলো না। জায়গাটা ইউরোপ থেকে এতো দূরে, স্যান ফ্রানসিসকো থেকে ওখানে যেতে গেলে এতো লম্বা পথ পাড়ি দিতে হয় এবং ওই নামটার সঙ্গে এতো বিচিত্র ও আকর্ষণীয় অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে যে প্রথম দেখায় আমি নিজের চোখ দুটোকে আদপেই বিশ্বাস করতে পারিনি। কেন জানি না, জায়গাটা সম্পর্কে আমার প্রত্যাশার কোনো যথাযথ ছবি আমি মনে এঁকে রাখিনি। কিন্তু যা দেখলাম তা আমার কাছে এক বিরাট বিস্ময় বয়ে আনলো। এটা ঠিক যেন পাশ্চাত্যেরই কোনো শহর। বড়ো বড়ো পাথুরে অট্টালিকার পাশাপাশি ছোটো ছোটো ঝুপড়ি। কাচের জানলা লাগানো আধুনিক দোকানঘরের গায়েই জরাজীর্ণ পুরনো বাড়ি। বিজলি গাড়িগুলো সশব্দে ছুটে চলেছে রাজপথ ধরে। পাশপথের ধারে সারি সারি মোটর গাড়ি—ফোর্ড, বুইক, প্যাকার্ড। মার্কিন সভ্যতার পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকমের পণ্য সামগ্রীতে দোকানগুলো বোঝাই। প্রতি তৃতীয় বাড়িতে একটা করে ব্যাংক এবং প্রতিটা পঞ্চম বাড়ি একটা করে জাহাজ কোম্পানির অফিস। রাস্তায় রাস্তায় বিভিন্ন জাতের মানুষের এক অকল্পনীয় সমাবেশ। আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে অ্যামেরিকানরা চলেছে গায়ে কালো কোট, মাড় লাগনো উঁচু কলারের জামা আর মাথায় টুপি চড়িয়ে। ক্যানাকাদের গায়ের রঙ ফিকে বাদামী, মাথায় কোঁকড়া চুল, পরনে শুধু জামা আর পাতলুন। রঙচঙে টাই আর পেটেন্ট লেদারের জুতো পরা দো-আঁশলারা ভারি চটপটে। মোটা কাপড়ের ছিমছাম পরিপাটি সাদা পোশাক পরা জাপানিদের মুখে আনুগত্যের হাসি, দু-এক পা পেছন পেছন পিঠে বাচ্চা নিয়ে হাঁটছে তাদের দেশী পোশাক পরা মেয়েরা। জাপানী বাচ্চাদের পরনে ঝলমলে রঙীন ফ্রক, ছোটো ছোটো মাথাগুলো কামানো—ঠিক যেন সুন্দর সুন্দর পুতুল। আর আছে চীনেরা। তাদের পুরুষগুলো মোটাসোটা, দেখে মনে হয় পয়সাকড়ি আছে,

পরনে বেখাপ্পা মার্কিনী পোশাক। কিন্তু মেয়েরা বেশ আকর্ষণীয়া। মাথার কালো চুলগুলোকে ওরা এমন সুন্দর টানটান করে বেঁধে রাখে যে মনে হয় ওগুলো কিছুতেই এলোমেলো হবে না। ওদের পরনে সাদা, হালকা নীল বা কালো রঙের কুর্তা আর পাতলুন—সবই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সব শেষে আছে ফিলিপাইনসের মানুষরা—পুরুষদের মাথায় ঘাসের তৈরি বিশাল বিশাল টুপি আর মেয়েদের পরনে ফাঁপানো হাতাওলা ঝলমলে হলদে মসলিনের পোশাক।

পুব আর পশ্চিমের মিলনক্ষেত্র এই হনলুলু। অতি আধুনিক এখানে অপরিসীম প্রাচীনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে। প্রত্যাশিত রোম্যান্সের সন্ধান না পেলেও এখানে এসে আপনি এক অদ্ভুত বিহ্বলতার মুখোমুখি হবেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা আর চিন্তাধারার এই বিচিত্র মানুষগুলো এখানে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বাস করে। ওরা ভিন্ন ভিন্ন দেবতায় বিশ্বাসী এবং ওদের মূল্যবোধও আলাদা। শুধুমাত্র দুটি ক্ষেত্রেই এদের মিল আছে—প্রেম এবং খিদে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, যে কোনো কারণেই হোক এরা এক অস্বাভাবিক প্রাণশক্তির অধিকারী। এখানকার বাতাস এতো মৃদু আর আকাশ এমন সুনীল হওয়া সত্ত্বেও এই সম্মিলিত জনতার মধ্যে—কেন তা জানি না—স্পন্দিত ধমনীর মতো একটা উষ্ণ আবেগের উপস্থিতি আপনি অনুভব করবেন। রাস্তার মোড়ে মঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে একটা সাদা লাঠির সাহায্যে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে থাকা পুলিসটিকে দেখে একটা ভদ্রসমাজের ছবি বলে মনে হলেও, আপনার মনে হতে বাধ্য যে আসলে ওই ভদ্রতা-সভ্যতা শুধু বাইরের একটা খোলস মাত্র—ওর একটু নিচেই আছে অন্ধকার আর রহস্য। তখন আপনি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবেন, আপনার বুকটা একটু ধুক করে উঠবে—রাত্রিবেলা অতর্কিতে ঢাকের একটানা সুগম্ভীর আওয়াজে অরণ্যের নিঃসীম নীরবতা কেঁপে কেঁপে উঠলে যেমনটি হয়, ঠিক তেমনি। তখন আশঙ্কায় আপনার মন ভরে উঠবে, কিন্তু কিসের আশঙ্কা তা আপনি বুঝে উঠতে পারবেন না।

এতোক্ষণ ধরে হনলুলুর পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে এতো কথা বলার একমাত্র কারণ এই যে, আমি যে কাহিনী বলতে চলেছি তাতে এ ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আমি মনে করি। একটা আদিম কুসংস্কারকে নিয়ে এই কাহিনী। খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ না হলেও, অবশ্যই এক অতি জটিল সভ্যজগতে এই ধরনের একটা কুসংস্কার যে কি করে আজও নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে তা ভাবলে আমি এখনও চমকে উঠি। টেলিফোন, ট্রামগাড়ি আর দৈনিক সংবাদপত্রের জগতেও এমন একটা ঘটনা যে ঘটে কিংবা ঘটে বলে মনে করা হয়—এটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারি না। এর সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, যে বন্ধুটি আমাকে হনলুলু ঘুরিয়ে দেখিয়েছে তার মধ্যেও এই একই বৈপরিত্য ছিলো এবং সেটা

আমি প্রথম থেকেই অনুভব করেছিলাম।

লোকটা উইন্টার নামে একজন অ্যামেরিকান। নিউ ইয়র্কের এক পরিচিত ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমি তার নামে একখানা পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছিলাম। লোকটার বয়েস চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, মাথায় পাতলা হয়ে আসা কালো চুলগুলো রগের কাছে ধূসর হয়ে গেছে, নাক-চোখ বেশ তীক্ষ্ণ, মুখখানা কৃশ। লোকটার চোখ দুটোতে একটা ঝলমলে দীপ্তি—বড়োসড়ো চশমাটা তাতে খানিকটা গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে, যেটা একটুও সুদৃশ্য নয়। চেহারাটা সাধারণের তুলনায় খানিকটা লম্বা। খুবই স্বল্পবাক। জন্ম হনলুলুতেই। তার বাবার একটা বিরাট দোকান ছিলো, সেখানে গেনজি মোজা এবং টেনিসের র‍্যাকেট থেকে শুরু করে ত্রিপল পর্যন্ত—মোট কথা, একজন আদবকায়দা-দুরস্ত মানুষের পক্ষে যা কিছুর প্রয়োজন হতে পারে তার সব কিছুই—বিক্রি হতো। দিব্যি রমরমা ব্যবসাটা। তাই উইন্টার ব্যবসায়ে যোগ দিতে রাজি না হয়ে অভিনেতা হবার দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করায় উইন্টারের বাবা যে কতোটা বিরক্ত হয়েছিলেন তা আমি সহজেই বুঝতে পারি। এরপর বিশটা বছর আমার বন্ধুটি মঞ্চজগতেই কাটিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে সে নিউ ইয়র্কে থেকেছে, কিন্তু আরও বেশি থেকেছে পথেঘাটে—কারণ তার রোজগার বেশি ছিলো না। কিন্তু বোকা নয় বলে অবশেষে সে বুঝতে পারে, ক্লিভল্যান্ডে ছোটোখাটো ভূমিকায় অভিনয় করার চাইতে হনলুলুতে গিয়ে মোজা বিক্কিরি করা অনেক ভালো। তাই মঞ্চ জগত ছেড়ে দিয়ে সে এসে ব্যবসাতে যোগ দেয়। দীর্ঘকাল অনিশ্চিতভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করার পর এখন সে বিশাল গাড়ি হাঁকিয়ে চলা এবং গলফ কোর্সের কাছে সুন্দর একটা বাড়িতে থাকার বিলাসিতাটুকু পুরোপুরি উপভোগ করছে বলেই আমার ধারণা। মানুষটার যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধি আছে। তাই ব্যবসাটা সে যে সুদক্ষভাবেই চালাচ্ছে, সে বিষয়ে আমি একেবারে সুনিশ্চিত। কিন্তু শিল্পকলার সঙ্গে সে আজও নিজের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারেনি। তাই হয়তো আর কোনোদিনও অভিনয় করা সম্ভব হবে না বলে, সে এখন ছবি আঁকতে শুরু করেছে। নিজের স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে উইন্টার আমাকে তার কাজগুলো দেখিয়েছে। ছবিগুলো আদপেই খারাপ নয়, কিন্তু ওর কাছ থেকে আমি ঠিক এধরনের কাজ প্রত্যাশা করিনি। ওর সমস্ত ছবিই জড়বস্তুর—খুবই ছোটো ছোটো ছবি, হয়তো দৈর্ঘ্য-প্রস্থে আট-দশ ইঞ্চি মতো হবে। সবগুলো ছবিই বিশেষ যত্ন নিয়ে আঁকা। স্পষ্টই বোঝা যায়, খুঁটিনাটি জিনিসগুলোর দিকে মানুষটার ভীষণ আকর্ষণ। ওর আঁকা ফলের ছবি ঘিরলানদাজোর ফলের ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। ওর ধৈর্য দেখে অতি সামান্য মাত্রায় বিস্মিত হলেও দক্ষতা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। আমার মনে হয়, অভিনয়ের ক্ষেত্রেও ওর সতর্ক চিন্তিত প্রয়াস কখনও তেমন দুঃসাহসিক বা সুস্পষ্ট না হওয়ায় তা পাদপ্রদীপের ওধারে

গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না এবং অভিনেতা হিসেবে এটাই ওর অসাফল্যের কারণ।

বেশ তালেবরের মতো, অথচ খানিকটা বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে উইণ্টার আমাকে শহরটা ঘুরিয়ে দেখালো। তার ধারণা গোটা অ্যামেরিকায় এর তুল্য শহর নেই। কিন্তু সে নিজেই পরিষ্কার বুঝতে পারছিলো, তার ভঙ্গিটা হাস্যকর। গাড়িতে চাপিয়ে সে আমাকে বিভিন্ন অট্টালিকাগুলো ঘুরিয়ে দেখালো এবং আমি তাদের স্থাপত্যশৈলীর প্রশংসা করায় সে খুশিতে ফুলে উঠলো। শহরের ধনী ব্যক্তিদের বাড়িগুলোও আমাকে দেখালো সে।

'ওইটে হচ্ছে স্টাবদের বাড়ি, তৈরি করতে এক লাখ ডলার খরচা হয়েছিলো। স্টাবরা এখানকার একটা সেরা পরিবার। প্রায় সত্তর বছর আগে বুড়ো স্টাব একজন মিশনারি হিসেবে এখানে এসেছিলেন।' সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে উইণ্টার আমার দিকে তাকালো, বিশাল গোলাকার চশমার ওধারে ঝিকমিকিয়ে উঠলো তার চোখ দুটো, 'আমাদের এখানকার সবকটা সেরা পরিবারই মিশনারি পরিবার। যাদের বাপ-দাদারা কোনো বিধর্মীকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা দেননি, হনলুলুতে তাদের কেউই খুব একটা কেউকেটা নয়।'

'তাই নাকি?'

'আপনি নিজের বাইবেলখানা পড়েছেন?'

'মোটামুটি।'

'সেখানে এক জায়গায় আছে: পিতৃপুরুষরা টক আঙুর খেয়েছেন আর সন্তানদের দাঁত টকে গেছে। আমার মনে হয় হনলুলুতে ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। এখানে পিতৃপুরুষরা ক্যানাকাদের কাছে খ্রিষ্টধর্ম নিয়ে এসেছেন আর তাঁদের সন্তানরা এখানকার জমিজমা দখল করেছে।'

'ঈশ্বর তাদেরই সাহায্য করেন যারা নিজেদের সাহায্য করে,' আমি বিড়বিড় করে বলি।

'অবশ্যই তাই। স্থানীয় লোকেরা যখন স্বেচ্ছায় খ্রিষ্টধর্ম অবলম্বন করলো তখন আর অন্য কিছুকে অবলম্বন করার মতো অবস্থা তাদের ছিলো না। রাজারা শ্রদ্ধার প্রতীক হিসেবে মিশনারিদের জমি দান করেছিলেন আর মিশনারিরা জমি কিনেছিলেন স্বর্গে ঐশ্বর্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। তাঁদের লগ্নীটা অবশ্যই ভালো হয়েছিলো। একজন মিশনারি তো জাতব্যবসা (মনে হয় এটাকে 'ব্যবসা' বললে কারুর কোনো আপত্তি হবে না) ছেড়ে দিয়ে জমির দালালই হয়ে গেলেন! তবে সেটা একটা ব্যতিক্রম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলেরাই প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক দিকটা দেখতো। পঞ্চাশ বছর আগে যার বাবা এখানে সত্যধর্মের প্রচার করতে এসেছিলেন, তার কপাল সত্যিই ভালো।' হঠাৎ উইণ্টার তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, 'যাঃ, বন্ধ হয়ে গেছে! তার মানে এখন একটা ককটেল পানের সময়।'

দুধারে লাল জবা লাগানো চমৎকার রাজপথ ধরে দ্রুত বেগে গাড়ি চালিয়ে

আমরা শহরে ফিরে এলাম।

'আপনি ইউনিয়ন সেলুনে গেছেন?'

'এখনও যাই নি।'

'তাহলে ওখানেই যাই, চলুন।'

জানতাম এটা হনলুলুর সব চাইতে বিখ্যাত জায়গা, তাই খানিকটা সজীব কৌতূহল নিয়েই ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। কিং স্ট্রীট থেকে একটা সরু গলি দিয়ে এখানে আসতে হয়। এটা একটা বিশাল বর্গাকার ঘর, তিনটে প্রবেশপথ। ঘরের এক দিকে দেয়ালের ধার বরাবর পানশালা। বিপরীত দিকে দু কোণে বিভাজকের সাহায্যে ছোটো ছোটো খুপরি করে রাখা হয়েছে। শোনা যায় রাজা কালাকাউয়া যাতে প্রজাদের দৃষ্টির অলক্ষ্যে বসে মদ্যপান করতে পারেন, সেই জন্যেই ওগুলো তৈরি করা হয়েছিলো। ভাবতে ভালো লাগে, হয়তো ওরই একটাতে সেই কালো কুচকুচে রাজা রবার্ট লুই স্টিভেনসনের সঙ্গে মদের বোতল নিয়ে বসেছিলেন। দামী সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো তাঁর একখানা তৈলচিত্রও দেয়ালে রয়েছে। আছে মহারানী ভিক্টোরিয়ার দুখানা ছাপাই ছবি। তা ছাড়া দেয়াল জুড়ে অষ্টাদশ শতকের কিছু প্রাচীন খোদাই ছবিও রয়েছে। তার মধ্যে একটা আবার ডি ওয়াইলডের একখানা ছবির অনুকরণ—ওটা এখানে কি করে এলো তা ঈশ্বরই জানেন। আর আছে বিশ বছর আগে গ্রাফিক আর ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজে বড়োদিন উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড়পত্র থেকে কেটে রাখা কিছু ছবি, হুইস্কি জিন শ্যাম্পেন আর বিয়ারের বিজ্ঞাপন, বেসবল আর স্থানীয় ঐকতান-বাদকদলের আলোকচিত্র।

মনে হলো আধুনিক কর্মব্যস্ত দুনিয়াটাকে আমি বাইরের ঝলমলে রাস্তায় রেখে এসেছি, তার সঙ্গে এ জায়গাটার কোনো সম্পর্ক নেই। এ জায়গাটা মুমূর্ষু, বেশ কিছুদিন আগেই এর দিন ফুরিয়ে গেছে। নোংরা, অপরিচ্ছন্ন, অস্পষ্ট আলোয় স্বল্প আলোকিত জায়গাটাতে কেমন যেন একটা রহস্যের আভাস—মনে হয় অবৈধ কার্যকলাপ চালাবার পক্ষে জায়গাটা একেবারে আদর্শ। জায়গাটা সেই সমস্ত ভয়ংকর দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন জীবনটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে মানুষকে যাতায়াত করতে হতো, যখন হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৈচিত্র্য এনে দিতো তাদের একঘেয়ে জীবনযাত্রায়।

ভেতরে ঢুকে দেখি সেলুন প্রায় ভর্তি। একদল ব্যবসায়ী পানশালায় দাঁড়িয়ে ব্যবসার কথা আলোচনা করছে আর এক কোণে দুজন ক্যানাকা মদ খাচ্ছে। দু-তিনটে লোক, সম্ভবত দোকানদার, জুয়ার দান দেবার জন্যে গুঁটি ঝাঁকাচ্ছে। বাদবাকি সকলেই জলচর—জাহাজের ক্যাপটেন, প্রথম মেট আর এঞ্জিনিয়ার। পানশালার ওপাশে বিশাল চেহারার দুটো দোআঁশলা ত্রস্তভঙ্গিতে ক্রমাগত হনলুলু ককটেল মিশিয়ে চলেছে। এই বিশেষ পানীয়ের জন্যেই এ জায়গাটা এতো বিখ্যাত। লোক দুটোর পরনে সাদা পোশাক, মোটাসোটা চেহারা, দাড়ি-গোঁফ কামানো, গায়ের রঙ কালো, মাথায় ঘন

কোঁকড়ানো চুল, চোখ দুটো আয়ত আর উজ্জ্বল।

মনে হলো এখানকার অর্ধেকের বেশি লোকই উইণ্টারের চেনা। আমরা পথ করে পানশালার দিকে এগুচ্ছিলাম। চশমা পরা মোটাসোটা এক ভদ্রলোক মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন। উইণ্টারকে উনি একপাত্র সুরা পান করার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন।

'না ক্যাপটেন, আপনিই বরং এসে আমার সঙ্গে একটু পান করে যান।' আমার দিকে ফিরে উইণ্টার বললো, 'আপনার সঙ্গে ক্যাপটেন বাটলারের পরিচয়টা হয়ে যাক।'

ছোটোখাটো মানুষটি আমার হাতে হাত মেলালেন। আমরা কথাবার্তা বলতে শুরু করলাম। কিন্তু পরিবেশের কল্যাণে আমার মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠায় মানুষটিকে আর তেমন নজর করে দেখতে পারলাম না। একটা করে ককটেল পান করার পর আমরা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। ফের গাড়িতে চেপে ওখান থেকে চলে আসার সময় উইণ্টার বললো, 'বাটলারের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হলো। আমি চাইছিলাম ওর সঙ্গে আপনার দেখা হোক। লোকটাকে দেখে কি মনে হলো?'

'তেমন করে কিছু ভেবে দেখিনি।'

'আপনি অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস করেন?'

'বিশ্বাস করি বলে সঠিক কিছু জানা নেই,' আমি মৃদু হাসলাম।

'বছর দু-এক আগে ওই লোকটার জীবনে একটা ভারি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে। ওর মুখ থেকেই ঘটনাটা আপনার শোনা উচিত।'

'কি ধরনের ঘটনা?'

উইণ্টার আমার প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে বললো, 'ঘটনাটার কোনো ব্যাখ্যা আমার নিজেরও জানা নেই। কিন্তু সেটা যে বাস্তব, সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। আপনি কি এ সমস্ত বিষয়ে আগ্রহী?'

'এ সমস্ত বিষয় বলতে?'

'যেমন ধরুন সম্মোহন, যাদুবিদ্যা—এ সমস্ত?'

'আমি এমন কাউকে দেখিনি যার এগুলোতে আগ্রহ নেই।'

এক মুহূর্ত নীরবতার পর উইণ্টার বললো, 'আমি নিজে কিছু বলবো না। বিচার বিবেচনা করে দেখতে হলে ওর মুখ থেকেই আপনার সবকিছু শোনা উচিত। আজ রাতে আপনি কি করছেন?'

'কিছুই করার নেই।'

'বেশ, আমি তাহলে এর মধ্যেই গিয়ে ওকে ধরবো। দেখি, আমরা যদি ওর জাহাজে গিয়ে উঠতে পারি।'

উইণ্টার লোকটার সম্পর্কে আমাকে কিছু কিছু বললো। ক্যাপটেন বাটলার সারাটা জীবন প্রশান্ত মহাসাগরেই কাটিয়েছে। এখনকার চাইতে আগে তার অবস্থা অনেক বেশি ভালো ছিলো, কারণ তখন সে

ক্যালিফোর্ণিয়ার উপকূল ধরে যাতায়াতকারী একটা যাত্রী জাহাজের ফার্স্ট অফিসার এবং ক্যাপটেন ছিলো। কিন্তু জাহাজটা ডুবে যায় এবং সেই সঙ্গে বেশ কয়েকজন যাত্রীরও সলিল সমাধি হয়।

'সম্ভবত মদের নেশাই এর কারণ,' উইণ্টার বললো।

জাহাজ ডুবির কারণ খুঁজতে একটা তদন্ত অবশ্যই হয়েছিলো এবং তার ফলেই ক্যাপটেন বাটলার তার সার্টিফিকেটটি খোয়ায়। তারপর তাকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়, বেশ কয়েক বছর সে দক্ষিণ সমুদ্রেও ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এখন সে ছোট্ট একটা স্কুনারের কর্তৃত্ব পেয়েছে, স্কুনারটা হনলুলু ও তার পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলোর মধ্যে যাতায়াত করে। স্কুনারের মালিক একজন চীনে। তার কাছে ক্যাপটেনের সার্টিফিকেট না থাকার একমাত্র অর্থ হলো, তাকে কম মাইনেয় রাখা যায়। তাছাড়া একজন শ্বেতাঙ্গকে জাহাজের দায়িত্বে রাখা সব সময়েই সুবিধেজনক।

উইন্টারের মুখে লোকটার কথা শুনে আমি আরও নিখুঁতভাবে তার চেহারাটা মনে করার চেষ্টা করতে লাগলাম। গোল গোল চশমার ওধারে তার গোলাকার নীল চোখ দুটোর কথা আমার মনে পড়লো এবং এইভাবে আস্তে আস্তে তার পুরো চেহারাটাই আমি মনের সামনে গড়ে তুললাম। খাঁজহীন ছোটোখাটো নাদুসনুদুস চেহারা, পূর্ণচন্দ্রের মতো গোলাকার মুখ, মাংসল ছোট্ট নাক, মাথায় ছোটোছোটো চুল, মুখটা লাল এবং পরিষ্কার করে কামানো। লোকটার হাত দুটোও মোটাসোটা, গাঁটগুলোতে টোল পড়ে এবং পা দুটো মোটা ও বেঁটে। মানুষটা হাসিখুশি, মনে হয় অতীতের দুঃখজনক অভিজ্ঞতা তার মনে কোনো দাগই ফেলতে পারেনি। বয়েস নির্ঘাৎ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ, কিন্তু দেখে অনেক কম বলে মনে হয়। তবে এসবই ওপর ওপর দেখা। এখন তার জীবনের সর্বনেশে বিপদটার কথা জেনে ঠিক করলাম, ফের দেখা হলে মানুষটাকে আমি একটু নজর করে দেখবো। আবেগের প্রতিক্রিয়া এক একজনের ওপরে এক এক রকম হয়। কেউ কেউ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বিগ্রহ, আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা এবং অকল্পনীয় আতঙ্কের মধ্যেও নিজেদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। আবার নির্জন সমুদ্রে কেঁপে কেঁপে ওঠা চাঁদ কিংবা ঘন ঝোপঝাড় থেকে ভেসে আসা কোনো পাখির গানই কোনো কোনো মানুষের সমস্ত অস্তিত্বটাকে বদলে দিয়ে যায়। এর জন্য কি ব্যক্তিগত চারিত্রিক বলিষ্ঠতা বা দুর্বলতাই দায়ী, নাকি কল্পনা আর স্থৈর্যের অভাবই এর কারণ—তা আমি জানি না। মনে মনে আমি সেই ভয়ঙ্কর জাহাজডুবির দৃশ্য, ডুবন্ত মানুষের সেই অসহায় আর্তচিৎকার আর বীভৎস আতঙ্কের কথা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। তারপর ভাবলাম তদন্তের সেই অগ্নিপরীক্ষা, প্রিয়জন বিয়োগের সেই মর্মান্তিক বেদনা, সংবাদপত্রে ক্যাপটেনের সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন রূঢ় বক্তব্য যা ক্যাপটেন নিজেও পড়েছে, তার সেই লজ্জা আর অপমানের কথা। তারপরেই আহত বিস্ময়ে আমার মনে পড়লো,

ক্যাপটেন বাটলার একটা স্কুলের ছেলের মতো অকপট অশ্লীলতায় আমাদের কাছে হাওয়াই দ্বীপ এবং তার নিষিদ্ধ এলাকা আইউইলির মেয়েদের নিয়ে নানান কথাবার্তা বলেছে, ওই সমস্ত জায়গায় তার বিভিন্ন সফল অভিযান-গুলোর বর্ণনাও দিয়েছে। তখন যেভাবে সে হাসছিলো, তেমন করে তার আর কোনোদিনও হাসতে পারার কথা নয়। মনে পড়লো তার ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলোর কথা, যেগুলো তার শরীরের সব চাইতে সেরা অংশ। মানুষটার সম্পর্কে আমার আগ্রহ জাগতে শুরু করলো—তার খুশিয়াল অনাসক্তির কথা ভাবতে গিয়ে আমি ভুলেই গেলাম যে একটা বিশেষ কাহিনী শোনার জন্যে তার সঙ্গে আমার ফের দেখা করার কথা। মনে হলো লোকটার সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার—গল্প শোনার জন্যে নয়—লোকটা কেমন সেই সম্পর্কে যদি আরও একটু কিছু বুঝতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে।

উইণ্টার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করে রেখেছিলো। রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমরা জাহাজঘাটে গিয়ে হাজির হলাম। জাহাজের নৌকোটা আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। বন্দর থেকে খানিকটা দূরে নোঙর ফেলেছিলো ক্যাপটেনের স্কুনারটা। নৌকো বেয়ে জাহাজের কাছাকাছি যেতেই আমি উকুলেইলির সুর শুনতে পেলাম। সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে গিয়ে উঠলাম আমরা।

'লোকটা কেবিনেই আছে বোধহয়,' আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে উইণ্টার বললো।

কেবিনটা ছোটো, অগোছালো এবং নোংরা। একদিকে একটা টেবিল এবং চতুর্দিকে চওড়া বেঞ্চি পাতা—মনে হয় আজেবাজে পরামর্শ পেয়ে যারা এহেন একটা জাহাজের যাত্রী হয় তারাই ওখানে ঘুমোয়। একটা পেট্রোলি-য়ামের আলোয় কেবিনটা স্বল্পালোকিত। দেখলাম একটি স্থানীয় মেয়ে উকুলেইলিটা বাজাচ্ছে আর বাটলার আধশোয়া অবস্থায় এক হাতে মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরে ওর কাঁধে মাথা রেখে ঢুলছে।

'আমরা তোমাকে বিরক্ত করতে চাই না, ক্যাপটেন,' উইণ্টার সরস সুরে বললো।

'আরে এসো, এসো!' বাটলার উঠে এসে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করলো, 'কি খাবে বলো।'

রাতটা বেশ গরম। কেবিনের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায়, নীলিম আকাশের বুকে অগুন্তি তারার ঐশ্বর্য। ক্যাপটেন বাটলারের পরনে একটা হাতাকাটা ফতুয়া আর একটা অতি নোংরা পাতলুন। খালি পা, কিন্তু মাথার কোঁকড়া চুলে একটা অতি পুরনো ও বেঢপ আকৃতির ফেল্টের টুপি।

'এসো, আমার প্রেমিকাটির সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই। একেবারে পিচ ফলের মতো লোভনীয় জিনিস, তাই না?'

একটা ভারী সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমরা করমর্দন করলাম। মেয়েটি ক্যাপটেনের চাইতে বেশ খানিকটা লম্বা, গড়নটিও সুন্দর। দেখে সন্দেহ হয়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো ও খানিকটা মোটা হয়ে যাবে—কিন্তু এখন ও সত্যিই ভারি লাবণ্যময়ী আর চটপটে। গায়ের বাদামী ত্বক এতোই মসৃণ যে মনে হয় আলো ঠিকরে ওঠে। চোখ দুটি অপূর্ব। মাথার ঘন কালো চুলগুলো একটা বিশাল বিনুনীর আকারে মাথার চতুর্দিকে ঘুরিয়ে বাঁধা। অভ্যর্থনার হাসিটি ভারি স্বাভাবিক। হাসার সময় দেখলাম ওর দাঁতগুলো সাদা, ছোটো ছোটো, কিন্তু সমান মাপের। সত্যিই প্রচণ্ড আকর্ষণীয়া মেয়েটি। দেখে সহজেই বোঝা যায়, ক্যাপটেন ওকে পাগলের মতো ভালোবাসে। ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না মানুষটা, সারাক্ষণই ওকে ছুঁয়ে থাকতে চাইছে। এ ব্যাপারটা অবিশ্যি অতি সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো মেয়েটিও ক্যাপটেনকে ভালোবাসে এবং এটাই আমার কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হলো। ওর চোখ দুটিতে এক আশ্চর্য ঝিলিক, যার অর্থ বুঝতে একটুও ভুল হয় না। বাসনার দীর্ঘশ্বাস ফেলার প্রয়োজনেই হয়তো ওর ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে। দৃশ্যটা রোমাঞ্চকর, এমন কি খানিকটা মর্মস্পর্শীও বটে। মনে হলো, আমি এসে ওদের আনন্দের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি। এই প্রেমিকযুগলের মাঝখানে বাইরের একটা অপরিচিত উটকো লোকের স্থান কোথায়? মনে হলো উইণ্টার আমাকে এখানে না আনলেই ভালো হতো। মনে হলো নোংরা কেবিনটাও এখন যেন রূপ বদলে, এ ধরনের একটা চরম কামনামদির দৃশ্যের উপযুক্ত দৃশ্যপট হয়ে উঠেছে। মনে হলো সমস্ত পৃথিবী থেকে বহু দূরে, অজস্র তারায় ভরা অনন্ত আকাশের নিচে, হনলুলু বন্দরের মালপত্রে ঠাসা এই স্কুনারটাকে আমি জীবনে কোনোদিনও ভুলতে পারবো না। ভাবতে ভালো লাগছিলো, ওই প্রেমিকযুগল যেন এই নিবিড় নিশিথে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অসীম শূন্যতা পেরিয়ে এক সবুজ পাহাড়ি দ্বীপ থেকে ভেসে চলেছে অন্য কোনো দ্বীপের উদ্দেশ্যে। রোম্যান্সের এক টুকরো ক্ষীণ বাতাস যেন আলতো করে ছুঁয়ে গেলো আমার গাল দুটোকে।

অথচ বাটলার এমন একজন মানুষ যার সঙ্গে প্রেমপ্রীতির আদৌ কোনো রকম সংস্রব থাকতে পারে বলে মনে হয় না। ওর মধ্যে এমন কিছু খুঁজে পাওয়া শক্ত, যা দেখে কারুর মনে প্রেমের সঞ্চার হতে পারে। পোশাক-আশাক যা পরে আছে তাতে ওকে আরও বেশি করে মোটাসোটা দেখাচ্ছে। গোল মুখে গোল চশমাটা পরে থাকায় ওকে মনে হচ্ছে যেন একটা নধরকান্তি শিশু। ওকে দেখে একটা গোল্লায় যাওয়া যাজক বলেই বরং মনে হয়। ওর কথাবার্তায় সুস্পষ্ট মার্কিনী দক্ষতা, দিব্যি না দিয়ে একটা বাক্যও গড়তে পারে না। যদিও নেহাৎ ভানসর্বস্ব মানুষের কানেই তার কথাবার্তাগুলো আপত্তিকর লাগবে, কিন্তু ছাপতে গেলে সেগুলোই খানিকটা স্থূল বলে মনে

হবে। লোকটা আমুদে এবং সম্ভবত প্রণয়ক্ষেত্রে তার সফলতার জন্যে সেটার দান খুব একটা কম নয়। এর কারণ অধিকাংশ মহিলাই লঘুপ্রকৃতির, পুরুষদের গুরুগম্ভীর ব্যবহারে তারা বিরক্ত হয়ে ওঠে। তাই যে সমস্ত ভাঁড়গুলো মেয়েদের হাসায়, মেয়েরা খুব কম ক্ষেত্রেই তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে। ওদের রসবোধ একটু স্থূল জাতের। বুঝতে পারলাম, ক্যাপটেন বাটলারের খানিকটা আকর্ষণশক্তি আছে। জাহাজ ডুবির সেই বিয়োগান্ত কাহিনীটা জানা না থাকলে আমি নিশ্চয়ই ভাবতাম, মানুষটাকে জীবনে কোনোদিনও চিন্তা-ভাবনা করতে হয়নি।

আমরা কেবিনে ঢুকতেই ক্যাপটেন ঘণ্টি বাজিয়েছিলো। এবারে তার চীনে পাচকটি আরও কয়েকটা গ্লাস এবং বেশ কয়েক বোতল সোডা নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। হুইস্কি এবং ক্যাপটেনের গ্লাসটা আগে থেকেই টেবিলের ওপরে ছিলো। কিন্তু চীনে পাচকটিকে দেখে আমি সত্যিই চমকে উঠলাম। কারণ অমন কুৎসিত চেহারার মানুষ আমি জীবনেও দেখিনি। লোকটা ভীষণ বেঁটে, গাট্টাগোট্টা চেহারা, কিন্তু প্রচণ্ড খুঁড়িয়ে চলে। গায়ে একটা ফতুয়া আর পরনে পাতলুন—যেগুলো এক সময় সাদা ছিলো, কিন্তু এখন একেবারে নোংরা। মাথায় খোঁচাখোঁচা পাকা চুলের ওপরে দু দিকে দুটো সিঙওলা একটা পুরনো টুপি বসানো। চওড়া চৌকো মুখটা এমনই চ্যাপটা যে মনে হয় একটা প্রচণ্ড জোরদার ঘুঁষি খেয়ে মুখটা থেঁতলে গেছে। তাছাড়া মুখটা বসন্তের গভীর দাগেও কলঙ্কিত। কিন্তু সব চাইতে বীভৎস হলো, তার ওপরের ঠোঁটটা চেরা। কোনোদিন অপারেশন না করায় চেরা ঠোঁটটা একটা কোণ সৃষ্টি করে সোজা নাকের দিকে উঠে গেছে আর ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে বেরিয়ে আছে বিশাল একটা হলদে দাঁত। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ঠোঁটের কোণে একটা সিগারেট নিয়ে লোকটা ঘরে এসে ঢুকলো এবং তার ফলে কেন জানি না মনে হলো, লোকটা স্রেফ একটা শয়তান। গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে সে একটা সোডার বোতল খুললো।

'পুরোটা ঢেলো না, জন,' ক্যাপটেন বললো।

বিনা বাক্যব্যয়ে লোকটা আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে গ্লাস তুলে দিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলো।

'আপনি আমার লোকটাকে লক্ষ্য করছিলেন দেখলাম,' মোটাসোটা চকচকে মুখে হাসি ফুটিয়ে বাটলার বললো।

'অন্ধকার রাতে ওকে দেখার কোনো ইচ্ছে আমার নেই,' আমি বললাম।

'লোকটা বেশ ঘরোয়া,' যে কোনো কারণেই হোক, যেন বিচিত্র এক তৃপ্তি নিয়ে ক্যাপটেন বললো। 'তবে ওর একটা ব্যাপার খুবই ভালো, সেটা আমি দুনিয়া শুদ্ধু সবাইকেই বলতে পারি। ওকে আপনি যতোবার দেখবেন ততোবারই আপনাকে এক পাত্তোর করে মদ পান করতে হবে।'

টেবিলের ওপরে দেয়ালে টাঙানো একটা কুমড়োর খোলার দিকে চোখ

পড়ায় আমি উঠে গিয়ে সেটা দেখতে লাগলাম। বহুদিন ধরেই আমি একটা পুরনো খোলা খুঁজে বেড়াচ্ছি। যাদুঘরের বাইরে যেগুলো দেখেছি তার মধ্যে এটাকেই মন্দের ভালো বলতে হবে।

'এখানকারই একটা দ্বীপের সর্দার আমাকে ওটা দিয়েছে,' আমাকে লক্ষ্য করতে করতে ক্যাপটেন বললো। 'আমি তার একটা উপকার করেছিলাম বলে সে আমাকে একটা ভালো জিনিস দিতে চেয়েছিলো।'

'সত্যিই ভালো জিনিস দিয়েছে।'

ভাবছিলাম কায়দা করে বাটলারের কাছ থেকে জিনিসটা আদায় করা যায় কি না। এ ধরনের একটা জিনিসের ওপরে মানুষটার কোনো দরদ থাকতে পারে বলে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই সে বললো, 'দশ হাজার ডলার দাম পেলেও আমি ওটা বিক্রি করবো না।'

'আমারও তাই মনে হয়,' উইণ্টার বললো। 'ওটা বিক্রি করলে অন্যায় করা হবে।'

'কেন?' আমি জানতে চাইলাম।

'তা ওই গল্পটার মধ্যেই আছে,' উইণ্টার জবাব দিলো। 'তাই নয় কি, ক্যাপটেন?'

'তা বটেই তো!'

'তাহলে সেটাই শোনা যাক।'

'রাত তো এখনও বেশি হয়নি,' ক্যাপটেন বললো।

কিন্তু সে আমার কৌতূহল মেটাবার আগেই রাতের তারুণ্য ফুরিয়ে গেলো। ইতিমধ্যে আমরা প্রচুর হুইস্কি গিলেছি, ক্যাপটেন অতীতের স্যান ফ্র্যানসিসকো আর দক্ষিণ সমুদ্র সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার গল্প বলে গেছে। অবশেষে নিজের বাদামী রঙের বাহুতে মাথা রেখে, বেঞ্চির ওপরে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়লো। নিঃশ্বাসের তালে তালে মৃদু ছন্দে ওঠানামা করতে লাগলো ওর বুক দুটি। ঘুমন্ত অবস্থায় কেমন যেন বিষণ্ণ, কিন্তু শ্যামল-সুন্দর দেখাচ্ছিলো ওকে।

মালপত্র নেবার জন্যে বাটলার তার পুরনো স্কুনারটা নিয়ে যে দ্বীপগুলোতে ঘুরে বেড়ায়, তারই একটাতে সে ওই মেয়েটিকে পেয়েছিলো। ক্যানাকারা কাজকর্ম করতে খুব একটা ভালোবাসে না। ফলে পরিশ্রমী চীনে আর ধূর্ত জাপানিরা দেশের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যই তাদের হাত থেকে নিয়ে নিয়েছে। মেয়েটির বাবার সামান্য এক চিলতে জমি ছিলো, তাতে সে ট্যারো আর কলার চাষ করতো। আর ছিলো একটা নৌকো, তাতে চেপে সে মাছ ধরতে যেতো। স্কুনারের মেটের সঙ্গে লোকটার কেমন যেন একটা দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিলো এবং ওই মেটই একটা অলস সন্ধ্যা কাটাবার উদ্দেশ্যে একদিন ক্যাপটেন বাটলারকে ওদের ভাঙাচোরা ঝুপড়িটাতে নিয়ে

যায়। ওরা গিয়েছিলো এক বোতল হুইস্কি আর উকুলেইলিটা সঙ্গে নিয়ে। ক্যাপটেন লাজুক নয়, তাই সেখানে একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখেই সে প্রেম করতে শুরু করে। দেশীয় ভাষাটা সে বেশ তরতরিয়েই বলতে পারে, তাই মেয়েটির ভয় ভাঙাতেও তার খুব একটা সময় লাগেনি। নাচে গানে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে দেবার পর দেখা যায় মেয়েটি ক্যাপটেনের পাশে বসে রয়েছে আর ক্যাপটেনের একটা হাত মেয়েটির কোমর জড়িয়ে রেখেছে। শেষ অব্দি যে কোনো কারণেই হোক, ক্যাপটেনের জাহাজকে ওই দ্বীপে বেশ কয়েকদিনের জন্য আটকে থাকতে হয়। ক্যাপটেন কোনোদিনই তাড়াহুড়ো করার মতো মানুষ নয় এবং এক্ষেত্রেও দ্রুত নোঙর তোলার জন্যে কোনো চেষ্টাই সে করেনি। ওই আরামপ্রদ ছোট্ট বন্দরে তার দিন দিব্যি ভালোই কাটছিলো। প্রতিদিন সকালে সে জাহাজটাকে ঘিরে এক চক্কর সাঁতার কাটতো, আর এক চক্কর সন্ধ্যায়। বন্দরের কাছাকাছি একটা মনিহারি দোকানে নাবিকদের এক পাত্তর হুইস্কি গেলার ব্যবস্থা ছিলো। দিনের বেশির ভাগ সময়টাই বাটলার সেখানে বসে দোকানের দো-আঁশলা মালিকটার সঙ্গে তাস পিটতো। তারপর রাত্রিবেলা মেটের সঙ্গে যেতো সেই সুন্দরী মেয়েটির বাড়িতে। সেখানে ওরা দু-একটা গান গাইতো, গল্প করতো। মেয়েটির বাবাই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে বাটলারের কাছে প্রস্তাব দেয়। বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশেই ওরা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা চালাতে থাকে আর মেয়েটা ততোক্ষণ ক্যাপটেনের গায়ের সঙ্গে ঘন হয়ে বসে কখনও হাতের মৃদু চাপে আবার কখনও নরম সুস্মিত চাহনি দিয়ে বাটলারকে উৎসাহিত করতে থাকে। বাটলারেরও মেয়েটিকে মনে ধরেছিলো। সে ঘরোয়া মানুষ। সমুদ্রে মাঝে মাঝে তার বড্ডো একঘেয়ে লাগে। ওই হতচ্ছাড়া রদ্দিমার্কা জাহাজটাতে এমন একটা সুন্দরী মেয়ে থাকলে ভারি ভালো হয়। তার বাস্তব জ্ঞানও বেশ টনটনে। মেয়েটা জাহাজে থাকলে তার মোজা রিপু করতে পারবে, পোশাক আশাকগুলো কাচাকাচি করতে পারবে। চীনেটাকে দিয়ে এসব কাজ করাতে করাতে বাটলার একেবারে হয়রাণ হয়ে উঠেছে—হতভাগাটা সমস্ত কিছুই ছিড়েখুঁড়ে শেষ করে দেয়। কাজেই এখন শুধু মেয়েটির দাম স্থির করা নিয়ে কথা। মেয়েটির বাবা আড়াই-শো ডলার চাইছিলো। এদিকে ক্যাপটেন কোনোদিনই সঞ্চয়ী নয়, কাজেই অতো টাকা তার হাতে নেই। তবে তার মনটা উদার, মেয়েটির নরম গাল তার গালের সঙ্গে লেগে রয়েছে—এ অবস্থায় তার আর দর কষাকষি করতে ইচ্ছে হলো না। সে তক্ষুণি দেড়শো ডলার এবং বাকি একশো পরবর্তী তিন মাসে মিটিয়ে দেবার প্রস্তাব জানালো। এই নিয়ে অনেক কথাবার্তা তর্কবিতর্ক চললো, কিন্তু ওই রাতে দুপক্ষ কিছুতেই কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারলো না। অথচ মেয়েটির চিন্তা ক্যাপটেনকে পেয়ে বসেছিলো। যথারীতি সারা রাত সে ঘুমোতে পারলো না। সারারাতই সে ওই সুন্দরী মেয়েটির স্বপ্ন দেখেছে এবং বারবার নিজের ঠোঁটে ওর নরম ঠোঁট দুটির মৃদু চাপ

অনুভব করে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। সকালবেলা উঠে নিজেকে সে প্রাণভরে খিস্তি দিলো, কারণ গতবার হনলুলুতে এসে এক রাত্তিরের পোকার খেলায় সে সর্বস্ব খুইয়েছিলো। অথচ গত রাত্তিরে সে যদি মেয়েটির প্রেমে পড়ে থাকে, তবে আজ সকালে ওর জন্যে সে পাগল।

'দ্যাখো ব্যানানা,' ক্যাপটেন মেটকে বললো, 'ওই মেয়েটিকে আমার পেতেই হবে। তুমি গিয়ে ওর বাবাকে বলো, আজ রাতেই আমি টাকাটা নিয়ে যাবো। কাজেই মেয়েটা যেন তৈরি হয়ে থাকে। মনে হয় আগামী কাল খুব ভোরেই আমরা জাহাজ নিয়ে পাড়ি দেবার জন্যে তৈরি হয়ে যাবো।'

মেটকে কেন ওই অদ্ভুত নামে ডাকা হতো, আমি জানি না। আসলে লোকটার নাম হুইলার। পদবিটা যদিও ইংরেজদের, কিন্তু তার শরীরে এক ফোঁটাও শ্বেতাঙ্গ-রক্ত ছিলো না। লোকটা লম্বা, সুগঠিত চেহারা—একটু মোটাসোটাই বলা যেতে পারে—কিন্তু গায়ের রঙ হাওয়াই দ্বীপের সাধারণ অধিবাসীদের তুলনায় বেশ কালো। বয়সে তখন সে আর যুবক নয়, মাথার ঘন কোঁকড়া চুলগুলো ধূসর হয়ে গেছে। ওপরের পাটির সামনের দাঁতগুলো সোনা দিয়ে বাঁধানো। ওগুলোর জন্যে তার দারুণ অহঙ্কার। চোখ দুটো প্রচণ্ড ট্যারা, ফলে তার মুখটা গোমরা বলে মনে হয়। ক্যাপটেন রঙ্গরসিকতা করতে ভালোবাসতো এবং মেটের এই শারীরিক ত্রুটিটা নিয়েও সে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে ইতস্তত করতো না, কারণ সে বুঝতে পেরেছিলো লোকটা এ ব্যাপারে মর্মান্তিকভাবে অনুভবনশীল। লোকটা এ দেশের আর পাঁচটা মানুষের মতো নয়, সর্বদা সে প্রায় মৌনী হয়েই থাকতো। ওদিকে ক্যাপটেন আমুদে মানুষ, লোকজনের সঙ্গে গালগল্প করতে ভালোবাসে। সে এমন লোকের সঙ্গে সমুদ্রে ভাসতে চাইতো যার সঙ্গে মন খুলে দুটো কথা বলা যায়। যে লোকটা আদপেই মুখ খোলে না তার সঙ্গে দিনের পর দিন বাস করতে হলে একজন মিশনারিও মদ ধরতে বাধ্য হবে। ব্যানানাকে সে নিজের পথে টেনে আনার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, তাকে নিয়ে অকরুণ ঠাট্টা-তামাশা করেছে এবং পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, মাতাল বা প্রকৃতিস্থ কোনো অবস্থাতেই লোকটা কোনো শ্বেতাঙ্গের সঙ্গী হবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। কিন্তু নাবিক হিসেবে লোকটা ছিলো একেবারে আদর্শ এবং ক্যাপটেনও তার কাজের কদর করতো। প্রায়ই ক্যাপটেন মদটদ টেনে এমন অবস্থায় জাহাজে ফিরতো, যখন বাংকে গিয়ে শুয়ে পড়া ছাড়া অন্য কিছু করার মতো ক্ষমতা তার থাকতো না। ক্যাপটেন জানতো, সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মদের খোয়ারিটুকু কাটিয়ে দিতে পারে—কারণ ব্যানানা জাহাজে আছে এবং ব্যানানার ওপরে আস্থা রাখা যায়। কিন্তু লোকটা একটা অসামাজিক শয়তান। কাজেই জাহাজে কথা বলার মতো একটা লোকের খুব দরকার। ওই মেয়েটি হলে তো খুবই ভালো হয়। তাছাড়া তখন জাহাজ কোনো বন্দরে ভিড়লে ক্যাপটেনও আর মদ টেনে খুব একটা মাতাল হবে না—কারণ তার তখন মনে থাকবে,

জাহাজে একটি মেয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে।

ক্যাপটেন তার বন্ধু, জাহাজে মালপত্র সরবরাহকারী সেই মনিহারি দোকানের মালিকটির সঙ্গে দেখা করে, তার সঙ্গে বসে এক পাত্র জিন পান করতে করতে কিছু টাকা ধার চাইলো। জাহাজের ক্যাপটেন জাহাজে মাল সরবরাহকারী ঠিকাদারের দু-একটা উপকার সর্বদাই করে দিতে পারে। তাই প্রায় সিকি ঘণ্টা নিচু গলায় আলাপ-আলোচনা করার পর ক্যাপটেন এক গাদা টাকা পাতলুনের পেছনের পকেটে গুঁজে নিলো এবং সেদিন রাতে সে যখন জাহাজে ফিরে গেলো তখন ওই মেয়েটিও তার সঙ্গে জাহাজে গিয়ে উঠলো। ক্যাপটেন বাটলার যা করবে বলে ভেবেছিলো, যা সে আশা করেছিলো—বাস্তবে ঠিক তাই হলো। মদ সে ছাড়েনি, তবে অতিরিক্ত মদ খাওয়া বন্ধ করে দিলো। দু-তিন সপ্তাহ শহর ছেড়ে বাইরে থাকার সময় এক-আধ সন্ধ্যা ছেলেদের সঙ্গে হুল্লোড় করতে তার ভালোই লাগতো, কিন্তু ভালো লাগতো মেয়েটির কাছে ফিরে আসতেও। সে ভাবতো, কেমন কোমল ভঙ্গিমায় ঘুমোচ্ছে মেয়েটা—কেবিনে ঢুকে ওর দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালে কেমন অলস আশ্লেষে ও চোখ খুলে তাকাবে, নিজের হাত দুটো বাড়িয়ে দেবে তার দিকে। সুন্দর দুটি নিটোল হাত।····ক্যাপটেন লক্ষ্য করলো, সে টাকা জমাতে শুরু করেছে এবং মনটা উদার বলে মেয়েটির দীঘল চুলের জন্যে সে কয়েকটা রুপো-বাঁধানো চুলের বুরুশ, একটা সোনার হার আর ওর আঙুলের জন্যে একটা চুনি বসানো আংটি গড়িয়ে দিলো! সত্যি, জীবন কতো সুন্দর!

একটা বছর এই ভাবে কেটে গেলো। পুরো একটা বছর। তবু মেয়েটির সম্পর্কে তার মনে কোনো ক্লান্তি এলো না। নিজের আবেগ অনুভূতিগুলোকে বিশ্লেষণ করার মতো মানুষ সে নয়। কিন্তু ব্যাপারটা এতোই বিস্ময়কর যে এটা সে খতিয়ে দেখতে বাধ্য হলো। ক্যাপটেনের মনে হলো, মেয়েটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো আশ্চর্য আকর্ষণ রয়ে গেছে। ওর সঙ্গে এখন সে আগের চাইতেও অনেক বেশি করে জড়িয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এমন কথাও তার মনে হতে লাগলো যে মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেললে বোধহয় মন্দ হতো না।

তারপর একদিন নৈশভোজ বা তার পরবর্তী চায়ের সময় মেট খাওয়ার টেবিলে এলো না। প্রথমবার তার অনুপস্থিতি নিয়ে ক্যাপটেন বাটলার বিন্দুমাত্রও মাথা ঘামায়নি। কিন্তু দ্বিতীয় বারে সে চীনে পাচকটিকে জিগেস করলো, 'মেট কোথায়? সে চা খেতে এলো না তো?'

'উনি চা খেতে চাইছেন না।'

'কেন, অসুস্থ না কি?'

'না, তেমন কিছু নয়।'

পরের দিন ব্যানানা এলো বটে, কিন্তু তার মুখটা আগের চাইতেও বিষণ্ণ। খাওয়াদাওয়ার পর ক্যাপটেন মেয়েটিকে জিগেস করলো, মেটের কি

হয়েছে। মেয়েটি মৃদু হাসলো। তারপর নিজের সুন্দর কাঁধ দুটিতে মৃদু ঝাঁকুনি তুলে বললো, ওকে মেটের মনে ধরেছে—কিন্তু ও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করায় বাবুর রাগ হয়েছে। ক্যাপটেন সুরসিক মানুষ এবং তার স্বভাবটাও হিংসুটে নয়। ব্যানানা যে কারুর প্রেমে পড়তে পারে, এটাই যেন তার কাছে একটা দারুণ মজাদার ব্যাপার বলে মনে হলো। চায়ের সময় সে মনের আনন্দে ব্যানানাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে শুরু করলো। এমন ভান করতে লাগলো যেন সে বাতাসের সঙ্গে কথা বলছে—যাতে মেট সুনিশ্চিত-ভাবে বুঝতে না পারে যে ব্যাপারটা সে সবই জেনে ফেলেছে। কিন্তু তার আঘাতগুলো হচ্ছিলো একেবারে মোক্ষম। ক্যাপটেনের মতো মেয়েটি কিন্তু মেটকে ঠিক ততোটা হাস্যকর বলে মনে করছিলো না এবং খানিকক্ষণ বাদে ও ক্যাপটেনকে ওই বিষয়ে আর কিছু বলতে নিষেধ করলো। বললো, ক্যাপটেন এখানকার মানুষদের চেনে না। রাগের মাথায় এরা যে কোনো কাজ করে ফেলতে পারে। আসলে মেয়েটি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ব্যাপারটা ক্যাপটেনের কাছে এতোই অসম্ভব বলে মনে হলো যে মেয়েটির সমস্ত আশঙ্কা সে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললো, 'ও ফের তোমাকে বিরক্ত করতে এলে বলে দিও, তুমি সব কথা আমাকে বলে দেবে। তাতেই ও কুপোকাৎ হয়ে যাবে।'

'আমার মনে হয়, তুমি বরঞ্চ ওকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দাও।'

'খেপেছো! তবে ও যদি তোমাকে জ্বালাতন করা বন্ধ না করে, তাহলে আমি ওকে অ্যায়সা মার মারবো যে ও জীবনে কোনোদিনও তেমন মার খায়নি।'

হয়তো মেয়েটির মধ্যে খানিকটা বিচক্ষণতা ছিলো, যা নারী জাতির মধ্যে খুব একটা থাকে না। ও জানতো, পুরুষমানুষ কোনো ব্যাপারে মনটাকে একবার স্থির করে ফেললে তাকে ওই ব্যাপারে আর কোনো যুক্তি দেখানো অর্থহীন—কারণ তাতে পুরুষটির একগুঁয়েমি আরও বেড়ে যায়। তাই ও চুপ করেই রইলো। কিন্তু তখন থেকেই নিস্তব্ধ সমুদ্রপথে এঁকেবেঁকে চলা ওই হতশ্রী স্কুনারটিতে রহস্যে ভরা চাপা এক উত্তেজনাময় নাটকের অভিনয় চলতে লাগলো, অথচ মোটাসোটা ক্যাপটেন সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়েই রইলো। মেয়েটির প্রতিরোধ ব্যানানার মনে এমন আগুন জ্বেলে দিলো যে সে আর মানুষ রইলো না, কামনায় সে একেবারে অন্ধ হয়ে উঠলো। কোমলতা দিয়ে নয়, ব্যানানা মেয়েটিকে ভালোবাসতো এক বন্য হিংস্রতা দিয়ে। আস্তে আস্তে লোকটার প্রতি মেয়েটির বিতৃষ্ণা এবারে ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়ে গেলো। লোকটা ওকে পীড়াপীড়ি করলে, ও ক্রুদ্ধ-তিক্ত পরিহাসে তার জবাব দেয়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বটা চলতে থাকে নিঃশব্দে। কিছুদিন বাদে ক্যাপটেন যখন মেয়েটিকে জিগেস করে যে ব্যানানা ওকে জ্বালাতন করছে কিনা, তখন মেয়েটি তাকে মিথ্যে কথা বলে জবাব দেয়।

কিন্তু একদিন রাত্রিবেলা—ওরা তখন হনলুলুতে—ক্যাপটেন একেবারে সঠিক সময়টিতে জাহাজে ফিরে আসে। পরদিন ভোরবেলা জাহাজ ছাড়বে ঃ ক্যাপটেন নৌকোয় চেপে জাহাজে ফেরার পথে জাহাজে চেঁচামেচির আওয়াজ শুনে অবাক হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে সে দ্যাখে, ব্যানানা তার কেবিনের দরজাটা খোলার চেষ্টা করছে। দেশী মদ খেতে ব্যানানা ডাঙায় নেমেছিলো, অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় জাহাজে ফিরে এসে সে তখন চিৎকার করে মেয়েটিকে ডাকছে আর দিব্যি কেটে বলছে যে তাকে ভেতরে ঢুকতে না দিলে মেয়েটিকে সে খুন করে ফেলবে।

'তোমার মতলবটা কি, শুনি ?' বাটলার চিৎকার করে জানতে চায়।

মেট দরজার হাতলটা ছেড়ে দেয়। তারপর ক্যাপটেনের দিকে একটা তীব্র ঘৃণার দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ায়।

'দাঁড়াও। দরজায় তুমি কি করছিলে ?'

মেট তবুও কোনো জবাব দেয় না, শুধু রুদ্ধ আক্রোশে ক্যাপটেনের দিকে তাকায়।

'হতচ্ছাড়া নোংরা ট্যারা নিগ্রো, তোকে আমি এমন শিক্ষা দেবো যে জীবনে আর কোনোদিনও আমার সঙ্গে কোনো বদমাইশি করতে আসবি না।'

মেটের চাইতে ক্যাপটেন লম্বায় প্রায় ফুট খানেক বেঁটে। চেহারায় মেটের কাছে সে দাঁড়াতেই পারে না। কিন্তু দেশী নাবিকগুলোর সঙ্গে কাজ করে সে অভ্যস্ত। তাছাড়া ধাতুর দস্তানাটা তার সঙ্গেই ছিলো। হয়তো এটা ঠিক ভদ্রজনোচিত অস্ত্র নয়, কিন্তু ক্যাপটেন বাটলার নিজেও ভদ্রলোক নয় আর ভদ্রলোক নিয়ে কাজ-কারবার করার অভ্যেসও তার ছিলো না। ব্যানানা কিছু বোঝার আগেই তার ডান হাতটা চকিতে ছুটে এলো এবং ইস্পাতের মোড়ক পরা আঙুলগুলো সপাটে ব্যানানার চোয়ালে গিয়ে পড়লো।

'এবারে শিক্ষা হবে,' ক্যাপটেন বললো।

ব্যানানা একটুও নড়ছিলো না। মেয়েটি দরজা খুলে বেরিয়ে এসে জিগেস করলো, 'মরে গেছে নাকি ?'

'না, মরেনি।'

দুটো খালাসিকে ডেকে আনলো ক্যাপটেন। তারপর মেটকে তুলে নিয়ে তার নিজের বাংকে রেখে আসতে বললো। খুশি মনে হাতে হাত ঘষলো মানুষটা, চশমার আড়ালে ঝিকমিকিয়ে উঠলো তার গোল গোল চোখ দুটো। ওদিকে মেয়েটি কিন্তু আশ্চর্যরকম নিশ্চুপ হয়ে রইলো। যেন কোনো অদৃশ্য বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে দুহাতে ক্যাপটেনকে জড়িয়ে ধরলো ও।

দু-তিন দিন বাদে ব্যানানা ফের নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ালো। কেবিনের বাইরে যখন এলো তখনও তার মুখটা ফুলে রয়েছে, তাতে কাটাকুটির দাগ। গায়ের রঙ কালো হলেও তাতে কালশিটের দাগ স্পষ্ট বোঝা যায়। ডেক দিয়ে লোকটাকে চোরের মতো চুপি চুপি হাঁটতে দেখে বাটলার তাকে কাছে ডাকলো।

মুখে কিছু না বলে মেট তার কাছে এগিয়ে গেলো।

'শোনো ব্যানানা, তুমি যা করেছো সেজন্যে আমি তোমাকে ছাঁটাই করছি না।' দিনটা গরম বলে বাটলারের চশমাটা পিছল নাক দিয়ে নিচের দিকে নেমে এসেছিলো। সেটা যথাস্থানে তুলে দিয়ে সে বললো, 'তবে এবারে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে আমি যখন মারি তখন বেশ জোরেই মারি। কথাটা ভুলে যেও না। তোমার আর কোনো রকম বাঁদরামো আমাকে যেন দেখতে না হয়।'

মেটের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বাটলার তার স্বভাবসিদ্ধ মনোহর হাসিটি হাসলো। মেটও নিজের হাতে তার হাতটা তুলে নিলো, ফুলে থাকা ঠোঁটটা বেঁকেচুরে একটা শয়তানি হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। তারপরেই পুরো ঘটনাটা ক্যাপটেনের মন থেকে এমন নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেলো যে সেদিন রাতে তিনজনে বসে খাওয়াদাওয়া করার সময় সে ফের মেটের চেহারা নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা শুরু করে দিলো। ফোলা মুখ নিয়ে বেচারা মেটকে তখন বেশ কষ্ট করেই খেতে হচ্ছিলো, ব্যথা-বেদনায় বিকৃত হয়ে ওঠা মুখটা দেখাচ্ছিলোও ভারি বদখত।

সেদিন সন্ধ্যায় ওপরের ডেকে বসে তামাকের নলে ধূমপান করার সময় ক্যাপটেনের শরীরের ভেতর দিয়ে কেমন যেন শিহরণ বয়ে গেলো।

'রাতটা তো বেশ গরম। তবু আমি এমন কাঁপছি কেন, কে জানে!' ক্যাপটেন নিজের মনেই বিড়বিড় করতে থাকে, 'একটু জ্বরটর হয়েছে হয়তো। সারাটা দিনই শরীরে কেমন যেন একটা অদ্ভুত অস্বস্তি হচ্ছে।'

রাতে শোবার সময় খানিকটা কুইনাইন খেয়ে নিলো ক্যাপটেন। পরের দিন সকালে শরীরটা যেন একটু ভালো ঠেকছে বলে মনে হলো তার। শুধু একটু যেন ক্লান্ত, যেন যথেচ্ছ লাম্পট্যের পর ক্রমশ সে সামলে উঠছে।

'মনে হচ্ছে লিভারটা খারাপ হয়েছে,' বলে ফের একটা বড়ি খেয়ে নিলো সে। সেদিন তার আর খিদেটিদে খুব একটা হলো না এবং সন্ধ্যের দিকে শরীরটা খুবই খারাপ লাগতে শুরু করলো। এরপর যে ওষুধটা তার জানা ছিলো—দু-তিন পাত্র গরম হুইস্কি টানা—তা-ও সে চেষ্টা করে দেখলো। কিন্তু তাতেও খুব একটা সুবিধে হলো না। পরের দিন সকালে আরশিতে নিজেকে দেখে তার মনে হলো, চেহারাটা ঠিক স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না।

'হনলুলুতে ফেরার মধ্যে যদি সুস্থ না হই, তাহলে ডাক্তার ডেনবিকে একবার ডেকে পাঠাবো। উনি নিশ্চয়ই আমাকে সারিয়ে দেবেন।'

ক্যাপটেন বাটলার আর খেতে পারে না। সর্বাঙ্গে দারুণ অবসাদ। ঘুম যথেষ্ট ভালোই হয়, কিন্তু ঘুম থেকে উঠে শরীরটা আদৌ ঝরঝরে লাগে না। বরং এক অদ্ভুত ক্লান্তি অনুভব করে সে। এমনিতে মানুষটা টগবগে, বিছানায় শুয়ে থাকার কথা সে চিন্তাও করতে পারে না, অথচ এখন তাকে সচেষ্ট প্রয়াসে জোর করে বাংক থেকে উঠতে হয়। কয়েক দিন পরে সে

দেখলো, এই অবসন্নতাকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব, তাই সে শুয়ে থাকবে বলেই স্থির করলো।

'ব্যানানাই জাহাজের দেখাশুনো করতে পারবে। আগেও তো করেছে।'

ওদিকে মেয়েটি বিভ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ওর চিন্তা দেখে বাটলার ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে।

'ব্যানানাকে তখন তাড়িয়ে দিলেই ভালো করতে,' মেয়েটি বলে। 'আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, ও-ই তোমার এই দুর্গতির মূলে রয়েছে।'

'না তাড়িয়ে ভালোই করেছি। তাড়ালে জাহাজটা কে চালাতো শুনি? কে ভালো নাবিক, তা আমি লোক দেখেই বুঝতে পারি। তুমি কি ভাবছো ও আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে?' বাটলারের চোখ দুটো ঝিলমিলিয়ে ওঠে। নীল চোখ দুটো এখন খানিকটা ফ্যাকাশে, সাদা অংশটা পুরো হলদে।

মেয়েটি কোনো জবাব দেয় না। কিন্তু চীনে পাচকটির সঙ্গে দু-এক বার কথাবার্তা বলে ও ক্যাপটেনের খাবারদাবারের দিকে কড়া নজর রাখতে শুরু করে। মানুষটার খাওয়া এখন ভীষণ কমে গেছে। বহু সাধ্যসাধনার পর মেয়েটি তাকে দিনে দু-তিন বার শুধু এক পেয়ালা করে সুরুয়া খাওয়াতে পারে। পরিষ্কার বোঝা যায়, মানুষটা ভয়ানক অসুস্থ। দেহের ওজন দ্রুত কমে যাচ্ছে, গোলগাল মুখখানা শুকনো ও পাণ্ডুর হয়ে গেছে। কোনো রকম ব্যথা-বেদনা নেই, শুধু শরীরটা প্রতিদিন আরও বেশি মাত্রায় দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে উঠছে। ক্রমাগত ক্ষয়ে যাচ্ছে মানুষটা।

ওই দফায় পথ-পরিক্রমা শেষ করে ফিরে আসতে জাহাজটার প্রায় সপ্তাহ চারেক সময় লাগলো। ওরা ফের যখন হনলুলুতে এসে পৌঁছলো তখন ক্যাপটেনও নিজের সম্পর্কে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। পনেরো দিনের বেশি হয়ে গেছে সে বিছানা থেকে ওঠেনি। শরীর সত্যিই এতো দুর্বল যে বিছানা ছেড়ে উঠে ডাক্তারের কাছে যাবার মতো শক্তিটুকুও তার নেই। ডাক্তারকে সে জাহাজেই ডেকে পাঠালো। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করলেন, কিন্তু তার অসুস্থতার কোনো কারণই বুঝে উঠতে পারলেন না। দেহের তাপমাত্রাও স্বাভাবিক।

'দেখুন—আমি খোলাখুলিই বলছি,' ডাক্তার বললেন, 'আপনার কি হয়েছে তা আমি বুঝতে পারছি না এবং স্রেফ এভাবে দেখে কিছু বোঝাও যাবে না। আপনি বরং হাসপাতালে আসুন, সেখানে আমরা আপনার দিকে বিশেষ নজর রাখতে পারবো। এমনিতে আপনার শরীরে কোথাও কোনো ত্রুটি নেই এবং আমার ধারণা কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে থাকলেই আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

'আমি জাহাজ ছেড়ে কোথাও যাবো না,' ক্যাপটেন জবাব দিলো। সে আরও বললো যে চীনে মালিকরা ভারি অদ্ভুত। অসুস্থতার জন্যে সে জাহাজ

ছেড়ে গেলে জাহাজের মালিক তাকে ছাঁটাই করে দিতে পারে, কিন্তু চাকরিটা খোয়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। যতোক্ষণ সে জাহাজে আছে ততোক্ষণ চুক্তিপত্র অনুযায়ী মালিক তাকে চাকরিতে রাখতে বাধ্য। তাছাড়া সে ওই মেয়েটিকে ছেড়ে যেতে পারবে না। ওর চাইতে ভালো পরিষেবিকা আর হয় না। কেউ যদি সেবা শুশ্রূষায় তাকে সুস্থ করে তুলতে পারে, তো ও-ই পারবে। প্রত্যেককে একবারই মরতে হবে, তাই এখন সে একটু শান্তিতে থাকতে চায়। ডাক্তারের কোনো অনুরোধ-উপরোধই সে কানে তুললো না।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তার হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'বেশ, আমি আপনাকে একটা ব্যবস্থাপত্র লিখে দিচ্ছি। দেখুন, এতে যদি কোনো উপকার হয়। আর কয়েকটা দিন আপনি বরঞ্চ বিছানাতেই শুয়ে থাকুন।'

'সেদিক দিয়ে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, ডাক্তারবাবু।' বাটলার বললো, 'আমি প্রচণ্ড দুর্বল। বিছানা থেকে ওঠার মতো ক্ষমতা আমার নেই।'

ডাক্তারের মতো বাটলারেরও ওই ব্যবস্থাপত্রে তেমন আস্থা ছিলো না। ঘরে একা হতেই সে ওই ব্যবস্থাপত্রটা জ্বালিয়ে একটা চুরুট ধরিয়ে নিলো। চুরুটের স্বাদটা তার যে খুব একটা ভালো লাগছিলো তা নয়। কিন্তু আসলে সে নিজেকে বোঝাতে চাইছিলো যে সে তেমন সাংঘাতিক অসুস্থ নয়। ওই দিনই সন্ধ্যাবেলা বাটলারের অসুস্থতার খবর পেয়ে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব তার সঙ্গে দেখা করতে এলো। ওরাও বাটলারের মতো কয়েকটা রদ্দিমার্কা জাহাজের ক্যাপটেন। এক বোতল হুইস্কি আর এক বাক্স ফিলিপাইন চুরুট নিয়ে ওরা বাটলারের ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে লাগলো। একজনের মনে পড়ে গেলো, তারই এক মেটের ঠিক এই ধরনেরই একটা অদ্ভুত অসুখ হয়েছিলো এবং তাকে অ্যামেরিকার কোনো ডাক্তারই সারিয়ে তুলতে পারেনি। তারপর পত্রিকায় একটা পেটেন্ট ওষুধের বিজ্ঞাপন দেখে তার মনে হয়, এই ওষুধটা দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি। এবং ওই ওষুধ মাত্র দু বোতল খাওয়ার পরেই মানুষটা ঠিক আগের মতো চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

অসুস্থতার ফলে ক্যাপটেন বাটলারের মনটা অদ্ভুত স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিলো। এবং বন্ধুবান্ধবদের আলোচনার ভেতর থেকে সে যেন ওদের মনের কথাটা বুঝতে পারছিলো। আসলে ওরা ভাবছে, সে মৃত্যুপথযাত্রী। ওরা চলে যেতেই সে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। মেয়েটি তার এই দুর্বলতা টের পেয়ে গেলো। এই সুযোগ। এতোদিন ও বারবার ক্যাপটেনকে একজন দেশী ওঝা দেখাতে অনুরোধ করেছে এবং ক্যাপটেন প্রতিবারই প্রবল প্রতাপে ওর সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। এবারেও মেয়েটি কাতর অনুরোধ জানালো এবং ক্যাপটেন হয়রাণ হয়ে তাতে রাজি হয়ে গেলো। কি আশ্চর্য কাণ্ড, একজন অ্যামেরিকান ডাক্তারও বুঝতে পারলো না তার কি হয়েছে! কিন্তু বাটলার যে ভয় পেয়েছে তা সে মেয়েটিকে বুঝতে দিতে চাইছিলো না। আসলে ওকে একটু স্বস্তি

দেবার জন্যেই সে একটা দেশী নিগারকে দেখাতে রাজি হয়েছে। মেয়েটিকে সে বললো, ওর যা ইচ্ছে ও তাই করতে পারে।

পরের দিন রাত্রিবেলা ওঝা এলো। ক্যাপটেন তখন আধোজাগা অবস্থায় একা একা বিছানায় শুয়েছিলো। একটা তেলের বাতিতে কোবনে অস্পষ্ট মিটমিটে আলো। আস্তে আস্তে দরজা খুলে মেয়েটি পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকে দরজাটা ধরে রইলো এবং ওর পেছন পেছন আরও একজন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে পড়লো। ওদের এই রহস্যজনক গতিবিধিতে ক্যাপটেন মৃদু হাসলো, কিন্তু সে এখন এতোই দুর্বল যে শুধু দু চোখের চকিত দীপ্তি ছাড়া তার হাসির আর কোনো প্রকাশই ঘটলো না। ওঝা ছোটোখাটো চেহারার এক বৃদ্ধ, ভীষণ রোগা, গায়ের চামড়া প্রচণ্ড কোঁচকানো, মাথায় পুরো টাক আর মুখটা বাঁদরের মতো। প্রাচীন গাছের মতো নুয়ে পড়া গ্রন্থিল চেহারা। দেখে একটা মানুষ বলেই মনে হয় না। কিন্তু চোখ দুটো সাংঘাতিক উজ্জ্বল। ঘরের আধো-অন্ধকারে চোখ দুটো থেকে যেন একটা লালচে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছিলো। পরনে একটা নোংরা ছেঁড়া পাতলুন, ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ অনাবৃত। উবু হয়ে বসে সে দশ মিনিট ক্যাপটেনের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর ক্যাপটেনের হাতের তেলো আর পায়ের তলা টিপেটুপে পরীক্ষা করলো। মেয়েটি আতঙ্কিত চোখে মানুষটাকে লক্ষ্য করছিলো। কেউই কোনো কথা বলছিলো না। ওঝা এবারে এমন একটা জিনিস চাইলো যা ক্যাপটেন ব্যবহার করেছে। মেয়েটা তাকে সেই পুরনো ফেল্টের টুপিটা দিলো যেটা ক্যাপটেন সর্বক্ষণ পরে থাকতো। টুপিটা নিয়ে ওঝা ফের মেঝেতে বসে পড়লো, তারপর শক্ত করে সেটাকে দুহাতে চেপে ধরে সামনে-পেছনে আস্তে আস্তে দুলে দুলে বিড়বিড় করে কি যেন অদ্ভুত অর্থহীন মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলো।

অবশেষে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওঝা টুপিটাকে হাত থেকে ফেলে দিলো। তারপর পাতলুনের পকেট থেকে একটা পুরনো তামাকের নল বের করে ধরালো। এবারে মেয়েটি উঠে গিয়ে তার পাশে বসতেই মানুষটা ফিসফাসিয়ে ওকে কি যেন বললো। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চমকে উঠলো মেয়েটি। কয়েক মিনিট চাপা গলায় দ্রুত কি যেন আলোচনা করে ওরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালো। মেয়েটি টাকা-পয়সা মিটিয়ে দরজা খুলে দিলো। লোকটা যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো তেমনি নিঃশব্দেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। মেয়েটি ক্যাপটেনের কাছে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালো। তারপর তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'কোনো শত্রু তোমার মৃত্যু কামনা করছে।'

'বোকার মতো কথা বলো না, মিণ্টুনি!' ক্যাপটেন অধৈর্য হয়ে বললো।

'কিন্তু কথাটা সত্যি! একেবারে নির্ভেজাল সত্যি। এই জন্যেই অ্যামেরিকান ডাক্তার কিছু করতে পারেনি। কিন্তু আমাদের দেশী লোকেরা পারে। আমি নিজে দেখেছি। তুমি সাদা চামড়ার মানুষ—তাই আমি ভেবে ছিলাম তুমি নিরাপদ, তোমার কিছু হবে না।'

'আমার কোনো শত্রু নেই।'

'ব্যানানা।'

'সে আমার মৃত্যু কামনা করবে কেন?'

'সে কোনো সুযোগ পাবার আগেই তোমার উচিত ছিলো তাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া।'

'ব্যানানার তুকতাক ছাড়া অন্য কিছু না থাকলে আমি আর কয়েকটা দিনের মধ্যেই পুরো সুস্থ হয়ে উঠবো।'

মেয়েটি খানিকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে ক্যাপটেনের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, 'তুমি কি বুঝতে পারছো না, তুমি মরতে চলেছো?'

অন্য জাহাজ থেকে দেখা করতে আসা দুই ক্যাপটেনেরও এই একই ধারণা, কিন্তু তারা মুখে কিছু বলেনি। বাটলারের পাণ্ডুর মুখ দিয়ে যেন একটা শিহরণ ছুটে গেলো।

'ডাক্তার বলেছেন, আমার তেমন কিছু হয়নি। শুধু কয়েকটা দিন একটু চুপচাপ শুয়ে থাকলেই সব সেরে যাবে।'

পাছে বাতাস শুনে ফেলে, যেন সেই ভয়েই মেয়েটি বাটলারের কানের একেবারে কাছাকাছি ঠোঁট নিয়ে গিয়ে বললো, 'তুমি মরে যাচ্ছো, মরে যাচ্ছো, মরে যাচ্ছো। আকাশ থেকে এই পুরনো চাঁদটা মুছে গেলেই তুমি মরে যাবে।'

'এটা একটা জানবার মতো কথাই বটে!'

'অমাবস্যায় চাঁদটা হারিয়ে গেলেই তুমি মরবে, যদি না ব্যানানা তার আগে মরে।'

ক্যাপটেন ভীরু নয়। ইতিমধ্যেই সে মেয়েটির অতর্কিত এবং জোরালো কথাগুলোর আঘাত সামলে উঠেছিলো। ফের তার চোখ দুটিতে স্মিত হাসির ঝিলিক ফুটে উঠলো, 'একটা ঝুঁকি নিয়ে দেখাই যাক না!'

'অমাবস্যা হতে আর বারো দিন বাকি।'

'দ্যাখো খুকি, এসব স্রেফ বুজরুকি। এর একটি কথাও আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু তুমি ব্যানানাকে কোনো রকম তুক করার চেষ্টা কোরো না—সেটা আমি চাই না। ও দেখতে সুন্দর নয়, কিন্তু মেট হিসেবে ও একেবারে প্রথম শ্রেণীর।'

বাটলার আরও অনেক কথাই বলতো, কিন্তু এটুকুতেই সে ক্লান্ত হয়ে উঠলো। আচমকা সে ভীষণ দুর্বল ও আচ্ছন্ন বোধ করলো। প্রতিদিন এই সময়েই তার শরীরটা প্রচণ্ড খারাপ লাগে। চোখ বুজলো মানুষটা। মেয়েটি এক মিনিট তাকে লক্ষ্য করে নিঃশব্দে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো। আকাশের প্রায় পূর্ণ চাঁদটা অন্ধকার সমুদ্রের বুকে একটা রুপোলি রাস্তা এঁকে রেখেছে। নির্মেঘ আকাশে ঝলমল করছে চাঁদটা। মেয়েটি আতঙ্কিত চোখে চাঁদের দিকে তাকালো—কারণ ও জানে, ওই চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ওর ভালোবাসার মানুষটাও মরে যাবে। মানুষটার জীবন এখন ওর হাতে। ও…একমাত্র ও-ই তাকে

বাঁচাতে পারে। কিন্তু শত্রু খুব চালাক, তাই ওকে চালাক হতে হবে। মুখ না ঘুরিয়েও ও অনুভব করছিলো, কেউ ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আচমকা এক সুনিবিড় আতঙ্ক সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেললো মেয়েটিকে। ও বুঝতে পারলো, অন্ধকার থেকে মেটের জ্বলন্ত চোখ দুটো তার দিকেই স্থির হয়ে আছে। লোকটা কি করতে পারে তা ও জানে না। কিন্তু শয়তানটা যদি ওর মনের কথা বুঝে ফেলে, তাহলে ওর পরাজয় একেবারে সুনিশ্চিত। আপ্রাণ প্রয়াসে মেয়েটা নিজের মন থেকে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিলো। একমাত্র ওই শয়তানটার মৃত্যুই ওর প্রেমিকের প্রাণ বাঁচাতে পারে এবং ও-ই পারে ওই শয়তানটার মৃত্যু ঘটাতে। ও জানে, কোলো কুমড়োর খোলে জল রেখে সেই জলে শয়তানটা যদি নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকায় এবং তখন জল নেড়ে যদি সেই প্রতিবিম্বটাকে ভেঙে দেওয়া যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো শয়তানটা মরে যাবে—কারণ ওই প্রতিবিম্বটাই তার আত্মা। কিন্তু এই বিপদের কথা তার চাইতে ভালোভাবে আর কেউ জানে না। কাজেই এমন ছলনার সাহায্যে এ কাজটা করতে হবে যাতে তার মনে এতোটুকুও সন্দেহ না জাগে। কোনো শত্রু যে তাকে ধ্বংস করে ফেলার সুযোগ খুঁজছে তা একবারের জন্যেও সে যেন ভাবতে না পারে। মেয়েটা জানে, এজন্যে ওকে কি করতে হবে। কিন্তু সময় বড়ো কম—বড্ডো কম। একটু বাদেই ও বুঝতে পারলো, মেট ওখান থেকে চলে গেছে। একটু নিশ্চিন্ত মনে নিঃশ্বাস ফেললো ও।

দুদিন বাদে জাজাজ ছাড়লো। আর দশ দিন বাদে অমাবস্যা। ক্যাপটেনের দিকে এখন আর তাকানো যায় না। শরীরে হাড়-চামড়া ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। অন্যের সাহায্য ছাড়া সে আর নড়াচড়া করতে পারে না। কথাবার্তা বলার শক্তিও প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু তবু মেয়েটা কিছু করতে ভরসা পাচ্ছে না। ও জানে, ওকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। কারণ মেট ধূর্ত, প্রচণ্ড ধূর্ত। ছোট্ট একটা দ্বীপে গিয়ে ওরা জাহাজ থেকে মাল খালাস করলো। এখন আর মাত্র সাত দিন বাকি। এবারে কাজ শুরু করার সময় এসেছে। ক্যাপটেনের কেবিন থেকে নিজের কিছু কিছু জিনিসপত্র নিয়ে মেয়েটা একটা পুঁটলি বাঁধলো। তারপর সেটাকে ডেক-কেবিনে নিয়ে রাখলো, যেখানে ও আর ব্যানানা খাওয়াদাওয়া করে। রাতের খাবার খেতে সেখানে গিয়ে ও দ্যাখে, মেট ওর পুঁটলিটা লক্ষ্য করছে। কেউই কিছু বলে না। কিন্তু মেয়েটা বুঝতে পারে যে ব্যানানা সন্দেহ করছে, ও জাহাজ ছেড়ে চলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। ওর দিকে বিদ্রুপের ভঙ্গিতে তাকায় মানুষটা। আস্তে আস্তে, যেন ক্যাপটেন ওর মতলব যাতে বুঝতে না পারে এমনি ভাবে, নিজের সমস্ত জিনিসপত্র এবং সেই সঙ্গে ক্যাপটেনেরও কয়েকটা পোশাক কেবিন থেকে নিয়ে এসে ও গাটরি বেঁধে ফেলে। শেষ অব্দি ব্যানানা আর চুপ করে থাকতে পারে না। ক্যাপটেনের একটা সাদা পোশাকের দিকে আঙুল দেখিয়ে জিগেস করে,

'ওটা নিয়ে তুমি কি করবে ?'

দু কাঁধে ঝাঁকুনি তোলে মেয়েটি, 'আমি আমার দ্বীপে ফিরে যাচ্ছি।'

ব্যানানা হাসতেই তার কুৎসিত মুখটা আরও বিকৃত হয়ে ওঠে। ক্যাপটেন মরতে চলেছে আর মেয়েটা কিনা এই সুযোগে যা পায় তাই হাতিয়ে নেবার তাল করছে।

'আমি যদি বলি ওগুলো তুমি নিয়ে যেতে পারবে না, ওগুলো ক্যাপটেনের—তাহলে কি করবে ?'

'ওগুলো তোমার তো কোনো কাজে লাগবে না,' জবাব দেয় ও।

দেয়ালে একটা কুমড়োর খোল ঝুলছিলো। ঘরে ঢুকে আমি ওই খোলটাই দেখেছিলাম, ওটাকে নিয়েই আমাদের কথাবার্তা হয়েছিলো। মেয়েটি তখন ওটাও দেয়াল থেকে নামিয়ে নেয়। খোলটা ধুলোয় ভরে ছিলো। জলের বোতল থেকে ওটাতে জল ঢেলে মেয়েটি আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে ওটাকে সাফ করতে থাকে।

'ওটা নিয়ে কি করবে ?'

'পঞ্চাশ ডলারে বিক্কিরি করবো।'

'ওটা নিতে হলে আমাকে দাম দিতে হবে।'

'কি দাম চাও ?'

'তুমি তো জানো, আমি কি চাই !'

মেয়েটা ওর ঠোঁটে এক ঝিলিক হাসি ফুটিয়ে তোলে। লোকটার দিকে চকিতে এক ঝলক তাকিয়েই দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নেয় ও। তীব্র কামনায় ব্যানানার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে আসে। ছোট্ট একটু ঝাঁকুনিতে কাঁধ দুটিকে সামান্য উঁচু করে তোলে মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে এক বন্য আগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে দুহাতে জাপটে ধরে মানুষটা। মেয়েটা হেসে ওঠে। তারপর নিজের নরম সুগোল বাহু দুটি দিয়ে মানুষটার গলা জড়িয়ে ধরে, মদির আশ্লেষে তার কাছে সমর্পণ করে নিজেকে।

ভোরবেলা গভীর ঘুম থেকে মানুষটাকে জাগিয়ে দেয় মেয়েটি। সূর্যের প্রথম কিরণ তখন তির্যক ভঙ্গিতে কেবিনে এসে পড়েছে। মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে মানুষটা বলে, ক্যাপটেন আর দু-এক দিনের বেশি বাঁচবে না। ওদিকে জাহাজের মালিকও অতো সহজে আর একজন শ্বেতাঙ্গ ক্যাপটেন যোগাড় করে উঠতে পারবে না। কাজেই কম টাকা নিতে রাজি হলে ব্যানানাই চাকরিটা পেয়ে যাবে। অতএব মেয়েটি ইচ্ছে করলে তার সঙ্গেই থাকতে পারে। প্রেমার্ত দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে সে। মেয়েটিও তার গায়ের সঙ্গে লেগে থাকে, এক বিদেশী ভঙ্গিতে তার ঠোঁটে চুমু দেয়—যেমন করে ক্যাপটেন ওকে চুমু খেতে শিখিয়েছিলো—প্রতিশ্রুতি দেয় তার সঙ্গে থাকবে বলে। পরম সুখে মাতাল হয়ে যায় ব্যানানা।

এখনই সময়। না হলে আর কোনোদিনই হবে না।

চুলটা ঠিকঠাক করে নেবার আছিলায় টেবিলের কাছে উঠে যায় মেয়েটি। ঘরে কোনো আরশি না থাকায় কুমড়োর খোলে রাখা জলে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে সুন্দর চুলগুলোকে পরিপাটি করে নেয় ও। তারপর ব্যানানাকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে এনে খোলাটাকে দেখিয়ে বলে, 'দ্যাখো, নিচে কি যেন একটা পড়ে রয়েছে।'

স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে, কোনো রকম সন্দেহ না করেই, ব্যানানা সরাসরি জলটার দিকে তাকায়। জলে তার মুখের প্রতিবিম্ব জেগে ওঠে। তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎগতিতে মেয়েটি দুহাতে জলে এমন চাপড় মারে যে ওর হাত খোলটার একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকে, ছিটকে ওঠে সমস্ত জল। প্রতিবিম্বটা খান খান হয়ে ভেঙে যায়। ব্যানানা একটা কর্কশ আর্তনাদ তুলে এক লাফে পিছিয়ে গিয়ে মেয়েটির দিকে তাকায়। মেয়েটির মুখে তখন ঘৃণা মেশানো বিজয়িনীর হাসি। ব্যানানার দু চোখে আতঙ্ক জেগে ওঠে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভারি শরীরটা মুচড়ে ওঠে তার। তারপর, এক তীব্র বিষের জ্বালায়, সশব্দে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে মানুষটা। একটা প্রচণ্ড শিহরণ তার সমস্ত শরীর দিয়ে ছুটে যায়। তারপর সব স্থির। মেয়েটি তখন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তার কাছ এসে ঝুঁকে দাঁড়ায়, বুকে হাত রেখে দ্যাখে, তারপর চোখের পাতা দুটো নামিয়ে দেয়। মরে ভূত হয়ে গেছে মানুষটা।

এবারে ক্যাপটেন বাটলারের ঘরে গিয়ে ঢোকে মেয়েটি। ক্যাপটেনের গাল দুটোতে অস্পস্ট রক্তিম আভাস। খানিকটা চমকে উঠে মেয়েটির দিকে তাকায় সে। ফিসফিসিয়ে জিগেস করে, 'কি হয়েছিলো ?'

আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে এই প্রথম সে কথা বললো।

'কিছুই হয়নি,' জবাব দিলো মেয়েটি।

'আমার কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে।'

ফের চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লো ক্যাপটেন। তারপর পুরো একটা দিন এবং এক রাত্রি ঘুমোবার পর জেগে উঠেই সে খেতে চাইলো। পনেরো দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো মানুষটা।

নৌকো বেয়ে আমি আর উইণ্টার যখন তীরে ফিরে এলাম তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আমরা অগুন্তিবার হুইস্কি আর সোডা পান করেছি।

'ঘটনাটা শুনে কি মনে হলো ?' জিগেস করলো উইণ্টার।

'কি একখানা প্রশ্ন ! যদি বলতে চান যে এর কোনো ব্যাখ্যা আমি দিতে পারি কি না, তাহলে বলবো—না।'

'ক্যাপটেন কিন্তু এর প্রতিটি শব্দই বিশ্বাস করে।'

'সেটা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু জানেন, এ ব্যাপারটা সত্যি কি মিথ্যে, এসবের কি অর্থ—এগুলো আমার কাছে তেমন আগ্রহজনক বলে মনে হচ্ছে

না। এ ধরনের একটা মানুষের জীবনে যে এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে—এটাই আমার সব চাইতে অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। ওই অতি সাধারণ ছোটো-খাটো মানুষটার মধ্যে কি এমন আছে যা ওই সুন্দরী মেয়েটির মধ্যে অমন তীব্র ভালোবাসা জাগিয়ে তুললো, সেটাই আমি ভেবে পাচ্ছি না। ক্যাপটেন যখন গল্পটা বলছিলো তখন ওই ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি ভাবছিলাম, প্রেমের কি অদ্ভুত ক্ষমতা, কতো অলৌকিক কাজই না সে করে ফেলতে পারে!'

'এটি কিন্তু সেই মেয়েটি নয়!'

'তার মানে! কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'আপনি ক্যাপটেনের পাচকটিকে লক্ষ্য করেননি?'

'করেছি বই কি! অমন হতকুচ্ছিত লোক আমি জীবনেও দেখিনি।'

'অমন কুৎসিত বলেই ক্যাপটেন লোকটাকে রেখেছে। আগের সেই মেয়েটি এক বছর আগে ক্যাপটেনের চীনে রাঁধুনেটার সঙ্গে পালিয়ে গেছে। এটি একটি নতুন মেয়ে। মাত্র মাস দুয়েক আগে ক্যাপটেন ওকে এখানে এনেছে।'

'কি কাণ্ড!'

'ক্যাপটেন মনে করে, এই পাচকটি নিরাপদ। তবে ওর জায়গায় থাকলে আমি কিন্তু অতোটা নিশ্চিন্ত থাকতাম না। চীনেদের মধ্যে কিছু একটা আছে—একটা চীনে যখন কোনো মেয়েকে খুশি করার জন্যে নিজেকে এগিয়ে দেয়, তখন মেয়েটি কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারে না।'

অপরিচিতা

অ্যাশেনডেনের স্বভাবই এই যে সে সর্বদা জোরগলায় দাবী করে, তার কক্ষণো একঘেয়ে লাগে না। তার ধারণা, যাদের নিজেদের মধ্যে কোনো বস্তু নেই তারাই একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হয় এবং একমাত্র নির্বোধরাই নিজেদের বিনোদনের জন্যে বাইরের পৃথিবীর ওপরে নির্ভর করে। নিজের সম্পর্কে অ্যাশেনডেনের মনে কোনো অলীক ধারণা নেই এবং সাম্প্রতিক সাহিত্যে নিজের অসামান্য সফলতা তার মাথাটা ঘুরিয়ে দেয়নি। একটা সফল উপন্যাস বা কোনো জনপ্রিয় নাটকের সুবাদে লেখকের ভাগ্যে পুরস্কার স্বরূপ জুটে যাওয়া সুনাম ও দুর্নামকে সে সম্পূর্ণ পৃথকভাবেই দেখে এবং কোনো বাস্তব লাভের প্রশ্ন জড়িত না থাকা অব্দি ওই ব্যাপারে সে সর্বদাই নির্লিপ্ততা বজায় রাখে। জাহাজে প্রদত্ত ভাড়ার তুলনায় একটু উন্নত ধরনের ঘর পাবার জন্যে সে

নিজের সুপরিচিত নামটার সুযোগ নিতে সব সময়েই প্রস্তুত। তার ছোটো গল্পগুলো পড়েছে বলে শুল্কভবনের কোনো আধিকারিক যদি তার মালপত্রগুলো না খুলেই ছেড়ে দেয়, তাহলে অ্যাশেনডেন আনন্দের সঙ্গেই স্বীকার করে নেয় যে সাহিত্যের পথ অনুসরণ করলে আখেরে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। নাটকের আগ্রহী তরুণ ছাত্ররা তার সঙ্গে নাটকের প্রয়োগ কৌশল নিয়ে আলোচনা করতে চাইলে সে দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে এবং কলস্বিনী মহিলারা কম্পিত কণ্ঠস্বরে তার কানের কাছে তারই বই সম্পর্কে ফিসফিসিয়ে প্রশংসা করতে থাকলে প্রায়ই তার মরে যেতে ইচ্ছে হয়। অ্যাশেনডেন নিজেকে বুদ্ধিমান বলে মনে করে, কাজেই তার পক্ষে একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। বস্তুত যে সমস্ত লোককে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়কভাবে বিরক্তিকর বলে মনে করা হয়, এমন কি নিজেদের আত্মীয়স্বজনও যাদের কাছ থেকে অধমর্ণের মতো পালিয়ে বেড়ায়, অ্যাশেনডেন তাদের সঙ্গেও দিব্যি আগ্রহ নিয়ে কথাবার্তা বলতে পারে। হয়তো এ সমস্ত ক্ষেত্রে সে নিজের পেশাদারী প্রবৃত্তিটাকেই প্রশ্রয় দেয়, যেটা তার মধ্যে খুব একটা সুপ্ত অবস্থায় থাকে না। ফসিল ভূবিজ্ঞানীদের যতোটা ক্লান্ত করে, ওরা অ্যাশেনডেনকে তার চাইতে বেশি ক্লান্ত করে না—কারণ ওরা তার উৎপাদনের কাঁচামাল। একটা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নিজের বিনোদনের জন্যে যা কিছু চাইতে পারে, তার সমস্ত কিছুই এখন অ্যাশেনডেনের হেফাজতে আছে। একটা ভালো হোটেলের কয়েকখানা চমৎকার ঘর এখন তার দখলে এবং বাস করার পক্ষে জেনিভা হচ্ছে ইউরোপের অন্যতম মনোরম শহর। একটা নৌকো ভাড়া করে সে হ্রদের বুকে ঘুরে বেড়ায়। কিংবা ভাড়াটে ঘোড়ার পিঠে চেপে দুলকি চালে এগিয়ে যায় শহরতলির খোয়া-বাঁধানো পথ ধরে—কারণ এই পরিপাটি সুশৃঙ্খল ক্যান্টনটিতে দাপিয়ে ঘোড়া ছোটাবার মতো এক টুকরো সবুজ জমির সন্ধান পাওয়া ভারি কঠিন। এখানকার প্রাচীন রাস্তাগুলোতে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সে ওই নিশ্চুপ আর মহিমামণ্ডিত ধূসর পাথুরে বাড়িগুলোর মধ্যে বিগত যুগের আত্মাটাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছে। মনের আনন্দে ফের রুশোর 'স্বীকারোক্তি' খানা পড়েছে এবং বার দু-তিনে বৃথাই লা নুভ্যালুয়াসের মর্মোদ্ধার করার চেষ্টা করেছে। তাছাড়া সে লিখেছে। এখানে সামান্য কয়েকজনকেই সে চেনে, কারণ অলক্ষ্যে থাকাই তার কাজ। তবে হোটেলে অবস্থানকারী বেশ কয়েকজনের সঙ্গেই সে আলাপ-সালাপ করেছে এবং সে আদৌ নিঃসঙ্গ নয়। তার জীবনটা যথেষ্ট পরিমাণেই ভরপুর, বৈচিত্র্যময় এবং কিছু করার না থাকলে শুধু স্মৃতিচারণ করেই সে যথেষ্ট আনন্দ পায়। কাজেই এহেন পরিস্থিতিতে সে একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে উঠতে পারে, এমন একটা সম্ভাবনার কথা চিন্তা করাই অসম্ভব। তবু অনন্ত আকাশে ছোট্ট এক টুকরো নিঃসঙ্গ মেঘের মতো অ্যাশেনডেন মাঝে মাঝে একঘেয়েমির আসন্ন সম্ভাবনা দেখতে পায়। চতুর্দশ লুই সম্পর্কে একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার কোনো একটা উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে

তিনি একজন সভাসদকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে এত্তেলা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে এসে হাজির হতেই তিনি স্থানান্তরে যাবার জন্যে গাত্রোত্থান করেন এবং তার দিকে ফিরে রাজকীয় হিমেল ভঙ্গিতে বলেন, 'জেই ফেলোতান্দ্রে'—বাজে হলেও এর যে একটি মাত্র অনুবাদ আমি দিতে পারি তা হচ্ছে, এইমাত্র আমি প্রতীক্ষা থেকে রেহাই নিয়েছি। তেমনি অ্যাশেনডেনও এখন বলতে পারে, সে কোনোক্রমে একঘেয়েমিকে এড়িয়েছে।

যদিও অ্যাশেনডেনের ঘোড়া কখনও পেছনের পা তুলে লাফায় না এবং মোটামুটি একটু সপ্রতিভ ভঙ্গিতে চালাতে হলেও ঘোড়াটাকে একটা মোক্ষম গুঁতো মারার প্রয়োজন হয়, তবু পুরনো সিনেমায় দেখা লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে চলা টগবগে তেজী ঘোড়ার মতো বিশাল রাং, খাটো ঘাড় আর চাকা-চাকা দাগে চিত্রিত কোনো ঘোড়ায় চেপে হ্রদের ধার দিয়ে যাবার সময় হয়তো সে অন্যমনে ভাবে, লন্ডনের অফিসে বসে যে সমস্ত বড়োকর্তারা গুপ্তচর বিভাগের বিশাল যন্ত্রটাকে নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদের জীবন ভারি উত্তেজনাময়! তাঁরা যেখানে-সেখানে গুঁটি সরান, অগুন্তি সুতোয় বোনা নকশাটাকে লক্ষ্য করেন (রূপকালঙ্কার প্রয়োগে অ্যাশেনডেন একেবারে অকৃপণ) এবং করাত-কলে কাটা বিচ্ছিন্ন ছবিগুলোকে জোড়া লাগিয়ে একটা গোটা ছবি গড়ে তোলেন। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে জনসাধারণ যেমনটি মনে করে, তার মতো একটা চুনো পুঁটির পক্ষে গুপ্তচর বিভাগের জীবন ঠিক ততোটা রোমাঞ্চকর নয়। অ্যাশেনডেনের বিভাগীয় অস্তিত্ব একটা কেরানীর মতোই শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং বৈচিত্র্যহীন। নির্ধারিত বিরতি অনুযায়ী সে তার গুপ্তচরদের সঙ্গে দেখা করে, তাদের মাইনেপত্র মেটায়। তেমন কোনো নতুন লোকের সন্ধান পেলে তাকে কাজে লাগায়, তাকে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে জার্মানীতে পাঠিয়ে দেয়। তাদের কাছ থেকে কোনো খবর পেলে অ্যাশেনডেন সেটা যথাস্থানে পাঠায়। সহকর্মীদের সঙ্গে সীমান্ত সম্পর্কে শলা পরামর্শ করার জন্যে এবং লণ্ডন থেকে নির্দেশ পাবার জন্যে সপ্তাহে একবার করে সে ফ্রান্সে যায়। মাখন-বিক্রিওয়ালি হ্রদের ওপার থেকে কোনো খবর এনেছে কিনা তা জানার জন্যে হাটবারের দিন সে হাটে যায়। নিজের চোখ কান সে সর্বদা খোলা রাখে। এবং লম্বা লম্বা প্রতিবেদন তৈরি করে, যেগুলো কেউ পড়ে না বলে সে একেবারে সুনিশ্চিত। তার কাজটা স্পষ্টতই প্রয়োজনীয়, কিন্তু এটাকে বৈচিত্র্যহীন ছাড়া অন্য কিছু বলা চলে না। এক সময় এর চাইতে একটু উন্নত ধরনের কাজ করার তাগিদে সে ব্যারনেস ফন হিগিনসের সঙ্গে একটু আশনাই করার কথাটা ভেবে দেখেছিলো। মহিলাটি যে অস্ট্রিয়ার গুপ্তচর বিভাগের একজন এজেন্ট, এ বিষয়ে ততোদিনে সে একেবারে সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছিলো এবং ওর সঙ্গে সম্ভাব্য দ্বৈরথ সমরের মাধ্যমে সে খানিকটা আনন্দ আহরণ করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছিলো। ভেবেছিলো, ওর সঙ্গে বুদ্ধির খেলাটা সত্যিই খুব জমবে। মহিলাটি যে তার জন্যে প্রলোভনের ফাঁদ বিছিয়ে

রাখবে এবং সেটাকে এড়িয়ে চলার জন্যে তার মনটাকে যে নিষ্ক্রিয়তা থেকে মুক্ত করে রাখতে হবে, এ বিষয়ে অ্যাশেনডেন সম্পূর্ণ সচেতন ছিলো। এ ধরনের খেলাধুলোয় তার আপত্তি ছিলো না। অ্যাশেনডেন মহিলাকে ফুল পাঠালে, মহিলাটি তাকে ছোটো ছোটো উৎসাহী চিঠি পাঠাতো। অ্যাশেনডেনের সঙ্গে ও হ্রদের বুকে নৌবিহার করেছে, নৌকোয় যেতে যেতে নিজের দীর্ঘ শুভ্র হাতখানা হ্রদের জলে ডুবিয়ে প্রেম সম্পর্কে কথাবার্তা বলেছে এবং একটা ভগ্ন হৃদয়ের ইঙ্গিতও করেছে। ওরা একসঙ্গে নৈশভোজ করেছে এবং তারপর ফরাসী ভাষায় গদ্যে অনূদিত রোমিও জুলিয়েতের অভিনয়-অনুষ্ঠান দেখতে গেছে। অ্যাশেনডেন ঠিক করতে পারছিলো না, এ ব্যাপারটা নিয়ে সে কতোদূর অব্দি যেতে প্রস্তুত। কিন্তু তার মধ্যেই সে র—য়ের কাছ থেকে একখানা কড়া চিঠি পেয়ে গেলো। র—জানতে চেয়েছেন, তার মতলবটা কি। তাঁর 'হাতে' এমন খবর এসেছে যে সে (অ্যাশেনডেন) একটি মহিলার সঙ্গে খুব বেশি মেলামেশা করছে, মহিলাটি ব্যারনেস দ্য হিগিনস নামে নিজের পরিচয় দেয়, কিন্তু আসলে সে কেন্দ্রীয় শক্তির একজন এজেণ্ট হিসেবেই পরিচিত। অতএব অ্যাশেনডেনের পক্ষে ওই মহিলাটির সঙ্গে শুধুমাত্র আন্তরিকতাবর্জিত সৌজন্যমূলক সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো রকম সম্পর্ক রাখা আদপেই অনুমোদনযোগ্য নয়। চিঠি পেয়ে অ্যাশেনডেন কাঁধ ঝাঁকালো। সে নিজেকে যতোটা চতুর বলে মনে করে, র—তা মনে করেন না। কিন্তু এতোদিন সে যা জানতো না, এবারে অ্যাশেনডেন সেটা আবিষ্কারের জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠলো। সে বুঝতে পারলো, জেনিভা অঞ্চলে এমন কেউ আছে যার কাজ হচ্ছে যেন-তেন-প্রকারেন অ্যাশেনডেনের দিকে নজর রাখা। অ্যাশেনডেন যাতে নিজের কাজে অবহেলা না করে এবং কোনো রকম ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখার জন্যে স্পষ্টতই কারুর ওপরে নির্দেশ দেওয়া আছে। অ্যাশেনডেন এতে একটুও চমৎকৃত হলো না। সত্যি, র—মানুষটা কি প্রচণ্ড ধূর্ত আর বিবেক বর্জিত! উনি কোনো ঝুঁকি নেন না, কাউকে বিশ্বাস করেন না—নিজের যন্ত্রগুলিকে উনি কাজে লাগান, কিন্তু কারুর সম্পর্কেই উঁচু বা নিচু কোনো মতামত পোষণ করেন না। অ্যাশেনডেন ভাবতে লাগলো, কে তার গতিবিধির খবরটা র—কে জানাতে পারে। হোটেলেরই কোনো পরিচারক কি না, কে জানে। অ্যাশেনডেন জানে, পরিচারকদের ওপরে র—য়ের দারুণ আস্থা। ওরা অনেক কিছু দেখার সুযোগ পায় এবং লিখিত সংবাদ কুড়িয়ে নেবার জন্যে যে কোনো জায়গায় সহজেই যেতে পারে। খোদ ব্যারনেসের কাছ থেকেই উনি অ্যাশেনডেনের খবরাখবর পেয়েছেন কিনা, তাই বা কে জানে। মহিলাটি যদি কোনো মিত্রশক্তির গুপ্তচর বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকে, তবে সেটাও খুব একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হবে না। অ্যাশেনডেন ব্যারনেসের সঙ্গে মার্জিত ব্যবহারটা বজায় রাখলো, তবে অতি মনোযোগী হওয়াটা বন্ধ করলো।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ধীর কদমে জেনিভার দিকে ফিরে চললো অ্যাশেনডেন। হোটেলের দরজাতেই একজন অশ্বরক্ষক অপেক্ষা করছিলো। জিন থেকে নেমে অ্যাশেনডেন হোটেলে ঢুকতেই সামনের টেবিল থেকে তার হাতে একখানা তারবার্তা তুলে দেওয়া হলো। তাতে লেখা ঃ

'ম্যাগি পিসীর শরীর একেবারেই ভালো নেই। উনি পারীর ওতেল লত্তিতে আছেন। সম্ভব হলে একবার গিয়ে দেখা করে এসো। রেমণ্ড।'

রেমণ্ড র—য়েরই একটা ভুয়ো নাম। ম্যাগি নামে কোনো পিসী পাবার সৌভাগ্য হয়নি বলে অ্যাশেনডেন ধরে নিলো, আসলে এই তারের মাধ্যমে তাকে পারীতে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চিরদিনই তার ধারণা, র—তাঁর অবকাশের সিংহভাগটা গোয়েন্দা কাহিনী পড়েই ব্যয় করেন এবং মেজাজ ভালো থাকলে ওই সমস্ত সস্তা কাহিনীর গোয়েন্দাদের কার্যপ্রণালী অনুকরণ করে উনি সাংঘাতিক আনন্দ পান। তবে র—য়ের মেজাজ ভালো থাকার অর্থ, উনি শীগগিরি কোথাও একটা আঘাত হানতে চলেছেন—কারণ আঘাত হানার পরেই তাঁর মনটা বিষন্নতায় ভরে থাকে এবং তখন তিনি নানা ভাবে তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করে তোলেন।

স্বেচ্ছাকৃত অমনোযোগিতায় তারবার্তাটা টেবিলে ফেলে রেখে অ্যাশেনডেন জানতে চাইলো, পারীতে যাবার এক্সপ্রেসটা কখন ছাড়ছে। তারপর দেয়াল ঘড়িটার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দেখে নিলো, বাণিজ্য-দূতাবাস বন্ধ হবার আগে সেখানে গিয়ে ভিসা সংগ্রহ করে আনার মতো সময় তার হাতে আছে কি না। এবারে অ্যাশেনডেন পাসপোর্ট নিয়ে আসার জন্যে ওপর তলায় যেতেই —লিফটের দরজা তখন সবেমাত্র বন্ধ হয়েছে—হোটেলের কেরানীটি তাকে ডেকে বললো, 'মঁসিয়ে তারটা ভুলে ফেলে এসেছিলেন।'

'দ্যাখো দেখি কি বোকামো,' অ্যাশেনডেন বললো।

এতোক্ষণে সে নিশ্চিন্ত হলো—ঘটনাচক্রে অস্ট্রিয় ব্যারনেসটি যদি ভাবতে বসে, অ্যাশেনডেন কেন এমন আচমকা পারীতে চলে গেলো তাহলে সে অবশ্যই আবিষ্কার করে ফেলবে, অ্যাশেনডেনের এক আত্মীয়ার অসুস্থতাই তার কারণ। বাণিজ্য দূতাবাসে অ্যাশেনডেন সুপরিচিত, তাই সেখানে তার সামান্যই সময় নষ্ট হলো। হোটেলে ফিরে সে কেরানীটিকে একখানা টিকিট কাটার কথা বলে, স্নান সেরে পোশাক বদলে নিলো। সফরটা তার ভালোই লাগলো। ঘুম ভালোই হয়েছিলো এবং একটা আচমকা ঝাঁকুনিতে ঘুমটা চটে গেলেও মোটের ওপর তার কোনো অসুবিধে হয়নি। শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানা আর ছোট্ট কেবিনে নিজের বিমুগ্ধ নিঃসঙ্গতা উপভোগ করার মধ্যে একটা দারুণ আনন্দ আছে। ট্রেনের চাকার ছন্দময় আওয়াজ মনের ভাবনার সঙ্গে একাকার হয়ে মিলে যায়। রাত্রিবেলা খোলা মাঠঘাট দিয়ে দ্রুত ধাবমান ট্রেনটাকে মনে হয় যেন অনন্ত মহাকাশের বুকে ছুটে চলা একটা নক্ষত্র—যার যাত্রাপথের সমাপ্তিতে রয়েছে চির অজানা।

অ্যাশেনডেন যখন পারীতে পেঁছিলো তখন আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা, হালকা বৃষ্টি ঝরেই চলেছে। তবু দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে, অন্তর্বাসগুলো বদলে নিতে ইচ্ছে করছিলো তার। কিন্তু মন-মেজাজ উৎসাহে টগবগে। স্টেশন থেকেই র—কে টেলিফোন করে সে জানতে চাইলো, ম্যাগি পিসী কেমন আছে।

'জেনে খুশি হলাম, ওঁর প্রতি তোমার ভালোবাসা এতো গভীর যে তুমি এখানে এসে পেঁছিতে একটুও সময় নষ্ট করোনি।' র—য়ের কণ্ঠস্বরে চাপা হাসির আভাস। 'ওঁর অবস্থা খুবই খারাপ। তবে তোমাকে দেখতে পেলে ওঁর যে উপকার হবে, সে বিষয়ে আমি একেবারে সুনিশ্চিত।'

অ্যাশেনডেনের মনে হলো, অপেশাদাররা প্রায়ই এই ভুলটি করে থাকে এবং এখানেই পেশাদারদের সঙ্গে তাদের প্রভেদ। রসজ্ঞের সঙ্গে তার রসিকতার সম্পর্ক হবে দ্রুত এবং আচমকা—ঠিক ভ্রমরের সঙ্গে ফুলের সম্পর্কের মতো। অবিশ্যি রসিকতাটা করার আগে ফুলের দিকে এগিয়ে যাওয়া ভ্রমরের মতো সামান্য একটু গুঞ্জন তুললে কোনো ক্ষতি নেই—কারণ সেটা হবে স্থূলবুদ্ধির মানুষদের কাছে রসিকতার আগমনবার্তা ঘোষণা করার মতো একটা সংকেত। কিন্তু অন্যের রসিকতা সম্পর্কে অ্যাশেনেডেনের মনে একটা সহৃদয় সহনশীলতা আছে, যেটা অধিকাংশ পেশাদার রসজ্ঞেরই থাকে না। তাই এখন র—কেও সে নিজের ভঙ্গিতে জিগেস করলো, 'উনি কখন আমার সঙ্গে দেখা করবেন বলে আপনি মনে করেন? ওঁকে আমার ভালোবাসা জানিয়ে দেবেন কিন্তু, কেমন?'

র—এবার স্পষ্টতই হাসলেন। অ্যাশেনডেন দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'আমার বিশ্বাস, তুমি দেখা করতে আসার আগে উনি নিজেকে একটু ফিটফাট করে নিতে চাইবেন। ধরে নাও সাড়ে দশটা। তুমি ওঁর সঙ্গে কথা-বার্তা বলে নেবার পরে আমরা বাইরে গিয়ে কোথাও কিছু খেয়ে নেবো এখন।'

'ঠিক আছে, আমি তাহলে সাড়ে-দশটার সময় লত্তিতে আসছি।'

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর সতেজ হয়ে অ্যাশেনডেন হোটেলে পেঁছিতেই একটি আর্দালি তাকে র—য়ের অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গেলো। তাপচুল্লির গনগনে আগুনের দিকে পেছন ফিরে র—তাঁর সচিবকে শ্রুতিলিপি দিচ্ছিলেন। অ্যাশেডেনকে বসতে বলে উনি ফের শ্রুতিলিপি দিয়ে যেতে লাগলেন।

বসার এই ঘরটা আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। ফুলদানিতে রাখা গোলাপ-গুচ্ছে যেন কোনো মহিলার হাতের স্পর্শ লেগে আছে। বিশাল একটা টেবিলে একগাদা কাগজপত্র। অ্যাশেনডেন শেষবার যখন দেখেছিলো, তার চাইতে র—কে আরও বেশি বয়স্ক বলে মনে হলো। ওঁর হলদে কৃশ মুখখানাতে এখন আরও অনেক রেখা পড়েছে, চুলগুলোও আগের চাইতে বেশি পাকা। কাজ ওঁর শরীরে ছাপ ফেলতে শুরু করেছে। নিজেকেও উনি রেহাই দেন

না। প্রতিদিন উনি সকাল সাতটায় ঘুম থেকে ওঠেন এবং গভীর রাত অব্দি নিজের কাজ করেন। ওঁর উর্দিটা ফিটফাট, কিন্তু সেটা উনি যেমন-তেমনভাবে পরে রয়েছেন।

'ব্যাস, এতেই চলবে। এগুলো তুমি টাইপ করে নিয়ে এসো, আমি খেতে যাবার আগে সই করে দিয়ে যাবো।' সচিবের দিক থেকে আর্দালির দিকে মুখ ফিরিয়ে উনি বললেন, 'এখন আমাকে যেন বিরক্ত করা না হয়।'

সচিবটি একজন সেকেন্ড-লেফটেন্যান্ট, তিরিশের কোঠায় বয়েস। পরিষ্কার বোঝা যায়, লোকটা সাময়িকভাবে সামরিক বিভাগে এসেছে। একরাশ কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। আর্দালি তাকে অনুসরণ করতে যেতেই র—বললেন, 'তুমি বাইরে থেকো। দরকার হলে ডাকবো।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

দুজনে একা হতেই র—যথাসম্ভব সহৃদয় ভঙ্গিতে অ্যাশেনডেনের দিকে তাকালেন, 'আসার সময়টা ভালোভাবে কেটেছে তো?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'এটা তোমার কেমন লাগছে?' ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে র—বললেন, 'মন্দ নয়, তাই না? যুদ্ধের দুঃখ-কষ্ট-তীব্রতা একটু সহনীয় করে তোলার জন্যে যেটুকু করা যায় মানুষ কেন তা করবে না, আমি ভেবে পাইনে।'

অলস ভঙ্গিতে এলোমেলো কথাবার্তা বলতে বলতেও র—অ্যাশেনডেনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। ওঁর ফ্যাকাশে চোখের ওই তীক্ষ্ন দৃষ্টি দেখে মনে হয়, উনি যেন শ্রোতার অবারিত মস্তিষ্কটাও পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছেন এবং সেটায় সম্পর্কে ওঁর ধারণা খুবই খারাপ। দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে কিছু কিছু দুর্লভ মুহূর্তে উনি পরিষ্কার বলেই ফেলেন যে স্বজাতির মানুষগুলোকে উনি নির্বোধ কিংবা শয়তান বলে মনে করেন। বরঞ্চ শয়তানই ওঁর বেশি পছন্দ, কারণ সে ক্ষেত্রে বোঝা যায় লড়াইটা কিসের বিরুদ্ধে এবং তখন ব্যবস্থাটাও সেই মতো বুঝে নেওয়া যায়। র—নিজে একজন পেশাদার সৈনিক, কর্মজীবনটা উনি ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য উপনিবেশে কাটিয়েছেন। যুদ্ধের শুরুতে উনি জ্যামাইকায় কর্মরত ছিলেন। সেখানকার সমর দফতরের এক ব্যক্তি ওঁকে মনে রেখেছিলেন এবং তিনিই ওঁকে নিয়ে এসে গোয়েন্দা দফতরে বসিয়ে দেন। কাজকর্মে র—য়ের এতোই বিচক্ষণতা যে এখানে খুব শীগগিরি উনি একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে উঠে যান। ভদ্রলোকের অনন্ত উৎসাহ, অসামান্য সংগঠন ক্ষমতা—উনি দ্বিধা-সঙ্কোচনহীন, সাহসী এবং সঙ্কল্পে অটল। সম্ভবত একটাই ওঁর দুর্বলতা। সারা জীবনে সামাজিক দিক দিয়ে উনি কখনও কারুর, বিশেষ করে কোনো মহিলার, সংস্পর্শে আসেননি। মহিলা বলতে উনি যাদের চিনতেন তারা হয় কোনো সহকর্মী অফিসারের স্ত্রী আর নয়তো কোনো উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী অথবা কোনো

ব্যবসায়ীর পত্নী। যুদ্ধের শুরুতে লণ্ডনে এসে কার্যোপলক্ষে ঝলমলে সুন্দরী নামজাদা মহিলাদের সংস্পর্শে এসে উনি অস্বাভাবিক বিহ্বল হয়ে ওঠেন। তখন মেয়েদের দেখে উনি লজ্জা পেতেন। কিন্তু তারপর ওদের সমাজ-জীবনের চর্চা করে উনি রীতিমতো রমণীমোহন হয়ে ওঠেন। র—নিজেকে যতোটা চেনেন, অ্যাশেনডেন তাঁকে তার চাইতেও বেশি চেনে এবং অ্যাশেন-ডেনের ধারণা, ওই গোলাপগুচ্ছের পেছনেও একটা কাহিনী রয়ে গেছে।

অ্যাশেনডেন জানতো, র—শুধুমাত্র আবহাওয়া আর ফসলের কথা আলোচনা করার জন্যে তাকে এখানে ডেকে পাঠাননি এবং কখন উনি আসল কথায় আসবেন, অ্যাশেনডেন তা-ই ভাবছিলো। বেশিক্ষণ তাকে ভাবতে হলো না।

'জেনিভাতে কাজকর্ম তুমি বেশ ভালোই করছো,' উনি বললেন।

'আপনার অভিমতটা জেনে খুশি হলাম, স্যার।' অ্যাশেনডেন জবাব দিলো।

আচমকা র—কে ভীষণ শীতল আর কঠিন দেখালো। এতোক্ষণে ওঁর আজেবাজে কথা বলার পালা শেষ হয়েছে।

'তোমার জন্যে আমি একটা কাজ রেখেছি।'

অ্যাশেনডেন কোনো জবাব দিলো না, কিন্তু পাকস্থলীর গভীরে সে কোথায় যেন খুশীর একটা মৃদু আলোড়ন অনুভব করলো।

'তুমি কখনও চন্দ্রালালের নাম শুনেছো?'

'না, স্যার।'

মুহূর্তের জন্যে র—য়ের ভ্রূযুগলে অধৈর্যের ছায়া ঘনিয়ে উঠলো। তিনি আশা করেন, অধীনস্থ কর্মচারীরা তাঁর প্রত্যাশিত প্রতিটি জিনিসই জানবে।

'এতোদিন কোথায় ছিলে তুমি?'

'মেফেয়ারের ছত্রিশ নম্বর চেস্টারফিল্ড স্ট্রীটে।'

র—য়ের হলদে মুখে একটা মৃদু হাসির ঝিলিক খেলে গেলো। অ্যাশেন-ডেনের জবাব খানিকটা দুর্বিনীত ও অপ্রাসঙ্গিক হলেও, এটা তাঁর নিজস্ব বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গির সঙ্গে দিব্যি সামঞ্জস্যময়। বিশাল টেবিলটার কাছে এগিয়ে গিয়ে উনি একটা ব্যাগ খুলে একটা ছবি অ্যাশেনডেনের হাতে তুলে দিলেন।

'এই হচ্ছে সেই লোক।'

প্রাচ্যের অধিবাসীদের মুখ দেখে তেমন অভ্যস্ত নয় বলে ছবির মুখটা অ্যাশেনডেনের কাছে তার দেখা আর পাঁচটা ভারতীয়ের মতো একই রকম লাগলো। যে সমস্ত রাজন্যবর্গ মাঝে মধ্যে ইংলণ্ডে আসেন, সচিত্র পত্রিকা-গুলোতে যাঁদের ছবি বেরোয়—এই ছবিটা তাঁদের কারুরও হতে পারে। ছবিতে একটি কৃষ্ণকায় মানুষকে দেখা যাচ্ছে—গোলগাল মুখ, পুরুষ্টু ঠোঁট,

মাংসল বর্তুল নাক। মাথার চুলগুলো ঘন কালো এবং সোজা। ছবিতেও বোঝা যাচ্ছে, লোকটার চোখ দুটো খুব বড়ো বড়ো, ছলছলে এবং গরুর চোখের মতো অভিব্যক্তিহীন। ইউরোপীয় পোশাকে মানুষটাকে অস্বচ্ছন্দ লাগছে।

'এই হচ্ছে তার দেশী পোশাক পরা ছবি,' র— অ্যাশেনডেনকে আরও একখানা আলোকচিত্র এগিয়ে দিলেন।

প্রথম ছবিটা ছিলো কাঁধ অব্দি, এটা পূর্ণ চেহারার ছবি। স্পষ্টই বোঝা যায়, এটা কয়েক বছর আগে তোলা। তখন মানুষটা বেশ রোগাই ছিলো। মুখখানা শুধু চোখসর্বস্ব। ছবিটা কলকাতায় কোনো এক দেশী চিত্রগ্রাহকের তোলা এবং ছবির পরিবেশ রীতিমতো হাস্যকর ও অদ্ভুত। ছবিতে চন্দ্রালালের পেছনে একটা বিষণ্ণ পাম গাছ ও সমুদ্রের দৃশ্য। প্রচণ্ড কাজ করা একটা টেবিলে একখানা হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে মানুষটা। টেবিলের ওপরে ফুলদানিতে রাখা একটা রবার গাছ। কিন্তু পাগড়ি এবং লম্বা, হালকা রঙের পোশাকে মানুষটাকে মর্যাদাসম্পন্ন বলেই মনে হচ্ছে।

'দেখে কি মনে হলো ?' র—জিগেস করলেন।

'মনে হচ্ছে মানুষটা ব্যক্তিত্বহীন নয়। চেহারার মধ্যে একটা শক্তির প্রকাশ আছে।'

র—অ্যাশেনডেনকে কয়েকটা টাইপ করা পৃষ্ঠা দিলেন, অ্যাশেনডেন সেগুলো নিয়ে বসে পড়লো। র—নাকে চশমা লাগিয়ে তাঁর স্বাক্ষরের অপেক্ষায় থাকা চিঠিগুলোকে পড়তে শুরু করলেন। অ্যাশেনডেন প্রতিবেদন-টাতে প্রথমে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে, দ্বিতীয় বার সেটাকে একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলো। যতোদূর বোঝা যাচ্ছে, চন্দ্রালাল একজন বিপজ্জনক আন্দোলনকারী। লোকটা পেশায় ছিলো আইনজীবী, কিন্তু পরে সে রাজনীতি নিয়ে মেতে ওঠে এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের তীব্র বিরোধীতা করতে শুরু করে। চন্দ্রালাল সশস্ত্র চক্রের অনুগামী ছিলো এবং জীবন বিনষ্টকারী একাধিক দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্যে সে-ই দায়ী। একবার তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং বিচারে তাকে দু'বছরের কারাদন্ড দেওয়া হয়। কিন্তু যুদ্ধের গোড়ার দিকে লোকটা মুক্তই ছিলো এবং ওই সুযোগে সে মানুষকে সক্রিয় বিদ্রোহের জন্যে প্ররোচিত করতে শুরু করে। ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে বিব্রত করে তোলার ষড়যন্ত্রগুলির কেন্দ্রে ছিলো চন্দ্রালাল। কাজেই যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা চালানোর কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে এবং জার্মান গুপ্তচরদের দেওয়া বিশাল অর্থানুকূল্যে লোকটা ব্রিটিশদের অনেক রকম ঝামেলায় ফেলতে সক্ষম হয়েছিলো। দু-তিনটে বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারেও সে জড়িত ছিলো। কয়েকজন নিরীহ পথচারীর প্রাণহানি হওয়া ছাড়া তাতে তেমন কিছু ক্ষতি না হলেও, সেগুলো জনসাধারণের স্নায়ুতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়েছিলো এবং তাদের নৈতিক আত্মবিশ্বাসও প্রচণ্ড পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত

হয়েছিলো। গ্রেফতারের সমস্ত প্রচেষ্টাই সে এড়িয়ে যেতে থাকে। তার কার্যকলাপ ছিলো ভয়ঙ্কর। সে আজ এখানে তো কাল সেখানে। পুলিস কিছুতেই তাকে ছুঁতে পারছিলো না। তারা শুধু জানতে পারতো লোকটা অমুক শহরে ছিলো, তারপর কাজ শেষ করে সেখান থেকে চলে গেছে। শেষ অব্দি হত্যার অভিযোগে তাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু লোকটা দেশ থেকে পালিয়ে অ্যামেরিকায় চলে যায় এবং সেখান থেকে সুইডেন হয়ে অবশেষে বার্লিনে গিয়ে পেঁছোয়। সেখানে সে ইউরোপে নিয়ে যাওয়া দেশীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আনুগত্য বিনষ্ট করাব পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিলো। এই পুরো বিষয়টাই কোনো রকম মন্তব্য বা ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে নিতান্ত নীরস ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বর্ণনার হিমকাঠিন্য থেকেই মানুষটার রহস্য, রোমাঞ্চ, এক চুলের জন্যে পরিত্রাণ, এবং বিপজ্জনক-ভাবে বিপদের মোকাবিলা—স্পষ্ট অনুভব করা যায়। প্রতিবেদনের শেষ অংশে বলা হয়েছে, ভারতে চন্দ্রালালের স্ত্রী এবং দুটি সন্তান আছে। মেয়েদের সম্পর্কে তার কোনো রকম দুর্বলতা আছে বলে জানা যায়নি। মদ বা ধূমপানে তার আসক্তি নেই। যতোদূর জানা গেছে, মানুষটা সৎ। তার হাত দিয়ে প্রচুর অর্থের লেনদেন হয়েছে, কিন্তু সে সেই অর্থের যথাযথ (!) ব্যবহার করেনি বলে কখনও কোনো রকম প্রশ্ন ওঠেনি। মানুষটা নিঃসন্দেহে সাহসী এবং কঠিন পরিশ্রমী। নিজের কথা রাখার ব্যাপারে মানুষটা নাকি ভীষণ অহঙ্কারী।

র—কে কাগজপত্রগুলো ফিরিয়ে দিলো অ্যাশেনডেন।

'কি বুঝলে ?'

'লোকটা একটা গোঁয়ার।' অ্যাশেনডেনের ধারণা, লোকটা কিছু পরিমাণে রোম্যান্টিক এবং আকর্ষণীয়। কিন্তু সে জানে, র—তার মুখ থেকে ওই ধরনের কোনো অর্থহীন কথা শুনতে চান না। তাই সে বললো, 'মনে হচ্ছে ভীষণ বিপজ্জনক লোক।'

'ভারতবর্ষের ভেতরে এবং বাইরে ও হচ্ছে সব চাইতে বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র-কারী। অন্য সবাই একসঙ্গে যতোটা করেছে, ও একা তার চাইতে অনেক বেশি ক্ষতি করেছে। বার্লিনে এই সমস্ত ভারতীয়দের একটা দুষ্টচক্র আছে এবং এই লোকটা হচ্ছে তাদের মাথা। ওকে যদি এই দলটা থেকে আলাদা করে ফেলা যায়, তাহলে অন্যদের আমি সহজেই উপেক্ষা করে চলতে পারবো। একমাত্র ওরই কিছু করে ফেলার মতো ক্ষমতা আছে। এক বছর ধরে আমি ওকে ধরতে চেষ্টা করছি। ভেবেছিলাম, আর কোনো আশা নেই। কিন্তু অবশেষে এবারে একটা সুযোগ পেয়েছি এবং ঈশ্বরের কৃপায় সুযোগটা আমি নেবো।'

'তারপর কি করবেন ?'

রু—বিষণ্ণ ভঙ্গিতে হাসলেন, 'লোকটাকে গুলি করবো এবং দ্রুত গুলি করবো।'

'অ্যাশেনডেন কোনো জবাব দিলো না। ছোট্ট ঘরটাতে দু-একবার পায়চারি করে রু—ফের তাপচুল্লিটাকে পেছনে রেখে অ্যাশেনডেনের মুখোমুখি হলেন। ব্যঙ্গের মৃদু হাসিতে তাঁর কৃশ মুখখানা কুঁচকে উঠেছে।

'তোমাকে যে প্রতিবেদনটা দেখালাম, তার শেষের দিকে কি লেখা ছিলো লক্ষ্য করেছো? সেখানে ছিলো, মেয়েদের সম্পর্কে লোকটার কোনো রকম দুর্বলতা আছে বলে জানা যায়নি। হ্যাঁ, এক সময় সেটা সঠিক ছিলো—কিন্তু এখন আর তা নেই। হতচ্ছাড়াটা প্রেমে মজেছে।' ব্যাগ থেকে হালকা নীল ফিতেয় বাঁধা একতাড়া চিঠি বের করে রু—বললেন, 'এই দ্যাখো, এগুলো তার লেখা প্রেমপত্র। তুমি তো উপন্যাস-টুপন্যাস লেখো, এগুলো পড়লে তুমি হয়তো মজা পাবে। আসলে এগুলো তোমার পড়া দরকার, পরিস্থিতিটার মোকাবিলায় এগুলো তোমাকে সাহায্য করবে। এগুলো তুমি নিয়ে যাও।' পরিপাটি করে বাঁধা চিঠির ছোট্ট তাড়াটা উনি ফের ব্যাগের মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন, 'ওর মতো একটা সক্রিয় মানুষ যে কি করে একটা মেয়েছেলের মোহে নিজেকে ডুবিয়ে দিলো, তা ভাবতে অবাক লাগে। ওর কাছ থেকে এটা আমি একেবারেই প্রত্যাশা করিনি।'

অ্যাশেনডেন মুখে কিছু বললো না। তার চোখ দুটো আবার টেবিলে রাখা সুন্দর গোলাপগুলোর দিকে ফিরে গেলো। সে বুঝতে পারছিলো রু—য়ের জিগেস করতে ইচ্ছে করছে, ওদিকে তাকিয়ে সে কি দেখছে। ওই মুহূর্তে রু—য়ের মনে তার অধীনস্থ কর্মচারিটির সম্পর্কে কোনো প্রীতিময় অনুভূতি ছিলো না, কিন্তু তিনিও কোনো মন্তব্য না করে পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন।

'যাকগে, লোকটার হদিশ কোথাও নেই। তবে সে জুলিয়া লাজারি নামে একটা মেয়েছেলের প্রেমে পড়েছে। ওর জন্যে সে পাগল।'

'মহিলাটিকে সে কি করে গেঁথে তুললো, জানেন?'

'জানি বই কি! মেয়েটা নর্তকী। স্প্যানিশ নাচ নাচে, তবে আসলে ও ইতালিয়। মঞ্চের জন্যে নাম নিয়েছে, লা মালাগুইনা। গত দশ বছর ধরে ও ইউরোপের সর্বত্র নেচে বেড়াচ্ছে।'

'ভালো নাচে?'

'না, অখাদ্য। সপ্তাহে কোনোদিনই দশ পাউণ্ডের বেশি রোজগার করতে পারেনি। বার্লিনের একটা সস্তা মজলিশে চন্দ্রার সঙ্গে ওর দেখা হয়। আমার ধারণা ও মনে করতো, নাচলে বেশ্যাবৃত্তিতে ওর দর বাড়বে।'

'যুদ্ধের সময় ও বার্লিনে গেলো কি করে?'

'এক সময় ও একজন ইসপাহানিকে বিয়ে করেছিলো। যদিও ওরা একসঙ্গে থাকে না, কিন্তু আমার ধারণা বিয়েটা এখনও বহাল আছে। স্প্যানিশ

পাসপোর্ট নিয়েই ও যাতায়াত করতো। মনে হয় চন্দ্রাই ওকে শিহ্বু করে তুলেছিলো।' চিন্তিত ভঙ্গিতে র—ফের চন্দ্রার ছবিটা তুলে নিলেন, 'এই তেল-চকচকে নিগারটাকে তুমি নিশ্চয়ই আকর্ষণীয় বলে মনে করছো না? ওহ্ ঈশ্বর, কি করে যে এরা মোটা হয়! কিন্তু তবু বাস্তব ঘটনা এই যে চন্দ্রা ওকে যতোটা ভালোবেসেছে, মেয়েটাও ওকে প্রায় ততোটাই ভালোবেসে ফেলেছে। মেয়েটার লেখা চিঠিগুলোও আমার কাছে আছে—আসল চিঠি-গুলোর অনুলিপি। আসল চিঠিগুলো চন্দ্রার কাছে রয়েছে এবং আমার ধারণা ও সেগুলোকে হালকা গোলাপী রঙের ফিতে দিয়ে বেঁধে রাখে। চন্দ্রার জন্যে মেয়েছেলেটা একেবারে পাগল। আমি সাহিত্যের লোক নই, কিন্তু কোনটা আসল সত্য তা বোধহয় আমি বুঝতে পারি। যাই হোক, তুমি তো চিঠিগুলো পড়বে—তুমিই বোলো, ওগুলো পড়ে তোমার কি মনে হলো। অথচ লোকে বলে, প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম বলে কোনো পদার্থই নাকি হয় না!'

র—ঈষৎ বিদ্রূপের ভঙ্গিতে মৃদু হাসলেন। আজ উনি নিঃসন্দেহে খোশ মেজাজেই আছেন।

'কিন্তু আপনি কি করে এই চিঠিগুলো হস্তগত করলেন?'

'কি করে করলাম? তোমার কি মনে হয়? জাতে ইতালিয় হওয়ার জন্যে শেষ অব্দি জুলিয়া লাজারিকে জার্মানি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ও তখন ওলন্দাজ সীমান্তে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ইংলন্ডে নাচের জন্যে একটা আমন্ত্রণী চুক্তি পাওয়ায় ওকে সেখানে যাবার ভিসা মঞ্জুর করা হয়। এবং—' কাগজপত্রে তারিখটা দেখে নিয়ে র—বললেন, 'গত অক্টোবরের চব্বিশ তারিখে ও রটারডাম থেকে জাহাজে চেপে হারউইচের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সেই থেকে ও লন্ডন, বার্মিংহ্যাম, পোর্টস্‌মাউথ এবং আরও নানান জায়গায় নাচের অনুষ্ঠান করেছে। পনেরো দিন আগে হালে ওকে গ্রেফতার করা হয়'।

'কিসের জন্যে?'

'গুপ্তচরবৃত্তি। ওকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি নিজে হলোওয়েতে ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

'ধরলেন কি করে?'

'জার্মানরা কয়েক সপ্তাহ ধরে বার্লিনে ওকে নিরুপদ্রবে নাচের অনুষ্ঠান করতে দিয়ে, হঠাৎ তেমন বিশেষ কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও ওকে দেশ থেকে বের করে দেবার সিদ্ধান্ত নিলো—এটা আমার কাছে কেমন যেন অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিলো। মনে হয়েছিলো, এটা গুপ্তচরবৃত্তির একটা সুন্দর সূচনা হতে পারে। একজন নর্তকী, যে নিজের নৈতিকতা সম্পর্কে খুব একটা সতর্ক নয়, সে এমন অনেক কথাই জানার সুযোগ তৈরি করে নিতে পারে যেগুলো বার্লিনে কোনো কোনো ব্যক্তির কাছে খুবই মূল্যবান এবং সেই সমস্ত খবরের জন্যে তারা জুলিয়াকে ভালো দামও দিতে পারে। ভাবলাম,

ওকে ইংলণ্ডে আসতে দিলে ভালোই হবে—দেখা যাক ওর উদ্দেশ্যটা কি। তারপর দেখলাম, ও সপ্তাহে দু-তিন বার হল্যাণ্ডের একটা ঠিকানায় চিঠি পাঠায় এবং সপ্তাহে দু-তিন বার হল্যান্ড থেকে ওর চিঠির জবাব আসে। ওর লেখা চিঠিগুলো ফরাসী জার্মান এবং ইংরেজী ভাষার এক বিচিত্র জগাখিচুড়ি। ইংরাজীটা ও একটু একটু বলতে পারে, ফরাসীটা বেশ ভালোই বলে—অথচ ওর কাছে যে চিঠিগুলো আসে সেগুলো পুরোপুরি ইংরেজীতে লেখা। দিব্যি সুন্দর ইংরেজী, তবে ইংরেজদের ইংরেজী নয়—অতিরিক্ত সাজানো গোছানো-অলঙ্কৃত ইংরেজী। ভাবতে লাগলাম, ওগুলো কে লিখতে পারে। সাধারণ প্রেমপত্র বলে মনে হলেও একদিক দিয়ে ওগুলো ভীষণ গরমাগরম মশলাদার। সহজেই বোঝা যায় চিঠিগুলো জার্মানি থেকে আসছে, কিন্তু ওগুলোর লেখক কোনো ইংরেজ ফরাসী বা জার্মান নয়। চিঠিগুলো ইংরেজীতে লেখা হবে কেন? বিদেশীদের মধ্যে একমাত্র প্রাচ্যের মানুষই অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার চাইতে ইংরেজীটা বেশি ভালোভাবে জানে। তুরস্ক বা মিশরের লোক নয়, কারণ তারা ফরাসী ভাষা জানে। কিন্তু লোকটা জাপানের অধিবাসী হলে সে ইংরেজীতেই লিখবে, ভারতীয় হলেও তাই। আমার মনে হলো, বার্লিনে ভারতীয়দের যে দুষ্টচক্রটা আমাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে, জুলিয়ার প্রেমিক তাদের মধ্যেই একজন। কিন্তু লোকটা যে চন্দ্রালাল, তা ছবিটা না পাওয়া অব্দি আমি ভাবতেই পারিনি।'

'ছবিটা কি করে পেলেন?'

'ওটা ওর সঙ্গে সঙ্গেই থাকতো। নাটকের গায়ক, ভাঁড় আর মল্লবীরদের এক গাদা ছবির সঙ্গে ওটাও ওর তোরঙ্গে চাবি লাগানো থাকতো। ওই ছবিটাও মঞ্চের পোশাক পরা একজন শিল্পীর ছবি হিসেবে দিব্যি চালিয়ে দেওয়া যেতো। সত্যি বলতে কি, পরে ওকে গ্রেফতার করে যখন জিগেস করা হয় ছবির লোকটা কে—তখন ও বলেছিলো, লোকটা কে তা ও জানে না। এক ভারতীয় জাদুকর নাকি ওকে ছবিটা দিয়েছিলো এবং তার নামটা কি, সে সম্পর্কে ওর কোনো ধারণাই নেই। যাই হোক, আমি একটি প্রচণ্ড চালাক চতুর ছেলেকে কাজটা চাপিয়ে দিলাম। সে আবিষ্কার করলো, সমস্ত ছবিগুলোর মধ্যে একমাত্র ওই ছবিটাই কলকাতা থেকে এসেছে এবং এ ব্যাপারটা তার কাছে খানিকটা বিচিত্র বলে মনে হলো। সে আরও লক্ষ্য করলো, ছবির পেছন দিকে একটা নম্বর লেখা রয়েছে। ওটা সে নিয়ে নিলো—মানে আমি নম্বরটার কথা বলছি—আর ছবিটাকে অবশ্যই যথারীতি তোরঙ্গে রেখে দিলো।'

'এই প্রসঙ্গে নেহাৎ জানার আগ্রহ হচ্ছে বলেই জিগেস করছি, আপনার সেই প্রচণ্ড চালাক-চতুর ছোকরাটি ছবিটার খোঁজ পেলো কি করে?'

র—য়ের চোখ দুটো ঝিকমিকিয়ে উঠলো, 'সেটা জানার কোনো প্রয়োজন তোমার নেই। তবে তোমাকে জানাতে আমার কোনো আপত্তিও নেই—

ছেলেটা দেখতে শুনতেও ভালো ছিলো। যাই হোক, সেটা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। ছবির নম্বর পেয়েই আমরা কলকাতায় তার করে দিলাম এবং সামান্য কিছু দিনের মধ্যেই জেনে ধন্য হলাম যে জুলিয়ার প্রেমপত্রটি স্বয়ং চন্দ্রালাল ছাড়া আর কেউ নয়—যে কিনা সততা আর ন্যায়পরায়ণতায় সর্বদা অটল থাকে। তখন আমার মনে হলো, জুলিয়ার দিকে আরও একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখা আমার কর্তব্য। দেখলাম, নৌ-বিভাগের অফিসারদের সঙ্গে ও একটু ঢলাঢলি করতে ভালোবাসে। অবিশ্যি এ জন্যে আমি ওকে ঠিক দোষ দিতে পারিনি। ওরা আকর্ষণীয় চেহারার মানুষ। তবে কিনা যুদ্ধের সময় নৈতিকতাবর্জিত ও সন্দেহজনক পরিচয়ের কোনো মহিলার পক্ষে ওদের ওই সমাজে মেলামেশা করাটা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। সামান্য কয়েক দিনের মধ্যেই আমি ওর বিরুদ্ধে একটা চমৎকার প্রমাণ পেয়ে গেলাম।'

'খবরগুলো ও বাইরে পাঠাতো কি করে?'

'পাঠাতো না। পাঠাবার কোনো চেষ্টাও করতো না। জার্মানরা ওকে সত্যি সত্যিই তাড়িয়ে দিয়েছিলো। ও জার্মানদের হয়ে কাজ করতো না, কাজ করতো চন্দ্রার হয়ে। ইংলণ্ডে কাজ মেটার পর ও আবার হল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে চন্দ্রালালের সঙ্গে মিলিত হবার পরিকল্পনা করছিলো। এ ধরনের কাজের পক্ষে ও খুব একটা চালাক চতুর নয়, আসলে ও খানিকটা ভীতু। কিন্তু ক্রমশ ব্যাপারটা ওর কাছে সহজ বলে মনে হচ্ছিলো। ও ভাবছিলো, কেউই ওকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। আস্তে আস্তে কাজটা ওর কাছে রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে। বিনা ঝুঁকিতেই ও সমস্ত রকমের আগ্রহজনক খবরাখবর পেতে থাকে। একটা চিঠিতে ও লিখেছিলো, 'তোমাকে আমার অনেক কিছু বলার আছে, সোনা। এমন অনেক কথা, যা জানার জন্যে তুমি ভীষণ আগ্রহী হয়ে উঠবে'। শেষের শব্দ কটা ফরাসী ভাষায় লিখে, ও তার নিচে দাগ টেনে দিয়েছিলো।'

কথা থামিয়ে র—নিজের হাত ঘষলেন। নিজের ধূর্ততায় তাঁর ক্লান্ত মুখখানাতে এক দানবীয় আহ্লাদের আভাস ফুটে উঠলো।

'এটা হচ্ছে সহজ পদ্ধতিতে গুপ্তচরবৃত্তি। মেয়েছেলেটার জন্যে আমার অবিশ্যি একটুও মাথাব্যথা ছিলো না, আমার আসল লক্ষ্য ছিলো চন্দ্রালাল। যাই হোক, প্রমাণ হাতে আসা মাত্র আমি মেয়েছেলেটাকে আটক করলাম। আর প্রমাণ যা পেয়েছিলাম তা একটা কেন, এক রেজিমেণ্ট গুপ্তচরকে সাজা দেবার পক্ষে যথেষ্ট।' র—নিজের হাত দুটোকে পকেটে পুরলেন। মৃদু হাসিতে তাঁর ফ্যাকাশে ঠোঁট দুটো কুঁচকে বিকৃত হয়ে উঠলো। তারপর বললেন, 'জানোই তো, হলোওয়ে খুব একটা জমাটি জায়গা নয়!'

'আমার ধারণা, কোনো জেলখানাই তেমন নয়।'

'একটা সপ্তাহ মাগীকে নিজের রসে সিদ্ধ হবার মতো সময় দিয়ে, আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তখন ওর স্নায়ুগুলোর একেবারে করুণ

অবস্থা। কারারক্ষিণী জানালো, অধিকাংশ সময়টা ও হিস্টিরিয়া রোগীর মতো চরম তাণ্ডব করে কাটিয়েছে। স্বীকার করছি, তখন ওকে একটা শয়তানির মতো দেখাচ্ছিলো।'

'ও কি দেখতে সুন্দরী ?'

'তা তুমি নিজেই দেখতে পাবে। তবে আমার মনপসন্দ নয়। প্রসাধন ব্যবহার করলেও ওকে দেখতে খানিকটা ভালো লাগবে কিনা, বলতে পারছি না। একজন ওলন্দাজ খুড়োর মতো আমি ওর সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। ওকে ঈশ্বরের ভয় দেখালাম। বললাম, ওর দশ বছরের সাজা হয়ে যাবে। মনে হলো আমি ওকে ভয় দেখাতে পেরেছি—আসলে সেই চেষ্টাটাই আমি করছিলাম। ও অবিশ্যি সমস্ত কিছুই অস্বীকার করলো। কিন্তু আমার হাতে প্রমাণ আছে। বললাম, ছাড়া পাবার কোনো আশাই ওর নেই। তিনটি ঘণ্টা আমি ওর সঙ্গে কাটিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত ওর সমস্ত প্রতিরোধ চুরমার হয়ে ভেঙে পড়লো, সমস্ত অভিযোগই ও স্বীকার করে নিলো। তখন আমি বললাম, ও যদি চন্দ্রাকে ফ্রান্সে আনতে পারে তাহলে আমি ওকে বিনা শর্তে ছেড়ে দেবো। প্রস্তাবটা ও সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করলো। বললো, মরলেও ও তা করবে না। ও তখন উন্মাদের মতো আচরণ করছিলো। তবু আমি ওকে প্রস্তাবটা ভেবে দেখতে বললাম এবং আরও বললাম যে এই প্রসঙ্গে ফের আলোচনা করার জন্যে দু-একদিনের মধ্যে আমি ফের ওর সঙ্গে দেখা করবো। কিন্তু আসলে তারপর পুরো একটা সপ্তাহ আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। স্পষ্টতই ও ততোদিনে চিন্তা-ভাবনা করার মতো যথেষ্ট সময় পেয়েছিলো, কারণ আমি ফের ওর কাছে যেতেই ও রীতিমতো শান্তভাবে জানতে চাইলো আমার সঠিক প্রস্তাবটা কি। ইতিমধ্যে পনেরোটা দিন ও কয়েদখানায় কাটিয়েছে এবং আমার ধারণা সেটা ওর পক্ষে যথেষ্ট। তাই আমি যথাসম্ভব সাদা ভাষায় ওকে প্রস্তাবটা জানালাম এবং ও তা মেনে নিলো।'

'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে না,' অ্যাশেনডেন বললো।

'বোঝোনি ? আমি তো ভেবেছিলাম যার ঘটে সামান্যতম বুদ্ধি আছে, সে-ই এটা জলের মতো বুঝতে পারবে ! জুলিয়া যদি চন্দ্রাকে রাজি করাতে পারে, জুলিয়ার কথায় চন্দ্রা যদি সুইস সীমান্ত পার হয়ে ফ্রান্সে এসে ঢোকে —তাহলেই জুলিয়া মুক্তি পেয়ে স্পেন বা দক্ষিণ আমেরিকায় চলে যেতে পারবে এবং ওর যাবার ভাড়াও দিয়ে দেওয়া হবে।'

'কিন্তু ও চন্দ্রাকে দিয়ে তা কি করে করাবে ?'

'লোকটা ওকে পাগলের মতো ভালোবাসে, ওকে দেখতে চায়। ওকে লেখা তার চিঠিগুলো তো প্রায় খেপামিকেই বোঝাই। মেয়েটা তাকে লিখে জানিয়েছে যে ও হল্যাণ্ডে যাবার ভিসা পাবে না, (তোমাকে তো আমি

বলেছি, সফর শেষ করে মেয়েটার সেখানে গিয়েই চন্দ্রার সঙ্গে মিলিত হবার কথা ছিলো) তবে সুইৎজারল্যাণ্ডের ভিসা পেতে পারে। সুইৎজারল্যাণ্ড নিরপেক্ষ দেশ, চন্দ্রা সেখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ। চন্দ্রা এই সুযোগটা পেয়ে লাফিয়ে উঠেছে এবং লুসার্নে ওরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা করবে বলে বন্দোবস্ত করে ফেলেছে।'

'বেশ।'

'কিন্তু লুসার্নে পেঁৗছে চন্দ্রা জুলিয়ার কাছ থেকে এই মর্মে একটা চিঠি পাবে যে ফরাসী কর্তৃপক্ষ ওকে সীমান্ত পার হতে দেবে না এবং তাই ও থনোঁতে চলে যাচ্ছে। থনোঁ জায়গাটা লুসার্নের হ্রদটার ঠিক বিপরীত দিকে, ফ্রান্সের মধ্যে। জুলিয়া চন্দ্রাকেও সেখানে যেতে লিখবে।'

'কিন্তু লোকটা যে তাই করবে, তা আপনি ভাবছেন কি করে?'

র— মুহূর্তের জন্যে নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। তারপর এক মনোহর অভিব্যক্তি নিয়ে অ্যাশেনডেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জুলিয়া যদি দশ বছর জেল খাটতে না চায় তাহলে চন্দ্রাকে ও সেখানে যেতে রাজি করাবে।'

'অ।'

'আজ সন্ধ্যাবেলায় জুলিয়া পুলিস প্রহরায় ইংলণ্ড থেকে এখানে এসে পেঁৗছুচ্ছে এবং আমার ইচ্ছে, তুমি আজই রাতের ট্রেনে ওকে থনোঁতে নিয়ে যাবে।'

'আমি?'

'হ্যাঁ, আমার ধারণা এ ধরনের কাজ তুমি খুব ভালোভাবেই করতে পারবে। অধিকাংশ লোকের চাইতে মানুষের প্রকৃতি তোমার অনেক বেশি বোঝার কথা। দু-এক সপ্তাহ থনোঁতে কাটানো তোমার পক্ষে একটা মনোরম পরিবর্তনও হবে। আমার বিশ্বাস ওটা একটা ছোট্টখাট্ট সুন্দর জায়গা এবং কায়দাদুরস্তও বটে—মানে শান্তির সময়। ওখানে তুমি স্নানটানও করতে পারবে।'

'মহিলাটিকে পেৌঁছে দিয়ে আমি সেখানে কি করবো বলে আপনি প্রত্যাশা করেন?'

'যা ইচ্ছে হয় করবে। আমি কতকগুলো তথ্য লিখে রেখেছি, সেগুলো তোমার কাজে লাগতে পারে। আমি বরং সেগুলো তোমাকে পড়ে শোনাই, কেমন?'

অ্যাশেনডেন মন দিয়ে শুনলো। র—য়ের পরিকল্পনাটা সহজ এবং সুস্পষ্ট। যে মাথা থেকে এমন নিখুঁত একটা পরিকল্পনা বেরিয়েছে, অ্যাশেনডেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনে মনে তার প্রশংসা না করে পারলো না। একটু বাদেই র—খেতে যাবার কথা বললেন। অ্যাশেনডেনকে উনি এমন কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে বললেন, যেখানে গেলে উনি কিছু সপ্রতিভ মানুষ দেখতে পাবেন। নিজের অফিসের— অমন তীক্ষ্ণ, আত্মপ্রত্যয়ী এবং সতর্ক—

অথচ রেস্তোরাঁয় ঢোকার সময় সেই মানুষটাকেই লজ্জায় জড়োসড়ো হতে দেখে অ্যাশেনডেন খুব মজা পেলো। নিজেকে সহজ স্বাভাবিক বলে দেখাবার প্রচেষ্টায় উনি একটু উঁচু গলায় কথা বললেন, অপ্রয়োজনে নিজেকে আরও বেশি সহজ করে তোলার চেষ্টা করলেন। এমন একটা কেতাদুরস্ত রেস্তোরাঁয় এতোগুলো বিশিষ্ট মানুষের মাঝখানে এসে তাঁর আনন্দ হচ্ছিলো। কিন্তু নিজেকে তাঁর প্রথমবার উঁচু-টুপি-পরা একটা স্কুলের বালকের মতো লাগছিলো, প্রধান পরিচারকের ইস্পাতের মতো দৃষ্টির সামনে তিনি রীতিমতো অবসন্ন বোধ করছিলেন। অ্যাশেনডেন কালো পোশাক পরা এক মহিলার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। মহিলা দেখতে কুৎসিত, কিন্তু শরীরের গড়নটা ভারি সুন্দর, গলায় লম্বা এক ছড়া মুক্তোর মালা।

'উনি মাদাম দে ব্রিদে, গ্রান্ড ডিউক থিওডোরের প্রেয়সী। সম্ভবত এখন উনি ইউরোপের অন্যতম প্রভাবশালী মহিলা এবং নিঃসন্দেহে সব চাইতে চতুর মহিলাদের মধ্যে একজন।'

র—য়ের দৃষ্টি মহিলাটির দিকে স্থির হলো এবং উনি সামান্য আরক্তিম হয়ে উঠলেন।

অ্যাশেনডেন কৌতূহলভরে র—কে লক্ষ্য করছিলো। খাওয়াদাওয়ার পর কফি পান করতে করতে সে দেখলো, সুখাদ্য এবং সুরম্য পরিবেশের গুণে মানুষটা দিব্যি প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। তাই এতোক্ষণ তার মাথায় যে চিন্তাটা ঘুরপাক খাচ্ছিলো, এবারে সে সেই পুরনো বিষয়টাই তুলে বললো, 'ওই ভারতীয়টির মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু বৈশিষ্ট্য আছে?'

'লোকটার মাথা আছে—অবশ্যই।'

'যে লোকটা—বলতে গেলে প্রায় একাই—ভারতবর্ষের পুরো ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো সাহস রাখে, সে মানুষকে মুগ্ধ করবেই।'

'তোমার জায়গায় থাকলে, আমি কিন্তু লোকটার সম্পর্কে অমন গদোগদো হয়ে উঠতাম না। ও একটা সাংঘাতিক ধরনের দুষ্কৃতকারি, তা ছাড়া আর কিচ্ছু না।'

'ও যদি গোটাকতক গোলন্দাজ আর আধ ডজন স্থলবাহিনীকে হুকুম দেবার মতো পরিস্থিতিতে থাকতো, তাহলে বোধহয় ওই বোমাটোমাগুলো আর ব্যবহার করতো না। ও যে অস্ত্র পায় তা-ই ব্যবহার করে, এজন্যে আপনি ওকে দোষ দিতে পারেন না। হাজার হোক নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে লোকটা কিছু করছে না—তাই নয় কি? ওর উদ্দেশ্য, ওর নিজের দেশকে স্বাধীন করা। এদিক দিয়ে ভাবতে গেলে কিন্তু মনে হয়, ও কোনো অন্যায় করছে না।'

অ্যাশেনডেন যা বলতে চাইছিলো সে সম্পর্কে র—য়ের কোনো ধারণাই ছিলো না। তিনি বললেন, 'ওসমস্ত অনেক কষ্টকল্পিত এবং অস্বাস্থ্যকর চিন্তাধারা। আমরা ওর মধ্যে যেতে পারি না। আমাদের কাজ হচ্ছে

লোকটাকে হাতে পাওয়া এবং পেলেই তাকে গুলি করা।'

'অবশ্যই। সে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, অতএব ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে। আমিও আপনার নির্দেশ পালন করবো এবং সেই কারণেই আমি এখানে এসেছি। কিন্তু তাই বলে লোকটার মধ্যে যে প্রশংসা আর শ্রদ্ধা করার মতো কিছু কিছু ব্যাপার রয়ে গেছে, এটা মেনে নিতে কি এমন ক্ষতি—আমি বুঝতে পারছি না।'

'আমি এখনও স্থির করে উঠতে পারিনি, এ ধরনের কাজ করার পক্ষে কারা বেশি উপযুক্ত—যারা আবেগের বশবর্তী হয়ে কাজটা করবে তারা, না কি যারা মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজটা সারবে তারা। যারা আমাদের বিরুদ্ধাচারী কেউ কেউ তাদের এতো ঘেন্না করে যে এ ধরনের কাজ দেওয়া হলে তারা এক অদ্ভুত পরিতৃপ্তি পায়—অনেকটা ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করার মতো তৃপ্তি। নিজেদের কাজের ব্যাপারে এরা অবশ্যই খুব ব্যগ্র। কিন্তু তুমি অন্য ধরনের, তাই না? কাজ তোমার কাছে দাবা খেলার মতো এবং কাজের পক্ষে বা বিপক্ষে তোমার মনে কোনো অনুভূতিই আছে বলে মনে হয় না। আমি এটা ঠিক বুঝতে পারি না। অবিশ্যি কিছু কিছু কাজের ক্ষেত্রে এটাই বাঞ্ছনীয়।'

অ্যাশেনডেন কোনো জবাব দিলো না। রেস্তোরাঁর টাকা মিটিয়ে র—য়ের সঙ্গে সে পায়ে পায়ে হোটেলে ফিরে গেলো।

আটটার সময় ট্রেন ছাড়লো। তার আগে ব্যাগটা রেখে প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁটতে হাঁটতে অ্যাশেনডেন একটা কামরায় জুলিয়া লাজারিকে দেখতে পায়। কিন্তু জুলিয়া একটা কোণে বসেছিলো, মুখটাও ছিলো আলোর বিপরীত দিকে। তাই অ্যাশেনডেন ওর মুখটা দেখতে পায়নি। ও যে দুজন গোয়েন্দার হেফাজতে রয়েছে, তারাই বুলোঁয় ইংরেজ পুলিসদের কাছ থেকে ওকে নিয়ে এসেছে। ওদের একজনের সঙ্গে আশেনডেন লেক জেনিভার ফরাসী অংশে কাজ করেছে। অ্যাশেনডেনকে এগিয়ে আসতে দেখেই সে ঘাড় নেড়ে বললো, 'মহিলাটিকে আমি জিগেস করেছিলাম, উনি রেস্তোরাঁ-কামরায় গিয়ে খাবেন কি না। কিন্তু উনি নিজের কামরায় বসেই খেতে চান। তাই আমি একটা থালির ফরমাশ দিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে তো?'

'ঠিক আছে।'

'আমার সঙ্গী আর আমি পালা করে খেতে যাবো, যাতে ওঁকে একা থাকতে না হয়।'

'খুবই বিচক্ষণতার কথা। ট্রেনটা চলতে শুরু করলেই আমি এসে ওঁর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলে যাবো।'

'বেশি কথাবার্তা বলার দিকে ওঁর কোনো ঝোঁকই নেই।'

'সেটা আশাও করা যায় না।'

এরপর অ্যাশেনডেন নিজের কামরায় ফিরে যায়। ফের যখন সে ওদের কামরায় গেলো তখন জুলিয়া লাজারি সবেমাত্র খাওয়া শেষ করছে। থালির দিকে এক ঝলক তাকিয়েই অ্যাশেনডেন বুঝতে পারলো, খুব একটা অক্ষুধা নিয়ে ও খায়নি। অ্যাশেনডেনের ইঙ্গিতে পাহারাদার গোয়েন্দাটি ইতিমধ্যে তাকে কামরার দরজাটা খুলে দিয়েই অন্যত্র চলে গিয়েছিলো। জুলিয়া লাজারি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। অ্যাশেনডেন ওর মুখোমুখি বসে বললো, 'আশা করি আপনি যা খেতে চেয়েছিলেন তা-ই পেয়েছেন।'

জুলিয়া মাথাটা সামান্য নোয়ালো, কিছু বললো না।

অ্যাশেনডেন তার সিগারেট-কেসটা বের করলো, 'একটা সিগাটে নেবেন?'

চকিতে জুলিয়া তার দিকে এক ঝলক তাকালো, যেন একটু ইতস্তত করলো, তারপর বিনা বাক্যব্যয়েই একটা সিগারেট তুলে নিলো। দেশলাইয়ের কাঠি ঠুকে ওকে সিগারেটটা ধরিয়ে দিয়ে, অ্যাশেনডেন ওর দিকে তাকালো এবং অবাক হয়ে গেলো। যে কোনো কারণেই হোক, মহিলার গায়ের রঙটা ফর্সা হবে বলেই সে আশা করেছিলো। হয়তো তার ধারণা ছিলো, প্রাচ্য জগতের পুরুষের পক্ষে কোনো স্বর্ণকেশী গৌরাঙ্গীর প্রেমে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু মহিলাকে প্রায় কালোই বলা চলে। চুলগুলো একটা আঁটসাঁট টুপির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে, কিন্তু ওর চোখগুলো একেবারে কুচকুচে কালো। বয়সে আদৌ তরুণী নয়, নিশ্চয়ই বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস হবে। গায়েব চামড়া রেখাঙ্কিত এবং পাণ্ডুর। ওই মুহূর্তে ওর মুখে কোনো প্রাসাধনের স্পর্শ ছিলো না এবং দেখতেও বেশ বাজে লাগছিলো। শুধু অপরূপ চোখ দুটি ছাড়া ওর মধ্যে সৌন্দর্য বলতে কোনো পদার্থই নেই। চেহারাটা বড়োসড়ো এবং অ্যাশেনডেনের মনে হলো সুচারু ভঙ্গিমায় নাচার পক্ষে ওর চেহারাটা বড্ড বিশাল। হয়তো ইসপাহানি নাচের পোশাকে ওকে অনেক দুঃসাহসী আর জমকালো দেখায়, কিন্তু ট্রেনের মধ্যে ওই মলিন পোশাকে ওকে দেখে ওর জন্যে ওই ভারতীয়টির বুদ্ধিভ্রংশ হবার কোনো কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। মূল্য যাচাই করে নেবার দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ অ্যাশেনডেনের দিকে তাকিয়ে রইলো ও। নিশ্চয়ই ভাবলো, অ্যাশেনডেন কি ধরনের মানুষ। নাক দিয়ে এক ঝলক ধোঁয়ার মেঘ ছড়িয়ে একবার তাকিয়ে নিলো সেদিকে। তারপর ফের তাকালো অ্যাশেনডেনের দিকে। অ্যাশেনডেন বুঝতে পারলো, ওর বিষণ্ণতাটা একটা মুখোশ মাত্র—আসলে ও ভীত এবং বিচলিত। ইতালিয় ঝোঁকে •ফরাসী ভাষায় জুলিয়া জিগেস করলো, 'আপনি কে?'

'আমার নাম শুনে আপনার কোনো লাভ হবে না, মাদাম। আমি থনোঁতে যাচ্ছি। সেখানে আপনার জন্যে আমি ওতেল দে লা প্লাসে একটা ঘর নিয়েছি। এখন একমাত্র ওই হোটেলটাই খোলা আছে। আমার ধারণা ঘরটা আপনার কাছে দিব্যি আরামদায়ক বলেই মনে হবে।'

'ও, কর্নেল তাহলে আপনার কথাই আমাকে বলেছিলেন। আপনিই আমার পাহারাদার।'

'ওটা শুধু নিয়মরক্ষার ব্যাপার। আমি আপনার স্বাধীনতায় অনধিকার হস্তক্ষেপ করবো না।'

'কিন্তু তাহলেও, আসলে আপনি আমার পাহারাদার।'

'আশা করি সেটা খুব বেশি দিনের জন্যে নয়। স্পেনে যাবার জন্যে সমস্ত রকম নিয়ম-কানুনের ঝঞ্ঝাট মেটানো অনুমতিপত্র সমেত আপনার পাসপোর্ট-খানা আমার পকেটেই আছে।'

জুলিয়া লাজারি কামরার একেবারে কোণের দিকে সেঁধিয়ে গেলো। মিট-মিটে আলোয় আয়ত দুটি কালো চোখ সহ ওর পাণ্ডুর মুখখানা যেন আচমকা হতাশার মুখোশ হয়ে উঠলো।

'কি ঘেন্না! ওই বুড়ো কর্নেলটাকে খুন করতে পারলে আমি মরেও আনন্দ পেতাম! লোকটার হৃদয় বলে কিছু নেই। এতো খারাপ লাগছে আমার!'

'আমার আশঙ্কা, আপনি একটা ভীষণ দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়েছেন। গুপ্তচরবৃত্তি যে একটা বিপজ্জনক খেলা, আপনি কি তা জানতেন না?'

'আমি অর্থের বিনিময়ে কোনো গুপ্ত-খবর বিক্রি করিনি। কারুর কোনো ক্ষতিও করিনি।'

'নিশ্চয়ই তার একমাত্র কারণ, তেমন কোনো সুযোগ আপনার ছিলো না। শুনেছি আপনি নাকি একটা পূর্ণ স্বীকারোক্তিতে সইও করেছেন।'

অ্যাশেনডেনের কণ্ঠস্বরে এতোটুকুও রূঢ়তা ছিলো না। অনেকটা অসুস্থ মানুষের সঙ্গে কথা বলার মতো, যথাসম্ভব মোলায়েম ও মার্জিত ভঙ্গিতে, কথা বলছিলো সে।

'হ্যাঁ, আমি নিজেই নিজেকে বোকা বানিয়েছি। কর্নেল আমাকে যেভাবে লিখতে বলেছেন, আমি ঠিক তেমনি করেই লিখেছি চিঠিটা। কিন্তু সেটাও কি যথেষ্ট হয়নি? সে যদি চিঠির জবাব না দেয়, তাহলে আমার কি হবে? সে আসতে না চাইলে আমি তো তাকে জোর করে আনতে পারি না!'

'সে জবাব দিয়েছে। জবাবটা আমার সঙ্গেই আছে।'

'ওটা আমাকে একটু দেখান!' আবেগে জুলিয়া লাজারির কণ্ঠস্বর ভেঙে এলো। 'আমি মিনতি করছি, ওটা আমাকে একটু দেখতে দিন!'

'তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে ওটা আমাকে ফেরত দিতে হবে।' অ্যাশেনডেন পকেট থেকে চন্দ্রার চিঠিটা বের করে জুলিয়াকে দিলো। তার হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিলো জুলিয়া। আট পৃষ্ঠার চিঠিটা চোখ দিয়ে ও যেন গোগ্রাসে গিললো। পড়তে পড়তে ওর দু গাল বেয়ে চোখের জল নেমে এলো। ফোঁপাতে ফোঁপাতে উচ্ছ্বাসময় অনেক ছোটো ছোটো

অব্যয় উচ্চারণ করলো ও, ফরাসী আর ইতালিয় ভাষায় অনেক প্রিয় নামে ডাকলো চিঠির লেখককে। র—স্নের নির্দেশ মতো জুলিয়া যে চিঠিতে লিখেছিলো চন্দ্রার সঙ্গে ও স্যুইৎজারল্যাণ্ডে দেখা করবে, এ চিঠি তারই জবাব। ওর সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনায় আনন্দে পাগল হয়ে উঠেছে মানুষটা। আবেগময় ভাষায় সে লিখেছে, শেষবার বিচ্ছিন্ন হবার পর থেকে ইতিমধ্যে যেন কতো দীর্ঘ সময় কেটে গেছে, যেন কতো দীর্ঘ দিন ওকে সে দেখেনি, ওর জন্যে তার প্রাণে কি সুনিবিড় আকুল আর্তি, আর এখন খুব শীগগির ওর সঙ্গে আবার দেখা হবে বলে সে আর কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারছে না। চিঠিটা শেষ-করার পরে সেটা জুলিয়ার হাত থেকে মেঝেতে খসে পড়লো।

'দেখেছেন তো, মানুষটা আমাকে ভালোবাসে? এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিশ্বাস করুন, এ ব্যাপারে আমি খানিকটা বুঝি।'

'আপনি কি সত্যিই তাকে ভালোবাসেন?' জিগেস করলো অ্যাশেনডেন।

'আজ অব্দি একমাত্র ওই মানুষটাই আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে। আমাদের জীবন খুব একটা আনন্দের নয়—ইউরোপের সর্বত্র ওই সমস্ত সঙ্গীতশালায় গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়ানো, বিশ্রাম বলতে কিছু নেই··· আর যে লোকগুলো ওই সমস্ত জায়গায় যায়, তারাও খুব একটা ভালো নয়। চন্দ্রাকে আমি প্রথমে তাদের মতোই একজন বলে মনে করেছিলাম।'

অ্যাশেনডেন তারবার্তাটা তুলে নিয়ে তার পকেট-বইতে রেখে দিলো, 'আপনার নামে হল্যাণ্ডের ঠিকানায় একটা তার পাঠিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে চৌদ্দ তারিখে আপনি লুসার্নের হোটেল গিবনসে থাকবেন।'

'তার মানে আসছে কাল!'

'হ্যাঁ।'

জুলিয়ার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, 'আপনারা আমাকে দিয়ে জোর করে একটা নোংরা কাজ করাচ্ছেন। এটা লজ্জার কথা!'

'এটা করতে আপনি বাধ্য নন।'

'যদি না করি?'

'তাহলে আপনাকেই তার ফল ভোগ করতে হবে।'

'আমি কয়েদখানায় যেতে পারবো না, পারবো না, পারবো না।' আচমকা চিৎকার করে উঠলো জুলিয়া। 'আমার হাতে সময় বড্ড কম। ···উনি বলেছেন, দশ বছর।···আচ্ছা, আমার কি দশ বছরের সাজা হতে পারে?'

'কর্নেল যদি বলে থাকেন, তাহলে তেমন সম্ভাবনা খুবই বেশি।'

'আমি ওঁকে জানি। একটা নিষ্ঠুর মুখ! উনি আমাকে একটুও দয়া করবেন না! দশ বছরে আমার অবস্থাটা কি হবে? না, না!'

ঠিক এই মুহূর্তে ট্রেন একটা স্টেশনে এসে থামলো। করিডোরে দাঁড়ানো গোয়েন্দাটি জানলায় টোকা দিতেই অ্যাশেনডেন কামরার দরজাটা খুলে দিলো। লোকটা অ্যাশেনডেনকে একটা ছবির পোস্টকার্ড দিলো। ছবিটা

ফ্রান্স ও সুইৎজারল্যান্ডের মধ্যবর্তী পঁতারলির একটা ম্যাড়মেড়ে দৃশ্য। ধূলিধূসরিত একটা জায়গা, মাঝখানে একটা পাথরের প্রতিমূর্তি আর কয়েকটা প্লেন গাছ।

অ্যাশেনডেন জুলিয়ার হাতে একটা পেন্সিল তুলে দিলো, 'এই পোস্টকার্ডে আপনি আপনার প্রেমিককে একটা চিঠি লিখুন। এটা পঁতারলিতে ডাকে ফেলা হবে। লুসানের্র হোটেলটার ঠিকানায় লিখবেন।'

জুলিয়া লাজারি অ্যাশেনডেনের দিকে এক ঝলক তাকালো, কিন্তু কোনো জবাব না দিয়ে তার নির্দেশমতোই ঠিকানা লিখলো।

'এবারে অন্য দিকে লিখুন ঃ 'সীমান্তে দেরি হয়েছে, তবে সমস্ত কিছুই ঠিক আছে। লুসানে অপেক্ষা কোরো'। তারপর আপনার যা খুশি হয় লিখুন. ইচ্ছে হলে ভালোবাসাটাসাও জানাতে পারেন।'

পোস্টকার্ডটা ওর কাছ থেকে নিয়ে অ্যাশেনডেন পড়ে দেখলো, চিঠিটা তার নির্দেশমতোই লেখা হয়েছে। এবারে নিজের টুপিটার দিকে হাত বাড়ালো সে, 'আমি তাহলে চলি। আশা করি আপনার সুনিদ্রা হবে। সকালে থনোঁতে পেঁছিলে আমি আপনাকে নিতে আসবো।'

দ্বিতীয় গোয়েন্দাটি ইতিমধ্যে খাওয়াদাওয়া সেরে ফিরে এসেছিলো। অ্যাশেনডেন কামরা থেকে বেরুতেই ওরা দুজনে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। জুলিয়া লাজারি ফের নিজের কোণটিতে গুটিসুটি হয়ে বসলো। অন্য একটি এজেন্ট পোস্টকার্ডটা পঁতারলিতে নিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। অ্যাশেনডেন তাকে পোস্টকার্ডটা দিয়ে জনাকীর্ণ ট্রেনের ভেতর দিয়ে পথ করে তার ঘুমের-কামরার দিকে এগিয়ে গেলো।

পরের দিন সকালেই ওরা গন্তব্যস্থলে পেঁছে গেলো। ঠাণ্ডা থাকলেও দিনটা রোদ-ঝলমলে। জুলিয়া লাজারি আর গোয়েন্দা দুজন প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছিলো। নিজের ব্যাগগুলো একটা কুলির হাতে তুলে দিয়ে অ্যাশেনডেন তাদের দিকে এগিয়ে গেলো।

'সুপ্রভাত।' গোয়ন্দা দুজনের দিকে তাকিয়ে অ্যাশেনডেন ঘাড় নাড়লো, 'আপনাদের আর কষ্ট করে অপেক্ষা করতে হবে না।'

ওরা হাত দিয়ে টুপির কাণা স্পর্শ করলো। তারপর মহিলাটিকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে অন্য দিকে চলে গেলো।

'ওরা কোথায় যাচ্ছে ?' জুলিয়া জিগেস করলো।

'চলে যাচ্ছে। ওরা আর আপনাকে বিরক্ত করবে না।'

'তাহলে আমি কি এখন আপনার হেফাজতে ?'

'আপনি কারুরই হেফাজতে নেই। আমি আপনাকে হোটেলে তুলে দিয়েই বিদেয় হবো। আপনি একটু ভালোমতো বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করবেন।'

অ্যাশেনডেনের কুলিটি জুলিয়ার মালপত্রগুলো তুলে নিলো। জুলিয়া তাকে তোরঙ্গের টিকিটটা দিলো। পায়ে পায়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলো

ওরা। একটা ট্যাক্সি ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো, অ্যাশেনডেন জুলিয়াকে ট্যাক্সিতে উঠতে বললো। হোটেল অনেকটা দূরের পথ। মাঝে-মধ্যেই অ্যাশেনডেন অনুভব করছিলো, মহিলা তার দিকে অপাঙ্গে তাকাচ্ছে। আসলে ও বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে উঠেছিলো। তবু অ্যাশেনডেন কোনো কথা না বলে চুপচাপ বসে রইলো। হোটেলটা ছোট্ট, ছোটোখাটো একটা ময়দানের এক কোণে, চারদিকের দৃশ্যাবলীও সুন্দর। গিয়ে পৌঁছতেই হোটেলের মালিক মাদাম লাজারির জন্যে তৈরি করে রাখা ঘরটা ওদের দেখিয়ে দিলেন।

'আশা করি এতে দিব্যি ভালোভাবেই কাজ চলে যাবে।' অ্যাশেনডেন হোটেল-মালিকের দিকে ফিরে বললো, 'আপনি আসুন, আমি মিনিটখানেকের মধ্যেই নিচে যাচ্ছি।'

ভদ্রলোক মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলেন।

'আপনার সুখ-সুবিধের জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো, মাদাম।' অ্যাশেনডেন বললো, 'এখানে আপনি নিজেই নিজের মালিক। এখানে আপনার যা ইচ্ছে হয়, ফরমাশ করতে পারেন। হোটেল-মালিকের কাছে আপনি আর পাঁচজনের মতো স্রেফ একজন অতিথি মাত্র। আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন।'

'আমি ইচ্ছেমতো বেরুতে পারেবো?' দ্রুত প্রশ্ন করলো জুলিয়া।

'অবশ্যই।'

'দুধারে দুজন পুলিস নিয়ে বোধহয়?'

'মোটেই না। নিজের বাড়িতে আপনি যেমন থাকেন, এই হোটেলেও আপনি তেমনি স্বাধীন। নিজের খুশিমতো আপনি এখান থেকে বেরুতে পারবেন আবার এখানে ফিরে আসতেও পারবেন। তবে আমার অজ্ঞাতে আপনি কোনো চিঠিপত্র লিখবেন না বা আমার বিনা অনুমতিতে আপনি থনোঁ থেকে চলে যাবার চেষ্টা করবেন না—এই আশ্বাসটুকু আমি আপনার কাছ থেকে পেতে চাই।'

জুলিয়া বেশ খানিকক্ষণ অ্যাশেনডেনের দিকে তাকিয়ে রইলো। এ সবের কোনো অর্থই ও বুঝতে পারছিলো না। দেখে মনে হচ্ছিলো, পুরো ব্যাপারটাই ওর কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।

'যে পরিস্থিতিতে আমি রয়েছি তাতে আপনি আমার কাছে যে আশ্বাস চাইবেন, আমি আপনাকে তা-ই দিতে বাধ্য। তবে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনাকে না দেখিয়ে আমি কাউকে কোনো চিঠি লিখবো না বা এখান থেকে চলে যাবারও কোনো চেষ্টা করবো না।'

'ধন্যবাদ। তাহলে আমি এখন চলি। আসছে কাল সকালে ফের আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবো।'

অ্যাশেনডেন ঘাড় নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নেবার জন্যে পাঁচ মিনিটের জন্যে সে

একবার থানায় একটা ঢুঁ মারলো। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে শহরের উপান্তে পাহাড়ের ওপরে ছোট্ট একটা নির্জন বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। মাঝে মধ্যে এই শহরে এলে, সে এই বাড়িটাতেই থাকে। দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে, পায়ে চটিটা গলিয়ে ভারি আরাম লাগলো তার। বেশ আলসেমিও লাগছিলো, সকালের অবশিষ্ট অংশটা তাই সে একটা উপন্যাস পড়েই কাটিয়ে দিলো।

অন্ধকার হবার একটু পরেই থানা থেকে একজন এজেণ্ট অ্যাশেনডেনের সঙ্গে দেখা করতে এলো। লোকটার নাম ফেলিক্স, জাতে ফরাসী। গায়ের রঙ ঈষৎ ময়লা, চোখ দুটো তীক্ষ্ন, গাল না কামানো। পরনে মলিন একটা ধূসর রঙের স্যুট, পায়ে গোড়ালি ক্ষয়ে যাওয়া জুতো। দেখে মনে হয়, হাতে কাজ না থাকা কোনো উকিলের কেরানি। লোকটাকে একগ্লাস মদ দিলো অ্যাশেনডেন, তারপর দুজনে মিলে তাপচুল্লির কাছে গিয়ে বসলো।

'আপনার ওই মহিলাটি একটুও সময় নষ্ট করেনি।' লোকটা বললো, 'এসে পৌঁছনোর সিকি ঘণ্টার মধ্যেই ও পোশাক-আশাক আর কম দামি গয়নাগাঁটির একটা পুঁটলি নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং বাজারের কাছে একটা দোকানে গিয়ে সেগুলোকে বিক্রি করে দেয়। তারপর বিকেলের স্টিমার আসতেই, ও ঘাটে গিয়ে এভিয়াঁর টিকিট কেনে।'

এখানে বলে নেওয়া দরকার, ফ্রান্সের সীমানার মধ্যে হ্রদের ধারে থনোঁর পরেই এভিয়াঁ এবং সেখান থেকে ওপারের স্যুইৎজারল্যাণ্ডে নৌকা যাতায়াত করে।

'অবিশ্যি ওর কাছে পাসপোর্ট ছিলো না, তাই ওকে স্টিমারে ওঠার অনুমতিও দেওয়া হয়নি।'

'ওর কাছে যে পাসপোর্ট নেই, সেটা ও কি করে ব্যাখ্যা করলো?'

'বলেছে, ও পাসপোর্ট আনতে ভুলে গেছে, কিন্তু এভিয়াঁতে একটি বন্ধুর সঙ্গে ওর দেখা করতে যাবার কথা। ভারপ্রাপ্ত অফিসারটিকে ও রাজি করাবার অনেক চেষ্টা করেছিলো, এমন কি তার হাতে কয়েকশো ফ্রাঁ গুঁজে দেবারও চেষ্টা করেছিলো।'

'আমি যা ভেবেছিলাম, মহিলাটি তাহলে তার চাইতে অনেক বেশি বোকা,' বললো অ্যাশেনডেন।

কিন্তু পরদিন বেলা এগারোটায় জুলিয়া লাজারির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অ্যাশেনডেন ওর পালাবার প্রচেষ্টাটা নিয়ে কোনো কথাই তুললো না। ইতিমধ্যে মহিলা নিজেকে গুছিয়ে নেবার মতো সময়টুকু পেয়ে গেছে। এখন ওর চুলগুলো পরিপাটি করে বাঁধা, ঠোঁট ও গালে রঙের স্পর্শ—দেখতেও প্রথমবারের মতো অতোটা খারাপ লাগছে না।

'আমি আপনার জন্যে কয়েকখানা বই নিয়ে এসেছি,' অ্যাশেনডেন বললো।

'কারণ আমার আশঙ্কা, সময়টা একটা ভারি বোঝা হয়ে আপানার ওপরে চেপে রয়েছে।'

'তাতে আপনার কি এসে যায় ?'

'যেটা এড়ানো যায় সেটাতে আপনাকে ভুগতে দেবার কোনো বাসনা আমার নেই। যাই হোক, বইগুলো আমি রেখে যাচ্ছি। ইচ্ছে হলে আপনি এগুলো পড়তে পারেন আবার না-ও পড়তে পারেন।'

'যদি জানতেন, আপনাকে আমি কতোটা ঘৃণা করি!'

'জানলে নিঃসন্দেহে আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগতো। কিন্তু কেন আপনি আমাকে ঘৃণা করবেন, তা আমি সত্যিই জানি না। আমাকে যেটুকু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি শুধু তা-ই করছি।'

'আপনার মতলবটা কি ? শুধু আমার কুশল জিগেস করার জন্যেই আপনি এখানে এসেছেন বলে তো মনে হচ্ছে না!'

'আমি আপনাকে দিয়ে একখানা চিঠি লেখাতে চাই', অ্যাশেনডেন মৃদু হাসলো। 'চিঠিতে আপনি আপনার প্রেমিককে লিখবেন যে পাসপোর্টে কিছু গোলমাল থাকার দরুন স্যুইস কর্তৃপক্ষ আপনাকে সীমান্ত পার হতে দেবে না। তাই আপনি এখানে এসেছেন। জায়গাটা ভারি সুন্দর এবং নিরিবিলি—এতো নিরিবিলি যে এখানে বসে বোঝাই যায় না, কোথাও একটা যুদ্ধ চলছে। আপনি প্রস্তাব জানাবেন, চন্দ্রা যেন এখানে এসে আপনার সঙ্গে মিলিত হয়।'

'আপনি কি মনে করেন সে একটা নির্বোধ ? এ প্রস্তাবে সে রাজি হবে না।'

'সেক্ষেত্রে তাকে রাজি করাবার জন্যে আপনাকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।'

জবাব দেবার আগে জুলিয়া লাজারি বেশ কিছুক্ষণ ধরে অ্যাশেনডেনের দিকে তাকিয়ে রইলো। অ্যাশেনডেনের সন্দেহ হলো ও মনে মনে চিন্তা করছে চিঠিটা লিখে এবং বাধ্যতার ভান দেখিয়ে ও খানিকটা সময় হাতে আনতে পারবে কি না।

'বেশ, আপনি তাহলে বলুন—আপনি যা বলবেন, আমি তাই লিখে দিচ্ছি।'

'আমার ইচ্ছে আপনি নিজের ভাষায় চিঠিটা লিখবেন।'

'তাহলে আমাকে আধঘণ্টা সময় দিন, তার মধ্যে চিঠিটা তৈরি হয়ে যাবে।'

'আমি এখানেই অপেক্ষা করবো।'

'কেন ?'

'কারণ সেটাই আমার পছন্দ।'

রাগে জুলিয়া লাজারির চোখ দুটো ঝলসে উঠলো। কিন্তু নিজেকে ও

সামলে নিলো, মুখে কিছুই বললো না। দেরাজ-আলমারিতে লেখার সরঞ্জামগুলো ছিলো। সাজগোছ করার টেবিলটার সামনে বসে চিঠিটা লিখতে শুরু করলো ও। তারপর চিঠিটা যখন অ্যাশেনডেনের হাতে তুলে দিলো, অ্যাশেনডেন লক্ষ্য করলো রুজের প্রলেপ সত্ত্বেও ওকে ভীষণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। চিঠিটা যে লিখেছে, কালি-কলমের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করার ব্যাপারে সে খুব একটা অভ্যস্ত নয়। কিন্তু যেটুকু হয়েছে তাই যথেষ্ট। চিঠির শেষের দিকে লোকটাকে ও কতোটা ভালবাসে তা লিখতে শুরু করে জুলিয়া আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি, প্রাণ উজাড় করে লিখেছে এবং সেখানটা সত্যিই ভারি আবেগময়।

'এবারে এটুকু জুড়ে দিন: 'পত্রবাহক একজন সুইস, তুমি ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো। সেন্সার কর্তৃপক্ষ চিঠিটা দেখুক, আমি তা চাইনি —তাই ওর হাতেই চিঠিটা পাঠালাম'।'

মুহূর্তের জন্যে একটু ইতস্তত করে জুলিয়া নির্দেশিত কথাগুলো লিখলো।

'সম্পূর্ণ বানানটা কি হবে?'

'যেমন ইচ্ছে হয়, লিখুন। এবারে একটা খামে ঠিকানাটা লিখে দিন, তাহলেই আমি আমার অবাঞ্ছিত উপস্থিতি থেকে আপনাকে মুক্তি দেবো।'

হ্রদের ওপারে চিঠিটা নিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষায় থাকা এজেন্টটির হাতে চিঠিটা তুলে দিলো অ্যাশেনডেন। সেদিন সন্ধ্যায়ই জুলিয়ার কাছে সে চিঠির জবাবটা নিয়ে গেলো। অ্যাশেনডেনের হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে, খানিকক্ষণ সেটাকে বুকের সঙ্গে চেপে রাখলো জুলিয়া। তারপর সেটা পড়তে পড়তে স্বস্তির একটা মৃদু চিৎকার তুলে বললো, 'সে আসবে না!'

অতিরিক্ত অলঙ্কারময় সাজানো-গোছানো ভারতীয় ইংরেজী ভাষায় লেখা চিঠিটা লেখকের তিক্ত হতাশাকে মূর্ত করে তুলেছে। লোকটা লিখেছে, কি আকুল আগ্রহ নিয়ে সে জুলিয়ার পথ চেয়ে অপেক্ষা করছিলো। যে সমস্ত কারণে ও সীমান্ত অতিক্রম করতে পারছে না, যেমন করেই হোক সেগুলোকে দূর করার জন্যে জুলিয়ার কাছে সে কাতর অনুনয় জানিয়েছে। লিখেছে তার পক্ষে সীমান্ত পেরিয়ে আসা অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব। তার মাথার ওপরে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে এবং এ অবস্থায় কোনো রকম ঝুঁকি নেবার কথা চিন্তা করাও বাতুলতা মাত্র। একটু রসিকতা করার প্রচেষ্টায় সে লিখেছে: ওর মোটাসোটা প্রেমিকটি গুলিবিদ্ধ হোক, জুলিয়া নিশ্চয়ই তা চায় না—তাই নয় কি?

'সে আসবে না, আসবে না,' ফের বললো জুলিয়া।

'আপনি তাকে লিখে জানান, এতে কোনো রকম ঝুঁকি নেই। আপনাকে

লিখতে হবে, ঝুঁকি থাকলে এমন অনুরোধ করার কথা আপনি স্বপ্নেও ভাবতেন না। আপনি লিখে দিন, আপনাকে ভালোবাসলে সে এখানে আসতে একটুও ইতস্তত করবে না।'

'লিখবো না, কিছুতেই লিখবো না!'

'বোকামো করবেন না। না লিখে আপনার কোনো উপায় নেই।'

আচমকা ঝরঝর কান্নায় ভেঙে পড়ে জুলিয়া। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে অ্যাশেনডেনের হাঁটু দুটো আঁকড়ে ধরে ও। বারবার করুণ আকুতি নিয়ে দয়া ভিক্ষা করতে থাকে অ্যাশেনডেনের কাছে।

'আমাকে আপনি ছেড়ে দিন···আপনি আমাকে যা করতে বলবেন আমি তাই করবো।'

'বাজে বকবেন না। আপনি কি মনে করেছেন আমি আপনার প্রেমিক হতে চাই? নিন, উঠুন—ঠান্ডা মাথায় একটু চিন্তা করে দেখুন। আপনি তো জানেন, এ ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ নেই।'

জুলিয়া উঠে দাঁড়ালো, তারপর আচমকা খেপে গিয়ে একের পরএক নোংরা গালাগাল ছুঁড়তে লাগলো অ্যাশেনডেনের উদ্দেশ্যে।

'এ রূপটা আমার অনেক বেশি ভালো লাগছে,' অ্যাশেনডেন বললো। 'তা আপনি কি লিখবেন, না আমি পুলিস ডেকে পাঠাবো?'

'সে আসবে না। কাজেই চিঠি লেখা অর্থহীন।'

'আপনার ভালোর জন্যেই তাকে এখানে আনানো দরকার।'

'তার মানে? কি বলতে চাইছেন আপনি? আপনি কি বলতে চাইছেন যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেও যদি বিফল হই, তাহলে···'

'হ্যাঁ, এর অর্থ—হয় আপনি আর নয়তো সে।'

জুলিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে লাগলো। হাতটা একবার বুকের কাছে রাখলো। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে কাগজ আর কলমের দিকে হাত বাড়ালো। কিন্তু চিঠিটা অ্যাশেনডেনের ঠিক মনঃপূত হলো না, তাই ওটা সে ফের একবার লেখালো। লেখা শেষ করে জুলিয়া বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ফের আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লো। ওর মর্মযন্ত্রণাটা বাস্তব, কিন্তু ওর অভিব্যক্তির মধ্যে এমন একটা নাটকীয়তা ছিলো যার জন্যে সেটা অ্যাশেনডেনের অনুভূতিতে সাড়া জাগাতে পারলো না। অ্যাশেনডেনের মনে হচ্ছিলো, তার সঙ্গে ওই মহিলাটির সম্পর্ক নেহাতই নৈর্ব্যক্তিক—যেন ডাক্তারের উপস্থিতিতে রোগী যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু ডাক্তার তা উপশম করাতে পারছেন না। এবারে সে বুঝতে পারলো, র—কেন তাকে এই অদ্ভুত কাজটা দিয়েছেন। এ কাজের জন্যে দরকার ঠাণ্ডা মাথা এবং আবেগ-অনুভূতির ওপরে সুসম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।

পরদিন অ্যাশেনডেন আর জুলিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেলো না। রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ হবার পর ফৌলক্স চিঠিটার জবাব অ্যাশেনডেনের বাড়িতে

পৌঁছে দিলো।

'কি খবর, বলো?'

'আমাদের বন্ধুটি কিন্তু বেপরোয়া হয়ে উঠছে।' ফেলিক্স মৃদু হাসলো, 'আজ বিকেলে ও পায়ে পায়ে স্টেশনে গিয়ে হাজির হয়েছিলো। লিয়ঁতে যাবার একটা ট্রেন তখন সবেমাত্র ছাড়বে ছাড়বে করছে। মহিলাকে অনিশ্চিত-ভাবে এদিক-ওদিকে তাকাতে দেখে আমি এগিয়ে গিয়ে জিগেস করলুম, আমি ওকে কোনো সাহায্য করতে পারি কিনা। নিজেকে আমি সুরেতের একজন এজেন্ট হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলুম। চোখের দৃষ্টি যদি মানুষকে খুন করতে পারতো তাহলে এখন আমি আর আপনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতুম না!'

'বোসো, তুমি বসে নাও,' অ্যাশেনডেন বললো।

'ধন্যবাদ। এরপর মহিলা অন্য দিকে হেঁটে চলে যায়—কারণ ও পরিষ্কার বুঝতে পারে, ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না। কিন্তু আপনাকে এর চাইতেও একটা আগ্রহজনক খবর বলার আছে। হ্রদ পেরিয়ে লুসানে নিয়ে যাবার জন্যে ও একটা মাঝিকে এক হাজার ফ্রাঁ দিতে চেয়েছে।'

'লোকটা ওকে কি বলেছে?'

'বলেছে, সে অমন ঝুঁকি নিতে পারবে না।'

'তারপর?'

এজেন্টটি দু কাঁধে সামান্য ঝাঁকুনি তুলে মৃদু হাসলো, 'এ ব্যাপারে ফের একটু আলাপ আলোচনা করার জন্যে মহিলা আজ রাত দশটার সময় ওই মাঝিটিকে এভিয়াঁয় যাবার রাস্তায় দেখা করতে বলেছে। এবং হাবেভাবে তাকে এ কথাও বুঝিয়ে দিয়েছে যে, কোনো প্রেমিক ওর দিকে এগিয়ে এলে ও তাকে খুব একটা হিংস্রভাবে বাধা দেবে না। আমি লোকটাকে বলে দিয়েছি, সে যা খুশি তাই করে নিতে পারে—কিন্তু মোদ্দা কথা, কি হলো না হলো তার সবকিছুই আমাকে বলতে হবে।'

'লোকটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা চলে তো?'

'অবশ্যই। আসল ব্যাপারটা সে কিছুই জানে না, শুধু জানে মহিলাকে কড়া নজরে রাখা হয়েছে। তবে ওকে ভয় করার কোনো প্রয়োজন নেই। ছেলেটা ভালো, আমি ওকে ওর জন্ম থেকে দেখছি।'

অ্যাশেনডেন চন্দ্রার চিঠিটা পড়লো। সুতীব্র আগ্রহ আর আবেগে ভরা চিঠি। চিঠিটা যেন তার হৃদয়ের বেদনাময় আর্তির সঙ্গে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। প্রেম? হ্যাঁ, প্রেম সম্পর্কে অ্যাশেনডেনের যদি কোনো ধারণা থেকে থাকে তাহলে তার বিশ্বাস, এ একেবারে সত্যিকারের প্রেম। মানুষটা জুলিয়াকে লিখেছে, কিভাবে সে ফ্রান্সের উপকূলের দিকে তাকিয়ে হ্রদের ধারে পায়চারি করতে করতে কতো দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিয়েছে। ওরা দুজনে এখন কতো কাছাকাছি রয়েছে, অথচ কতো দূরে! বারবার সে

লিখেছে, সে আসতে পারবে না। জুলিয়াকে সে মিনতি করেছে, জুলিয়া যেন তাকে আসতে না বলে। ওর জন্যে সে পৃথিবীতে যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত, কিন্তু ওর কাছে আসতে তার সাহস হয় না। তবু ও যদি বারবার অনুরোধ করে, তাহলে সে কি করে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখবে? জুলিয়ার কাছে সে দয়া ভিক্ষা করেছে। যদি ওর সঙ্গে দেখা না করেই তাকে চলে যেতে হয়, এই ভেবে মানুষটা এক দীর্ঘ বিলাপের অবতারণা করেছে। ওকে জিগেস করেছে, এমন কোনো উপায় আছে কিনা যাতে করে ও চুপি চুপি সীমান্ত পেরিয়ে তার কাছে চলে যেতে পারে। তারপর শপথ করেছে, একবার ওকে নিজের বাহুবন্ধনে ধরতে পারলে সে আর কোনো-দিনও ওকে ছেড়ে দেবে না। কিন্তু চিঠির উন্মাদনাময় ভাষাও পৃষ্ঠাগুলোকে পুড়িয়ে দেওয়া উত্তপ্ত অগ্নিশিখাকে নিষ্প্রভ করতে পারলো না। সত্যি, এ এক উন্মাদের চিঠি।

'মাঝিটার সঙ্গে ওর দেখাসাক্ষাতের ফলাফল তুমি কখন জানতে পারবে?' অ্যাশেনডেন জিগেস করলো।

'এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে আমি ফেরিঘাটে লোকটার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

অ্যাশেনডেন তার হাতঘড়ির দিকে তাকালো, 'আমি তোমার সঙ্গে যাবো।'

পাহাড় থেকে নেমে ফেরিঘাটে পৌঁছে, ওরা ঠাণ্ডা বাতাস থেকে আত্মরক্ষার জন্যে শুল্কভবনের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিলো। খানিকক্ষণ বাদে একটা লোককে এগিয়ে আসতে দেখে ফেলিক্স ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে গিয়ে ডাকলো, 'আঁতোয়ান—'

'মঁ্যসিয়ে ফেলিক্স? আপনার জন্যে একখানা চিঠি আছে। আমি আসছে কাল প্রথম নৌকোয় এটাকে লুসার্নে নিয়ে যাবো বলে কথা দিয়েছি।'

অ্যাশেনডেন লোকটার দিকে সংক্ষেপে এক ঝলক তাকালো, কিন্তু তার আর জুলিয়া লাজারির মধ্যে কি হয়েছে না হয়েছে সে বিষয়ে কিছুই জিগেস করলো না। চিঠিটা নিয়ে সে ফেলিক্সের টর্চের আলোয় সেটাকে পড়ে ফেললো। অবিশুদ্ধ জার্মান ভাষায় চিঠিতে লেখা হয়েছে: 'কোনো শর্তেই এখানে আসবে না। আমার চিঠিগুলোর কোনো গুরুত্ব দিয়ো না। বিপদ। আমি তোমাকে ভালোবাসি, সোনা আমার! এসো না কিন্তু।'

চিঠিটা পকেটে রেখে, অ্যাশেনডেন মাঝিটাকে পঞ্চাশটা ফ্রাঁ দিলো। তারপর বাড়িতে ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। পরের দিন জুলিয়া লাজারির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সে দেখলো, ঘরের দরজা চাবি বন্ধ। খানিকক্ষণ দরজায় টোকা দিয়েও কোনো সাড়া মিললো না। এবারে অ্যাশেনডেন ওকে ডেকে বললো, 'মাদাম লাজারি, দরজা আপনাকে খুলতেই হবে। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই

'আমি অসুস্থ, শুয়ে রয়েছি। কারুর সঙ্গে দেখা করতে পারবো না।'

'দুঃখিত, কিন্তু দরজা আপনাকে খুলতেই হবে। আপনি অসুস্থ থাকলে আমি ডাক্তার ডেকে পাঠাবো।'

'না, আপনি চলে যান। আমি কারুর সঙ্গেই দেখা করবো না।'

'আপনি দরজা না খুললে, আমি কোনো তালার কারিগর ডেকে আনবো। তারপর তালা ভেঙে দরজা খুলবো।'

খানিকক্ষণ আর কোনো সাড়া নেই। তারপর চাবি ঘোরানোর শব্দ শোনা গেলো। অ্যাশেনডেন ঘরে গিয়ে ঢুকলো। জুলিয়া লাজারির পরনে একটা অঙ্গাবরণী, মাথার চুলগুলো এলোমেলো। স্পষ্টই বোঝা যায় ও সবেমাত্র বিছানা ছেড়ে উঠেছে।

'আমার সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেছে। আমি আর কিচ্ছুটি করতে পারবো না। আমার দিকে তাকালেই আপনি বুঝতে পারবেন, আমি কতোটা অসুস্থ। সারাটা রাত আমার অসুস্থ অবস্থায় কেটেছে।'

'আমি বেশিক্ষণ আপনাকে আটকে রাখবো না। কোনো ডাক্তার দেখাতে চান?'

'ডাক্তার আর কি করবে?'

মাঝির কাছ থেকে পাওয়া চিঠিটা পকেট থেকে বের করে অ্যাশেনডেন সেটা জুলিয়ার হাতে তুলে দিলো, 'এর অর্থ কি?'

চিঠিটা দেখেই জুলিয়া একটা অস্ফুট কাতরোক্তি করে উঠলো, সবুজ হয়ে উঠলো ওর পাণ্ডুর মুখখানা।

'আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন. আমার অজান্তে আপনি কখনও পালাবার চেষ্টা করবেন না বা কোনো চিঠিপত্র লিখবেন না।'

'আপনি কি মনে করেছিলেন, আমি আমার কথাটা রাখবো?' তীব্র ঘৃণায় জুলিয়ার চিৎকৃত কণ্ঠস্বর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো।

'না। সত্যি বলতে কি, শুধুমাত্র আপনার সুখ সুবিধের কথা চিন্তা করেই যে আপনাকে এখানকার কয়েদখানায় না রেখে একটা আরামদায়ক হোটেলে রাখা হয়েছে—তা কিন্তু নয়। আপনাকে বলে রাখা প্রয়োজন, হোটেল থেকে বেরুনো বা হোটেলে ফিরে আসার ব্যাপারে আপনার স্বাধীনতা থাকলেও—কয়েদখানার কুঠরিতে পায়ে শেকল বাঁধা অবস্থায় পালাবার যতোটুকু আশা থাকে, থনোঁ থেকে পালাবার ব্যাপারেও আপনার তার চাইতে বেশি কোনো আশা নেই। কাজেই যে চিঠি কোনোদিনই যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছবে না, সে চিঠি লিখে সময় নষ্ট করা আপনার পক্ষে স্রেফ নির্বুদ্ধিতা।'

প্রাণের সবটুকু হিংস্রতা জড়ো করে জুলিয়া অ্যাশেনডেনের দিকে একটা অপমানজনক শব্দ ছুঁড়ে দিলো।

'আপনি বরঞ্চ বসুন। বসে এমন একখানা চিঠি লিখুন যেটা যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া হবে।'

'কক্ষণো না। আমি কিছুই করবো না। আর একটি শব্দও লিখবো না।'

'নির্দিষ্ট কিছু কিছু কাজ করার সমঝোতা নিয়েই আপনি এখানে এসেছিলেন।'

'আমি তা করবো না। ও সমস্ত ব্যাপার শেষ হয়ে গেছে।'

'আপনি বরঞ্চ একটু ভেবে দেখলে পারতেন।'

'ভেবে দেখবো! দেখেছি। আপনার যা ইচ্ছে হয় করতে পারেন, আমি তাতে পরোয়া করি না।'

'খুব ভালো কথা—তবু মন পালটাবার জন্যে আমি আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দেবো।'

এলোমেলো বিছানাটার একটা ধারে বসে নিজের হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নিলো অ্যাশেনডেন। তারপর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ঘড়িটার দিকে।

'ওফ্, এই হোটেলটা আমার স্নায়ুগুলোর ওপরে একেবারে চেপে বসেছে,' জুলিয়া বলতে থাকে। 'আপনারা আমাকে কয়েদখানায় রাখেননি কেন? কেন কেন? যেখানেই যাই, মনে হয় গুপ্তচরেরা আমার পায়ে পায়ে ঘুরছে। আপনারা আমাকে দিয়ে একটা নোংরা জঘন্য কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু কি অপরাধ আমার? আমি জানতে চাই, আমি কি করেছি? আমি কি একজন মহিলা নই? আপনারা আমাকে একটা ঘৃণ্য কাজ করতে বলছেন··· জঘন্য, নোংরা কাজ!'

চড়া কর্কশ সুরে একটানা বকতে থাকে জুলিয়া। অবশেষে পাঁচ মিনিট সময় কেটে যায়। অ্যাশেনডেন এতোক্ষণ একটি কথাও বলেনি। এবারে সে উঠে দাঁড়ায়।

'হ্যাঁ, যান—যান,' খিঁচিয়ে ওঠে জুলিয়া—এক রাশ অকথ্য গালাগাল ছুঁড়ে দেয় অ্যাশেনডেনের দিকে।

'আমি আবার ফিরে আসবো,' দরজার গা থেকে চাবিটা খুলে নিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে চাবি ঘুরিয়ে ফের দরজাটা বন্ধ করে দেয় অ্যাশেনডেন। তারপর সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে, এক টুকরো কাগজে দ্রুত কয়েক ছত্র লিখে থানায় পাঠিয়ে দিয়ে ফের ওপরে গিয়ে হাজির হয়। জুলিয়া লাজারি তখন দেয়ালের দিকে মুখ করে বিছানায় পড়ে রয়েছে। প্রবল কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর সমস্ত শরীরটা। অ্যাশেনডেনের ঘরে ঢোকার শব্দ ও শুনতে পেয়েছে কিনা, তা ওর আচরণে এতোটুকুও বোঝা যায় না। সাজগোছ করার টেবিলটার সামনে রাখা কুর্সিতে বসে টেবিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোটোখাটো জিনিসগুলোর দিকে অলসদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অ্যাশেনডেন। প্রসাধনের জিনিসগুলো সস্তা, খেলো এবং কোনোটাই খুব একটা পরিচ্ছন্ন নয়। রুজ আর কোল্ড ক্রিমের

কয়েকটা ছোটো ছোটো মলিন কৌটো, ভ্রূ আর অক্ষিপক্ষ্মে লাগাবার কয়েকটা কালির শিশি। চুলের কাঁটাগুলো তেলচিটে। পুরো ঘরটাই অগোছালো, সস্তা সুগন্ধির নির্যাসে ঘরের বাতাস ভারি হয়ে আছে। অ্যাশেনডেনের মনে হলো এক দেশ থেকে অন্য এক দেশে, এক মফস্বল শহর থেকে অন্য এক মফস্বল-শহরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কতো তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে এই মহিলা। কে বলতে পারে, ওর জন্ম কোথায়! আজ ও এক স্থূল রুচির মহিলা, কিন্তু অল্প বয়সে ও কেমন ছিলো? ও কি বংশ পরম্পরায় লোক-বিনোদনের এই বৃত্তি গ্রহণ করেছে, নাকি কোনো প্রেমিকের মাধ্যমে ঘটনাচক্রে এই ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে? এতোগুলো বছরে কতো পুরুষমানুষই না দেখেছে ও। দেখেছে সহশিল্পীদের। দেখেছে ওর এজেন্ট আর ম্যানেজারদের, যারা পদমর্যাদার খাতিরে ওর কাছ থেকে বিশেষ প্রশ্রয় উপভোগ করার অধিকার অর্জন করে নিতো। আর দেখেছে বিভিন্ন শহরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী আর তরুণ গোষ্ঠীকে, যারা মুহূর্তের জন্যে নর্তকীর মোহিনী মায়ায় কিংবা রমণীর প্রকট যৌন আবেদনে আকর্ষিত হয়ে ছুটে আসতো ওর কাছে। জুলিয়ার কাছে তারা ছিলো নগদ পয়সার খদ্দের, নিজের স্বল্প বেতনের পরিপূরক হিসেবেই ও তাদের গ্রহণ করতো নির্বিকার মনে। কিন্তু তাদের কাছে জুলিয়া হয়তো ছিলো এক টুকরো রোম্যান্স, ওর বাহুবন্ধনে তারা হয়তো মুহূর্তের জন্যে এক উজ্জ্বল এবং রোমাঞ্চময় পরিব্যাপ্ত পৃথিবীর দৃশ্য দেখতে পেতো।

আচমকা দরজায় টোকা দেবার শব্দ হতেই অ্যাশেনডেন উঁচু গলায় বললো, ভেতরে আসুন।'

জুলিয়া লাজারি তৎক্ষণাৎ বিছানায় উঠে বসলো, 'কে?' পরক্ষণেই যে দুজন গোয়েন্দা থনোঁতে ওকে অ্যাশেনডেনের হাতে তুলে দিয়েছিলো, তাদের দেখে ওর যেন শ্বাসরোধ হয়ে উঠলো, 'আপনারা! কি চান আপনারা?'

'আপনাকে উঠতে হবে, মাদাম লাজারি।' অ্যাশেনডেন বললো, 'আমি আপনাকে ফের এই দুই ভদ্রলোকের হেফাজতে তুলে দেবো।'

'কি করে উঠবো! আপনাকে তো বললাম, আমি অসুস্থ। আমি দাঁড়াতে পারছি না! আপনারা কি আমাকে মেরে ফেলতে চান?'

'আপনি নিজে পেশাক-আশাক না পরলে, আমাদেরই পরিয়ে নিতে হবে এবং সে কাজটা আমরা বোধহয় খুব একটা সুষ্ঠুভাবে করতে পারবো না। নিজেই আসুন, উঠে পড়ুন—নাটক করে কোনো লাভ হবে না।'

'আপনারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন?'

'ওঁরা আপনাকে ইংলণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।'

গোয়েন্দাদের মধ্যে একজন জুলিয়া লাজারির একখানা হাত চেপে ধরতেই হিংস্র চিৎকার করে উঠলো, 'আমাকে ছোঁবেন না—আমার কাছে আসবেন

না বলছি !'

'ছেড়ে দিন,' অ্যাশেনডেন বললো। 'উনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ঝামেলা যতো কম করা যাবে ততোই মঙ্গল।'

'আমি নিজেই পোশাক পরবো।'

অ্যাশেনডেন দেখলো, জুলিয়া অঙ্গাবরণীটা খুলে একটা পোশাক মাথা দিয়ে গলিয়ে নিলো। জোরজার করে পায়ে এক জোড়া জুতো ঢোকালো, স্পষ্টতই জুতোটা ওর পায়ের তুলনায় ছোটো। তারপর চুলগুলো ঠিকঠাক করলো। মাঝে-মাঝেই ও বিমর্ষ দৃষ্টিতে গোয়েন্দা দুজনের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিচ্ছিলো। অ্যাশেনডেন ভাবছিলো, ব্যাপারটা শেষরক্ষা করার মতো স্নায়ুর জোর ওর আছে কি না। র—অবিশ্যি তাকে একটি নির্বোধ আহাম্মক বলবেন, কিন্তু অ্যাশেনডেন যেন চাইছিলো ও সফল হোক। ও সাজগোছের টেবিলটার কাছে যেতেই অ্যাশেনডেন ওকে বসতে দেবার জন্যে কুর্সি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। দ্রুত মুখে ক্রিম লাগিয়ে, একটা নোংরা তোয়ালে দিয়ে ক্রিমটা ঘষে তুলে নিলো জুলিয়া। তারপর পাউডার মেখে, চোখ আঁকলো। ওর হাত কাঁপছিলো। তিনটি পুরুষ নিঃশব্দে লক্ষ্য করছিলো ওকে। গালে রুজ ঘষে, ও ঠোঁটে রঙ মাখলো! তারপর মাথায় চেপেচুপে একটা টুপি বসালো। এবারে অ্যাশেনডেন প্রথম গোয়েন্দাটিকে ইঙ্গিত করতেই লোকটা পকেট থেকে একজোড়া হাতকড়া বের করে ওর দিকে এগিয়ে গেলো।

'না, না, ওগুলো নয়—' এক লাফে পেছিয়ে গিয়ে হাত দুটো দুদিকে ছড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো জুলিয়া।

'বোকামো করবেন না, এগিয়ে আসুন।' গোয়েন্দাটি কর্কশ গলায় বললো।

যেন আত্মরক্ষার তাগিদেই (অ্যাশেনডেনকে ভীষণ অবাক করে দিয়ে) জুলিয়া লাজারি দুহাতে অ্যাশেনডেনকে জড়িয়ে ধরলো, 'আমাকে নিয়ে যেতে দেবেন না! দয়া করুন আমাকে!'

'আপনার জন্যে আর কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' আপ্রাণ প্রয়াসে নিজেকে মুক্ত করে নিলো অ্যাশেনডেন।

গোয়েন্দাটি ওর কবজি দুটো ধরে হাতকড়া পরাতে যেতেই জুলিয়া লাজারি একটা প্রচণ্ড চিৎকার তুলে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো।

'আপনারা যা চান আমি তাই করবো! সমস্ত কিছুই করবো!'

অ্যাশেনডেনের ইঙ্গিতে গোয়েন্দা দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। জুলিয়া লাজারি কিছুটা প্রশান্তি ফিরে পাওয়া অব্দি অপেক্ষা করলো অ্যাশেনডেন। তখনও ও মেঝেতে শুয়ে শুয়ে ফোঁপাচ্ছে। অ্যাশেনডেন ওকে তুলে বসালো।

'আমাকে দিয়ে কি করাতে চান আপনারা?'

'আমি চাই, চন্দ্রাকে আপনি আর একখানা চিঠি লিখুন।'

'আমার মাথা ঘুরছে। আমি দুটো শব্দ একত্র করে জুড়তে পারবো না।

আমাকে খানিকটা সময় দিতে হবে।'

কিন্তু অ্যাশেনডেনের মনে হলো, আতঙ্কের প্রভাবে থাকার মধ্যেই ওকে দিয়ে চিঠিটা লিখিয়ে নেওয়া ভালো। জুলিয়াকে সে সামলে নেবার মতো অবসরটুকু দিতে চাইছিলো না। তাই বললো, 'চিঠিটা আমি আপনাকে মুখে মুখে বলে দেবো। আমি যা বলবো, আপনি ঠিক তাই লিখবেন।'

একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেললো জুলিয়া। তারপর কাগজ আর কলম নিয়ে সাজগোছ করার টেবিলটার কাছে গিয়ে বসলো।

'ধরুন আমি চিঠিটা লিখলাম আর···আর আপনারা যা চাইছেন তা-ও হলো। কিন্তু আমি কি করে জানছি যে আপনারা আমাকে ছেড়ে দেবেন?'

'কর্নেল আপনাকে মুক্তি দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আমিও আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি তাঁর নির্দেশ পালন করবো।'

'বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার বন্ধুটিকে ধরিয়ে দেবার পরেও আমাকে যদি দশ বছরের জন্যে ফাটকে যেতে হয়, তাহলে সেটা খুবই আহাম্মুকি করা হবে।'

'দেখুন, চন্দ্রাকে বাদ দিলে আমাদের কাছে আপনার বিন্দুমাত্রও গুরুত্ব নেই। আমাদের কোনো রকম ক্ষতি করার ক্ষমতাই আপনার নেই। কাজেই মিছিমিছি আমরা কেন আপনাকে নিয়ে মাথা ঘামাবো, আপনাকে কয়েদখানায় রেখে আপনার পেছনে অযথা অর্থব্যয় করবো—বলতে পারেন?'

কথাটা এক মুহূর্ত ভেবে দেখলো জুলিয়া। এখন ও একেবারে প্রশান্ত। যেন সবটুকু আবেগ নিঃশেষ করে দিয়ে এখন ও আচমকা বিচক্ষণ ও বাস্তববাদী হয়ে উঠেছে।

'বলুন, কি লিখতে হবে।'

অ্যাশেনডেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠলো। সে ভেবেছিলো, জুলিয়া নিজে থেকে যেমনটি লিখতো, সে-ও ঠিক তেমনি করেই পুরো চিঠিটা মুখে মুখে বলতে পারবে। কিন্তু সেজন্যে একটু চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন আছে। চিঠিটার ভাষা খুব একটা তরতরে বা সাজানো গোছানো হলে চলবে না। সে জানে, আবেগের মুহূর্তে মানুষ অতি-নাটকীয় এবং অতি অলঙ্কৃত ভাষার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু বইতে বা মঞ্চে এটা সর্বদাই মেকি বলে মনে হয় এবং তাই পাত্রপাত্রীর মুখে আরও সহজ সংলাপ বসাবার জন্যে লেখককে তখন সজাগ থাকতে হয়।

'আমি জানতাম না, আমি একটা কাপুরুষকে ভালোবেসেছি,' অ্যাশেনডেন বলতে শুরু করে। 'তুমি যদি আমাকে ভালোবাসতে তাহলে আমার ডাক পেয়েও এমন ইতস্তত করতে পারতে না।···'করতে পারতে না' শব্দ কটার নিচে দু বার করে দাগ টানুন।·· আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, এখানে কোনো বিপদ নেই। তবে আমাকে ভালো না বেসে থাকলে তুমি না এসে ঠিকই করেছো। এসো না। বরং বার্লিনেই ফিরে যাও, সেখানে তুমি

নিরাপদেই থাকবে। এখানে আমি একেবারে একা। প্রতিদিন নিজেকে বলি, সে আসবে। কিন্তু তোমার প্রতীক্ষায় থেকে থেকে আমি নিজেকে অসুস্থ করে তুলেছি। আমাকে ভালোবাসলে তুমি কিছুতেই এতোটা ইতস্তত করতে না। এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে ভালোবাসো না। তোমার সম্পর্কে আমি এখন ক্লান্ত, বিরক্ত। হাতে পয়সা-কড়ি কিছু নেই। এই হোটেলে আর থাকা অসম্ভব। আর থেকে লাভই বা কি? পারীতে আমি ইচ্ছে করলেই একটা কাজ পেতে পারি। সেখান থেকে আমার এক বন্ধু একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাঠিয়েছে। তোমার আশায় আমি অনেকটা সময় অপচয় করেছি, কিন্তু তার বিনিময়ে কি পেলাম! এখন সব শেষ। বিদায়। আমি তোমাকে যতোটা ভালোবেসেছি আর কেউ তোমাকে তেমন করে ভালোবাসবে না—কোনোদিনও না। বন্ধুর পাঠানো প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করার মতো অবস্থা এখন আমার নেই। তাই আমি তাকে তার পাঠিয়ে দিয়েছি, জবাব পেলেই পারীতে চলে যাবো। তুমি আমাকে ভালোবাসো না বলে আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না—এতে তোমার কোনো দোষ নেই। কিন্তু এ জন্যে আমি বোকার মতো নিজের জীবনটাকে নষ্ট করে দিলাম। মানুষের বয়েসটা তো আর চিরদিন কাঁচা থাকে না! তাহলে বিদায়। ইতি—জুলিয়া।'

চিঠিটা পড়ে অ্যাশেনডেন পুরোপুরি খুশি হতে পারলো না। কিন্তু এর চাইতে ভালো কিছু লেখানো তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। তবে চিঠিটার মধ্যে আন্তরিকতার সুর আছে, যেটা ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে নেই—কারণ ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান কম বলে জুলিয়া ধ্বনির ওপরে নির্ভর করে শব্দগুলো লিখেছে, বানান ভয়াবহ এবং হাতের লেখাটাও বাচ্চাদের মতো। এক একটা শব্দ কেটে দিয়ে ও ফের লিখেছে, কিছু কিছু শব্দসমষ্টি ফরাসী ভাষায় লিখেছে, দু-একটা জায়গায় আবার চোখের জলে লেখা থেবড়ে গেছে।

'এখন আমি চলি,' অ্যাশেনডেন বললো। 'পরের বারে যখন দেখা হবে তখন হয়তো আপনাকে বলতে পারবো যে আপনি মুক্ত—আপনি যেখানে ইচ্ছে হয় চলে যেতে পারেন। কোথায় যেতে চান আপনি?'

'স্পেনে।'

'বেশ, আমি সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করে রাখবো।'

জুলিয়া লাজারি কাঁধ ঝাঁকালো। অ্যাশেনডেন বিদায় নিলো। এখন প্রতীক্ষা করা ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই। বিকেলে একজন বার্তাবহকে লুসার্নে পাঠিয়ে দিয়ে, পরের দিন সকালে সে ফেরিঘাটে গিয়ে স্টিমারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। স্টিমার ঘাটে লাগলে যাত্রীরা সারি বেঁধে জেটিতে দাঁড়ায়, পাসপোর্ট পরীক্ষা করার পর তাদের একে একে তীরে নামার অনুমতি দেওয়া হয়। চন্দ্রা যদি আসে, তাহলে সম্ভবত সে কোনো জাল পাসপোর্ট নিয়ে আসবে—হয়তো সেটা কোনো নিরপেক্ষ দেশের পাসপোর্ট। তখন তাকে অপেক্ষা করতে বলা হবে এবং অ্যাশেনডেন তাকে সনাক্ত করার

পর তাকে গ্রেফতার করা হবে। খানিকটা উত্তেজনা নিয়েই অ্যাশেনডেন স্টিমারটার ঘাটে এসে লাগা এবং জেটিতে যাত্রীদের ছোটোখাটো জটলাটা লক্ষ্য করলো। প্রতিটি যাত্রীকেই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। কিন্তু কারুর মধ্যেই ভারতীয়দের আদৌ কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পেলো না। তার মানে চন্দ্রা আসেনি। অ্যাশেনডেন কি করবে ভেবে পেলো না। হাতের শেষ তাসটা সে খেলে দিয়েছে। থনোঁর যাত্রী জনা ছয়েকের বেশি ছিলো না। তারা যে যার পথে চলে যাবার পর অ্যাশেনডেন পায়ে পায়ে জেটিতে গিয়ে উঠলো। ফেলিক্স এতোক্ষণ যাত্রীদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করছিলো। অ্যাশেনডেন তাকে বললো, 'আমি যে ভদ্রলোকটিকে আশা করেছিলাম, তিনি আসেননি।'

'আপনাকে দেবার মতো একটা চিঠি আছে,' ফেলিক্স মাদাম লাজারির নাম ঠিকানা লেখা একখানা লেফাফা অ্যাশেনডেনের হাতে তুলে দিলো। আঁকা-বাঁকা অক্ষরগুলো দেখেই অ্যাশেনডেন চিনতে পারলো, লেখাটা চন্দ্রালালের। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই জেনিভা থেকে আসা লুসার্নগামী স্টিমারটা তার দৃষ্টিপথে জেগে উঠলো। প্রতিদিন সকালে বিপরীত দিকের স্টিমারটা ছেড়ে যাবার কুড়ি মিনিট বাদে এই স্টিমারটা থনোঁতে এসে পৌঁছোয়। অ্যাশেনডেন অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলো।

'চিঠিটা যে নিয়ে এসেছে, সে কোথায়?'

'টিকিট ঘরে।'

'চিঠিটা তাকে দিয়ে বলুন, যে এটা পাঠিয়েছে এটা যেন তাকেই ফেরত দেওয়া হয়। সে যেন বলে যে চিঠিটা সে ওই মহিলাটির কাছে নিয়ে গিয়েছিলো এবং ওই মহিলাই চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়েছে। লোকটা যদি ফের এক-খানা চিঠি পাঠাতে চায় তাহলে সে বলবে যে তাতে খুব একটা লাভ হবে না, কারণ মহিলাটি থনোঁ থেকে চলে যাবার জন্যে তোরঙ্গ সাজাচ্ছে।'

চিঠিটা প্রয়োজনীয় নির্দেশসহ লোকটার হাতে তুলে দেওয়া হলো দেখে অ্যাশেনডেন হাঁটতে হাঁটতে নিজের বাসস্থানে ফিরে এলো।

পরবর্তী যে স্টিমারে চন্দ্রার আসার সম্ভাবনা সেটা পাঁচটা নাগাদ এসে পৌঁছোয়। ওই সময়েই জার্মানীতে কর্মরত একটি এজেন্টের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিলো বলে অ্যাশেনডেন ফেলিক্সকে সতর্ক করে দিয়েছিলো, জাহাজঘাটে তার যেতে কয়েক মিনিট দেরি হতে পারে। তবে চন্দ্রা এলে, তাকে সে সহজেই খানিকক্ষণ আটকে রাখতে পারবে। কারণ চন্দ্রার এমন কোনো তাড়া নেই, যে ট্রেনে তার পারীতে যাবার কথা সেটা আটটার আগে ছাড়বে না।

কাজ শেষে করে অ্যাশেনডেন ধীরে সুস্থে হ্রদের ধারে পায়চারি করছিলো। তখনও চারদিকে বেশ আলো। পাহাড়ের ওপর থেকে সে দেখতে পেলো, স্টিমারটা জেটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মুহূর্তটা উদ্বেগজনক। সহজাত

প্রবৃত্তিবশেই অ্যাশেনডেনের পদক্ষেপ দ্রুততর হলো। হঠাৎ সে দেখলো, একটা লোক ছুটতে ছুটতে তার দিকেই এগিয়ে আসছে এবং এই লোকটাই সেই পত্রবাহক।

'শীগগির আসুন, জলদি! লোকটা ওখানে রয়েছে।'

অ্যাশেনডেনের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ধ্বক্ করে উঠলো।

'অবশেষে।'

অ্যাশেনডেনও ছুটতে শুরু করলো এবং লোকটাও ছুটন্ত অবস্থায় হাঁফাতে হাঁফাতে তাকে বললো, না-খোলা চিঠিটা সে যথারীতি ভারতীয়টিকে ফেরত দিয়েছিলো। চিঠিটা হাতে নিয়ে সে ভয়ঙ্কর ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিলো ('একজন ভারতীয়ের রঙ যে অমন হয়ে উঠতে পারে, তা আমি না দেখলে কোনোদিনই ভাবতে পারতাম না') এবং বারবার সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছিলো—যেন বুঝতেই পারছিলো না, তার নিজের লেখা চিঠিটা তার কাছেই ফিরে এলো কি করে। তারপরেই তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো, দু গাল বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা। ('সে এক অদ্ভুত দৃশ্য··· জানেনই তো, লোকটা মোটাসোটা!') এক অজানা ভাষায় কি যেন বললো, বোঝা গেলো না। তারপর ফরাসী ভাষায় জিগেস করলো, স্টিমারটা কখন থনোঁতে পৌঁছেছিলো।···এবারেও স্টিমারে উঠে প্রথমে সে চারদিকে তাকিয়ে ভারতীয়টিকে দেখতে পায়নি। তারপর দেখতে পায় ওভারকোটে শরীর মুড়ে, টুপিটা চোখ অব্দি টেনে নামিয়ে, মানুষটা একা একা স্টিমারের সামনের দিকটাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পার হবার পুরো সময়টা সে অপলক চোখে থনোঁর দিকেই তাকিয়েছিলো।

'সে এখন কোথায়?' অ্যাশেনডেন জিগেস করলো।

'আমিই প্রথম স্টিমার থেকে নেমেছি। তারপরে মঁসিয়ে ফেলিক্স আপনাকে খুঁজে আনতে বললেন।'

'ওরা বোধ হয় ওয়েটিং রুমেই লোকটাকে আটকে রেখেছে।'

একেবারে বেদম অবস্থায় অ্যাশেনডেন ফেরিঘাটে গিয়ে পেঁছিলো। হুড়মুড় করে প্রতীক্ষালয়ে ঢুকতেই সে দেখতে পেলো, একটা লোক মেঝেতে পড়ে রয়েছে আর তাকে ঘিরে একদল লোক তারস্বরে কথা বলছে আর পাগলের মতো হাত-পা নাড়ছে।

'কি হয়েছে?' সচিৎকারে জিগেস করলো অ্যাশেনডেন।

'এই দেখুন!' ফেলিক্স বললো।

প্রতীক্ষালয়ের মেঝেতে পড়ে রয়েছে চন্দ্রালাল। চোখ দুটো বিস্ফারিত, ঠোঁটে গ্যাঁজলার একটা ক্ষীণ রেখা।

'লোকটা নিজেই নিজেকে শেষ করে ফেললো। ওর দ্রুতগতির সঙ্গে আমরা পাল্লা দিতে পারিনি। ডাক্তারকে খবর দিয়েছি।'

অ্যাশেনডেনের শরীরের ভেতর দিয়ে আতঙ্কের একটা চকিত শিহরণ ছুটে

গেলো।

ভারতীয়টি স্টিমার থেকে নামতেই ফেলিক্স বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে পারে, এই লোকটিকেই তারা চাইছে। মাত্র চারজন যাত্রীর মধ্যে সে ছিলো সকলের শেষে। অতিরিক্ত সময় নিয়ে প্রথম তিনজনের পাসপোর্ট পরীক্ষা করার পর ফেলিক্স তার পাসপোর্টটা দেখতে চায়। পাসপোর্টটা স্পেনের, সব কিছুই ঠিকঠাক আছে। ফেলিক্স তাকে নিয়ম মাফিক প্রশ্নগুলো জিগেস করে এবং সরকারী কাগজে জবাবগুলো লিখে নেয়। তারপর আন্তরিক মনোহর ভঙ্গিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'আপনি এক মিনিটের জন্যে একটু ওয়েটিং রুমে আসুন। দু-একটা নিয়ম মাফিক কাজ সেরে নিতে হবে।'

'আমার পাসপোর্টটা ঠিকঠাক নেই?' ভারতীয়টি জিগেস করে।

'সম্পূর্ণ ঠিক আছে।'

চন্দ্রা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠলেও ফেলিক্সকে অনুসরণ করে প্রতীক্ষালয়ের দরজার কাছে গিয়ে হাজির হয়। ফেলিক্স দরজাটা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়ায়, 'ভেতরে যান।'

চন্দ্রা ঘরে ঢুকতেই গোয়েন্দা দুজন উঠে দাঁড়ায়। লোকটা নিশ্চয়ই তক্ষুণি সন্দেহ করেছিলো, ওরা পুলিসের লোক এবং বুঝতে পেরেছিলো যে সে ফাঁদে পড়েছে।

'বসুন,' ফেলিক্স বলে। 'আপনাকে আমার দু একটা প্রশ্ন জিগেস করার আছে।'

'এখানে বেশ গরম। আপনি অনুমতি দিলে আমি কোটটা খুলে রাখবো।'

সত্যি বলতে কি, ছোট্ট একটা স্টোভ থাকায় ঘরটা একেবারে চুল্লির মতো গরম। তাই ফেলিক্স উদার ভঙ্গিমায় বলে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

যেন খানিকটা সচেষ্ট প্রয়াসেই মানুষটা কোট খুলে, সেটাকে একটা কুর্সিতে রাখার জন্যে ঘুরে দাঁড়ায় এবং তারপর কি হলো তা বোঝার আগেই সকলে চমকে উঠে দ্যাখে, সে টলতে টলতে সশব্দে মেঝেতে আছড়ে পড়লো। কোটটা খোলার সময়ই চন্দ্রা একটা শিশি থেকে বিষ খেয়ে নিয়েছিলো। শিশিটা তার হাতেই ধরা রয়েছে। অ্যাশেনডেন সেটাকে নাকের কাছে তুলে ঘ্রাণ নিলো। অতি সুস্পষ্ট কাগজি-বাদামের গন্ধ।

সামান্য কিছুক্ষণ ওরা মেঝেতে পড়ে থাকা মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলো। ফেলিক্স অপরাধীর মতো বিচলিত সুরে প্রশ্ন করলো, 'বড়ো সাহেবরা কি খুব রাগারাগি করবেন?'

'এ ব্যাপারে আপনার কোনো ত্রুটি আমি দেখতে পাচ্ছি না।' অ্যাশেনডেন বললো, 'হাজার হোক, লোকটা আর কোনোদিনও কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তাছাড়া লোকটা নিজেই নিজেকে খুন করেছে বলে আমার

দিক থেকে আমি খুশিই হয়েছি। কারণ ওকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হচ্ছে—এই চিন্তাটা আমাকে খুব একটা স্বস্তি দিচ্ছিলো না।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার এসে মানুষটার দেহ থেকে প্রাণ বিলুপ্ত হবার কথা ঘোষণা করলেন।

'প্রুসিক অ্যাসিড,' অ্যাশেনডেনকে উনি জানালেন।

অ্যাশেনডেন ঘাড় নাড়লো। তারপর ফেলিক্সকে বললো, 'আমি মাদাম লাজারির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। উনি আরও দু-একটা দিন এখানে থাকতে চাইলে, থাকতে দেবো। আর যদি আজ রাতেই যেতে চান, তো যাবেন। আপনি স্টেশনের এজেন্টটিকে নির্দেশ দিয়ে রাখুন, সে যেন মহিলাকে নির্বিঘ্নে যেতে দেয়—কেমন?'

'আমি নিজেই স্টেশনে থাকবো,' ফেলিক্স জানালো।

ফের একবার পাহাড়টাতে উঠতে হলো অ্যাশেনডেনকে। রাত হয়েছে। হিমেল উজ্জ্বল রাত। মাথার ওপরে অনন্ত নির্মেঘ আকাশ। হোটেলে ঢুকতেই হোটেলের উত্তাপহীন তুচ্ছ গতানুগতিকতায় এক তীব্র বিতৃষ্ণা অনুভব করলো সে। ভেতরে বাঁধাকপি আর সিদ্ধ মাংসের গন্ধ। হল-ঘরের দেয়ালগুলোতে রেল কোম্পানি থেকে প্রচারিত গ্রেনোব্‌ল, কারকাসোন এবং নর্মাণ্ডির বিভিন্ন স্নানের উপযোগী জায়গার রঙিন ইস্তাহার। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলো অ্যাশেনডেন, তারপর সামান্য একটু টোকা দিয়ে জুলিয়া লাজারির ঘরের দরজাটা খুললো। সাজগোছের টেবিলটার সামনে বসে আরশিতে নিজের দিকে তাকিয়েছিলো জুলিয়া। উদাস, হতাশ ভঙ্গিমা। আপাতদৃষ্টিতে কিছুই করছিলো না। আরশিতেই অ্যাশেনডেনের ঘরে ঢোকার দৃশ্য দেখতে পেলো ও এবং তাকে দেখেই আচমকা ওর মুখের অভিব্যক্তি বদলে গেলো। এতো ত্রস্ত ভঙ্গিতে ও উঠে দাঁড়ালো যে কুর্সিটাও উলটে পড়লো।

'কি হয়েছে? আপনাকে এতো ফ্যাকাশে লাগছে কেন?' চিৎকার করে উঠলো জুলিয়া। মুখ ঘুরিয়ে অ্যাশেনডেনের দিকে তাকালো ও এবং একটু একটু করে ওর চোখ-মুখ আতঙ্কের অভিব্যক্তিতে কুঁচকে উঠলো। 'আপনারা তাকে গ্রেফতার করেছেন!'

'সে মারা গেছে,' অ্যাশেনডেন বললো।

'মারা গেছে! তার মানে সে বিষ খেয়েছে…বিষ খাওয়ার মতো সময়টুকু সে পেয়েছিলো! শেষ অব্দি সে আপনাদের হাত এড়িয়ে চলে গেছে!'

'তার মানে? বিষের কথা আপনি কি করে জানলেন?'

'সে সর্বদা সঙ্গে বিষ নিয়ে চলাফেরা করতো। বলতো, ইংরেজরা তাকে কিছুতেই জ্যান্ত অবস্থায় ধরতে পারবে না।'

মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করে নিলো অ্যাশেনডেন। এ ব্যাপারটা জুলিয়া ভালোভাবেই গোপন করে রেখেছিলো। তবে এমন একটা সম্ভাবনার কথা

তার নিজেরই মনে হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু এমন একটা অতিনাটকীয় পন্থার কথা সে প্রত্যাশাই বা করবে কি করে ?

'এখন আপনি তাহলে মুক্ত। আপনি যেখানে ইচ্ছে হয় চলে যেতে পারেন—আপনার পথে কোনো রকম বাধার সৃষ্টি করা হবে না। এই আপনার টিকিট, আপনার পাসপোর্ট। আর গ্রেফতার হবার সময় এই টাকাটা আপনার সঙ্গে ছিলো। আপনি কি চন্দ্রাকে একবারটি দেখতে চান ?'

জুলিয়া চমকে উঠলো, 'না, না!'

'অমন উত্তেজিত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো ওকে দেখতে চাইবেন।'

জুলিয়া কাঁদলো না। অ্যাশেনডেনের মনে হলো, ওর সমস্ত আবেগ অনুভূতি এ কদিনে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। একেবারে বেদনা-বোধহীন বলে মনে হচ্ছিলো ওকে।

'আজ রাতেই স্পেনের সীমান্তে একটা তারবার্তা পাঠিয়ে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হবে, তারা যেন আপনার পথে কোনোরকম অসুবিধের সৃষ্টি না করে। আমার পরামর্শ নিলে, আপনি যতো শীঘ্র সম্ভব ফ্রান্স থেকে বাইরে চলে যান।'

জুলিয়া কিছু বললো না। অ্যাশেনডেনেরও আর কিছু বলার ছিলো না বলে, সে-ও যাবার জন্যে প্রস্তুত। হলো

'আপনার কাছে নিজেকে অতোটা কঠিন দেখাতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত। তবে এই ভেবে আনন্দ হচ্ছে যে আপনার বিপদ-বিড়ম্বনার সব চাইতে খারাপ অংশটা কেটে গেছে। বন্ধুর মৃত্যুর জন্যে আপনি যে বেদনা অনুভব করছেন আশা করি সময় সে বেদনার তীব্রতাকে লাঘব করে দেবে।'

অভিবাদনের ভঙ্গিমায় সামান্য আনত হয়ে অ্যাশেনডেন দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। কিন্তু জুলিয়া তাকে থামিয়ে দিলো।

'একটু দাঁড়ান,' জুলিয়া বললো। 'আমি শুধু একটা জিনিস জানতে চাই। আমার ধারণা, আপনার মধ্যে কিছুটা কোমল প্রবৃত্তি আছে।'

'আপনার জন্যে আমার পক্ষে যতোটুকু করা সম্ভব, আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, আমি তা অবশ্যই করবো।'

'ওর জিনিসগুলোর কি হবে ?'

'জানি না। কেন ?'

তারপরেই জুলিয়া লাজারি যা বললো, তা অ্যাশেনডেনকে একেবারে বিভ্রান্ত করে তুললো। এমনটি সে আদপেই আশা করেনি।

জুলিয়া বললো, 'ওর একটা হাতঘড়ি ছিলো—গত বছর বড়োদিনে আমি ওকে সেটা দিয়েছিলাম। বারো পাউণ্ড দাম। ওটা আমি ফেরত পেতে পারি ?'

চিঠি

বাইরের জাহাজ ঘাটে প্রচণ্ড রোদ। ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে স্রোতের মতো ছুটে চলেছে মোটর, লরি, বাস, ব্যক্তিগত গাড়ি আর ভাড়াটে গাড়ি। প্রতিটা গাড়ির চালকই হর্ণ বাজাচ্ছে। ভিড়ের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে রিক্সা। কুলীরা ভারী ভারী মোট নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতেও দম খুঁজে নিয়ে একে অন্যকে চিৎকার করে গালাগালি দিচ্ছে, এক পাশ দিয়ে বাঁধাগতে দ্রুত চলতে চলতে হাঁকডাক করে রাস্তা ছাড়তে বলছে পথচারীদের। ফেরিওয়ালারা চেঁচামেচি করে নিজেদের মাল বিক্কিরি করছে। আসলে এই সিঙ্গাপুর শতেক জাতের মিলনস্থল। সব রঙের মানুষ—কালো তামিল, হলদে চীনে, বাদামী রঙের মালয়ী, আর্মেনিয়, ইহুদি এবং বাঙালী—সবাই এখানে কর্কশ গলায় একে অন্যকে ডাকাডাকি করছে। কিন্তু মেসার্স রিপলে জয়েস অ্যাণ্ড নেলর-এর অফিস ঘরের ভেতরটা চমৎকার ঠাণ্ডা। বাইরের ধুলো ভর্তি রোদ ঝলকানো রাস্তা আর অবিরত গোলমালের তুলনায় এখানটা দিব্যি ছায়াময় এবং বেশ নিস্তব্ধ। মিঃ জয়েস তাঁর ব্যক্তিগত কামরায়, টেবিলের সামনে বসে আছেন। পূর্ণগতিতে চলতে থাকা একটা বৈদ্যুতিক পাখা তাঁর দিকে ঘোরানো। হেলান দিয়ে বসে আছেন উনি, কনুই দুটি কুর্সির দুই হাতলে, এক হাতের প্রসারিত আঙুলের প্রান্তগুলো অন্য হাতের প্রসারিত আঙুলের প্রান্তগুলোতে সুষ্ঠুভাবে সাজানো। সামনের লম্বা শেলফে রাখা আইনী বিবরণের জীর্ণ বইগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন উনি। কাপ-ডিশ রাখার ছোট্ট আলমারিটার মাথায় কালো রং করা কয়েকটা চৌকো টিনের বাক্স, তাতে বিভিন্ন মক্কেলের নাম লেখা।

দরজায় টোকা পড়লো।

'ভেতরে এসো।'

মোটা কাপড়ের সাদা পোশাক পরা খুব ফিটফাট একটি চীনে কেরানী দরজাটা খুললো।

'মিঃ ক্রসবি এসেছেন, স্যার।'

প্রতিটি শব্দে নিখুঁত ঝোঁক দিয়ে সুন্দর ইংরেজী বলে লোকটা। ওর শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্যে প্রায়ই অবাক হয়ে যান মিঃ জয়েস। ওং চি সেঙ ক্যাণ্টনের লোক। স্বাধীনভাবে আইন-ব্যবসায়ে যোগ দেবার আগে নিজেকে প্রস্তুত করে নেবার বাসনায় দু-এক বছরের জন্যে সে মেসার্স রিপলে জয়েস অ্যাণ্ড নেলর-এ যোগ দিয়েছে। লোকটা পরিশ্রমী, ভদ্র এবং চরিত্রবান।

'নিয়ে এসো,' মিঃ জয়েস বললেন।

দর্শনার্থীটির সঙ্গে হাত মেলাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে, তাকে বসতে বললেন উনি। বসতেই মানুষটির ওপরে আলো ছড়িয়ে পড়লো। মিঃ জয়েসের মুখ রইলো অন্ধকারে। স্বভাবতই তিনি স্বল্পবাক, এবং এখন কথা বলার আগে তিনি পুরো একটি মিনিট নিশ্চুপ হয়েই রবার্ট ক্রসবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ক্রসবির চেহারাটা বিশাল, ছ-ফুটের ওপরে লম্বা, চওড়া কাঁধ বলিষ্ঠ শরীর। রবার-বাগিচার ম্যানেজার। এস্টেটের মধ্যে অনবরত হাঁটা-চলার কাজ এবং দিনের কাজ সেরে অবসর বিনোদনের জন্যে টেনিস খেলা —এই দুয়ে মিলে তার চেহারাটাকে শক্তপোক্ত করে তুলেছে। রোদে পোড়া গায়ের রং। হাত দুটো রোমশ। হতকুচ্ছিত জুতোর মধ্যে প্রকাণ্ড দুটো পা। মিঃ জয়েসের মনে হলো, মানুষটার ওই বিশাল মুঠোর একটা ঘুঁষি সহজেই একটা পলকা তামিলের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারে। কিন্তু লোকটার নীল চোখ দুটিতে কোনো হিংস্রতা নেই। বন্ধুত্বপূর্ণ, শান্ত দুটি চোখ। বড়োসড়ো বৈশিষ্ট্যহীন মুখখানা সরল, অকপট এবং বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু এই মুহূর্তে ওই মুখে গভীর দুশ্চিন্তার চিহ্ন। ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত।

'দেখে মনে হচ্ছে গত দু-একটা রাত তুমি তেমন করে ঘুমোতে পারোনি,' মিঃ জয়েস বললেন।

'তা পারিনি।'

টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখা ক্রসবির চওড়া, দু-পরতের কিনারা লাগানো ফেল্টের পুরনো টুপিটা এবারে লক্ষ্য করলেন মিঃ জয়েস। তারপর তাঁর দৃষ্টি ঘুরে বেড়ালো মানুষটার খাকি রঙের হাফপ্যান্ট, লাল রোমশ উরু, গলার বোতাম খোলা টাই বিহীন টেনিস শার্ট এবং হাতা গোটানো খাঁকি জ্যাকেটটার দিকে। দেখে মনে হয়, রবার বাগিচায় দীর্ঘ পরিক্রমা শেষ করে মানুষটা সবেমাত্র এখানে এসেছে। মিঃ জয়েস ঈষৎ ভ্রূ কোঁচকালেন।

'নিজেকে সামলে নাও, বুঝেছো? এখন তোমার মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার।'

'হ্যাঁ, আমি ঠিকই আছি।'

'আজ তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছো?'

'না, বিকেলে যাবার কথা। বুঝলেন, ওকে গ্রেফতার করাটা ওদের কিন্তু খুবই অন্যায় হয়েছে।'

'আমার মনে হয়, তা না করে ওদের আর কিছু করার ছিলো না।' শান্ত, মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন মিঃ জয়েস।

'আমি ভেবেছিলাম, অন্তত জামিনে ওকে ছেড়ে দেবে।'

'কিন্তু অভিযোগটা খুবই গুরুতর।'

'জঘন্য! কিন্তু যে কোনো ভদ্রমহিলা ওই পরিস্থিতিতে পড়লে যা করতো, ও তা-ই করেছে। তবে দশজনের মধ্যে ন জনেরই তেমন সাহস হতো না। লেসলি এ দুনিয়ার সেরা মেয়ে। একটা মাছিও ও মারতে পারে না, এতো

নরম। বেশি বকে কি লাভ—আজ বারো বচ্ছর হলো ওকে বিয়ে করেছি—আপনি কি মনে করেন, আমি ওকে চিনি না? ওফ্ ঈশ্বর! একবার বাগে পেলে আমি ওই লোকটার ঘাড় মটকে দিতাম। এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে, ওটাকে খুন করে ফেলতাম। আপনি হলেও তাই করতেন।'

'শোনো ভায়া, সকলেই তোমার পক্ষে। হ্যামণ্ডের হয়ে কারুরই কিছু বলার নেই। তোমার স্ত্রীকে আমরা ছাড়িয়ে আনবোই। ওকে নির্দোষ বলে রায় দেবার ব্যাপারে মনস্থির না করে, জুরি বা জজ—কেউই আদালতে যাবেন বলে আমার মনে হয় না।'

'পুরো ব্যাপারটাই একটা প্রহসন', ক্রসবি উগ্র সুরে বললো। 'প্রথমত, ওকে গ্রেফতার করাই উচিত হয়নি। তারপর—বেচারীর ওপর দিয়ে যা যাচ্ছে তার পরেও—ওকে বিচারের জন্যে কাঠগড়ায় তোলা, এ একেবারে ভয়ঙ্কর কাণ্ড! সিঙ্গাপুরে আসার পরে মেয়ে-পুরুষ যার সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছে—সবাই বলেছে, লেসলি সঠিক কাজই করেছে। আমার তো মনে হয়, ওকে এতোগুলো সপ্তাহ এভাবে কয়েদ করে রাখাটা খুবই অন্যায়।'

'আইন হচ্ছে আইন। শত হলেও ও স্বীকার করেছে যে ওই লোকটাকে ও-ই খুন করেছে। ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর! তোমাদের দুজনের জন্যেই আমি ভীষণ দুঃখিত।'

'আমার কথা যেতে দিন,' বাধা দিলো ক্রসবি।

'কিন্তু বাস্তব সত্যটা রয়েই যাচ্ছে। তা হলো এই যে, একটা খুন হয়েছে এবং একটা সভ্য সমাজে তার বিচার হবেই।'

'একটা বিষাক্ত নোংরা কীটকে মেরে ফেলাও কি খুন? একটা পাগলা কুকুরকে ও যেভাবে গুলি করতো, ওই লোকটাকেও ও সেইভাবে গুলি করেছে।'

মিঃ জয়েস ফের কুর্সিতে হেলান দিলেন, ফের নিজের দশটা আঙুলের প্রান্তকে একত্র করলেন এবং তার ফলে ঠিক যেন একটা ছাদের কাঠামো গড়ে উঠলো। এক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে রইলেন উনি। তারপর নিজের শীতল বাদামী চোখের দৃষ্টি মক্কেলের দিকে মেলে দিয়ে শান্ত গলায় বললেন, 'তোমার আইন-উপদেষ্টা হিসেবে আমার কর্তব্যে হানি থেকে যাবে যদি আমি তোমাকে না বলি যে, এর মধ্যে একটা ব্যাপার রয়ে গেছে যা আমার মনে কিঞ্চিৎ উদ্বেগের সৃষ্টি করছে। তোমার স্ত্রী হ্যামণ্ডকে যদি একবার গুলি করতো, তাহলে কোনো চিন্তাই থাকতো না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ও গুলি করেছে ছবার।'

'এ ব্যাপারে ওর ব্যাখ্যাটা খুবই সহজ। ওই পরিস্থিতিতে পড়লে সবাই তাই করতো।'

'হয়তো তাই,' মিঃ জয়েস বললেন, 'এবং আমার অবশ্যই মনে হয় যে ওর ব্যাখ্যাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু বাস্তবের দিকে চোখ বন্ধ করে রাখলে কোনো লাভ হয় না। নিজেকে অন্যের জায়গায় দাঁড় করিয়ে চিন্তা করার পরিকল্পনাটা সর্বদাই ভালো এবং সরকার পক্ষের কৌঁসুলি হলে আমি যে

এই তথ্যটাকেই আমার তদন্তের কেন্দ্র করে তুলতাম, এটাও আমি অস্বীকার করতে পারছি না।'

'কিন্তু মশাই, সেটা তো স্রেফ বোকামো!'

চকিতে রবার্ট ক্রসবির দিকে একটা তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলেন মিঃ জয়েস। ওঁর সুগঠিত ঠোঁটে এক টুকরো স্মিত হাসির ছায়া খেলে গেলো। ক্রসবি লোক হিসেবে ভালো, তবে আদপেই তাকে বুদ্ধিমান বোধহয় বলা চলে না।

'আমার ধারণা, ওটার কোনো গুরুত্ব নেই।' মিঃ জয়েস বললেন, 'তবে ব্যাপারটা উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছিলো, তাই বললাম। আর বেশি দিন তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে না। সব কিছু চুকে গেলে, আমি বলি কি, বউকে নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে এসো এবং এসব কথা ভুলে যাও। অভিযোগটা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে যদিও আমরা প্রায় সুনিশ্চিত, তবু এ ধরনের একটা মামলায় বিচারের সময়টা খুবই উদ্বেগে কাটে। তাই তোমাদের দুজনেরই বিশ্রামের প্রয়োজন হবে।'

এই প্রথম ক্রসবি হাসলো এবং হাসিটা অদ্ভুতভাবে ওর মুখটাকে বদলে দিলো। হাসলে ওর বিসদৃশ চেহারাটার কথা মনে থাকে না, তখন ওর অন্তরের সুরম্যতাই চোখে পড়ে।

'লেসলির চাইতে আমারই বোধহয় প্রয়োজনটা বেশি হবে। ও তো অদ্ভুতভাবে সবকিছু দিব্যি সয়ে আসছে! সত্যি, ওই একরত্তি চেহারার মেয়ে—আর তার মনের কি সাংঘাতিক জোর!'

'হ্যাঁ, ওর আত্মসংযম দেখে আমিও খুব অবাক হয়েছি।' মিঃ জয়েস বললেন, 'ওর মধ্যে যে এতোটা দৃঢ়তা আছে, তা আমি ভাবতেই পারিনি।'

মিসেস ক্রসবি গ্রেফতার হবার পর থেকে ওর উকিল হিসেবে নিজের কর্তব্য পালনের জন্যে মিঃ জয়েসকে বহুবারই ওর সঙ্গে দেখা করতে হয়েছে। যদিও ওর জন্যে সব কিছুই যথাসম্ভব সুবিধে করে দেওয়া হয়েছে, তবু এটাই বাস্তব সত্য যে ও একটা খুনের অপরাধে বিচারাধীন অবস্থায় কয়েদখানায় রয়েছে এবং এ জন্যেই ও স্নায়ুর চাপে ভেঙে পড়লেও সেটা বিস্ময়কর কিছু হতো না। ওখানে ও প্রচুর পড়াশুনো করে, যথাসম্ভব ব্যায়াম করে এবং কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যে বালিশে লেস বোনার কাজও করে—যেটা ওর দীর্ঘ অবকাশের সময়টাকে বিনোদনে ভরিয়ে তোলে। মিঃ জয়েস যখনই যান দেখতে পান ওর পরনে হালকা, এবং সদ্য ধোয়া একটা সাদাসিধে ফ্রক, মাথার চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো এবং হাত ও নখ রীতিমতো প্রসাধিত। ওর আচার-আচরণ শান্ত ও সংযত। এমন কি ওর ওই পরিস্থিতিগত ছোটোখাটো অসুবিধাগুলো নিয়ে ও ঠাট্টা তামাশা পর্যন্ত করতে পারে। এই মর্মান্তিক ঘটনাটার কথা ও এমন হালকা মেজাজে বলেছিলো যে তাতে মিঃ জয়েসের মনে হয়েছিলো—আসলে ঘটনাটা গুরুতর হলেও তার মধ্যে যে একটা হাস্যকর ব্যাপার রয়ে গেছে, নেহাত সদ্বংশজাত বলেই ও তা প্রকাশ করতে

পারছে না। এতে মিঃ জয়েস খানিকটা বিস্মিত হয়েছিলেন, কারণ ওর মধ্যে কোনো রসবোধ আছে বলে তিনি কোনোদিন ভাবতেই পারেননি।

বেশ কয়েক বছর ধরেই লেসলির সঙ্গে তাঁর মাঝে-মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। সিঙ্গাপুরে এলে ও সাধারণত জয়েস এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেই রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়া করতো। দু-একবার ও তাঁদের সঙ্গেই সমুদ্রের ধারে তাঁদের বাংলোতে সপ্তাহান্তিক দিনগুলো কাটিয়ে গেছে। একবার জয়েসের স্ত্রী দিন পনেরোর জন্যে ওর সঙ্গে ওদের বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে উনি জিওফ্রে হ্যামণ্ডকেও বেশ কয়েকবার দেখেছেন। খুব অন্তরঙ্গ না হলেও এই দুই দম্পতির মধ্যে সখ্যতার সম্পর্ক ছিলো এবং এই কারণেই সর্বনাশটা ঘটে যাবার ঠিক পরেই রবার্ট ক্রসবি সিঙ্গাপুরে ছুটে এসেছে এবং মিঃ জয়েসকে কাতর অনুনয় করেছে যাতে ওর স্ত্রীর পক্ষ সমর্থনের দায়িত্বটা উনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করেন।

লেসলি প্রথম দিন ঘটনাটা যেমনটি বলেছিলো, তার খুঁটিনাটি বিশদ বিবরণ পরবর্তীকালে আর একটুও এদিক-সেদিক করেনি। ঘটনাটা ঘটে যাবার মাত্র কয়েক ঘন্টা বাদেই ও যেমন ঠাণ্ডা ভাবে তা বলেছে, আজও ঠিক তেমনি ভাবেই বলে। বলে পর পর সঙ্গতি রেখে, শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে। ওর একমাত্র বিভ্রান্তির চিহ্ন হলো, দু-একটা ব্যাপার বলার সময় ওর দু-গালে ফুটে ওঠা ঈষৎ রঙের আভাস। ওর মতো মেয়ের জীবনে যে এমনটি হবে, তা কল্পনাও করা যায় না। ওর বয়েস তিরিশের কোঠায় গোড়ার দিকে, তন্বী শরীর, বেঁটে নয় আবার দীর্ঘাঙ্গীও নয়। সুন্দরী নয়, বরঞ্চ মাধুর্যময়ী। ওর হাতের কব্জি এবং পায়ের গোড়ালি ভীষণ কোমল। কিন্তু ও বড্ডো রোগা। সাদা চামড়ার নিচে স্পষ্ট দেখা যায় ওর হাতের হাড় আর বড়ো বড়ো নীল শিরা। মুখখানা বিবর্ণ, ঈষৎ পাণ্ডুর। ঠোঁট ফ্যাকাশে। ওর চোখের রঙ নজর করে দেখার মতো নয়। মাথায় হালকা বাদামী রঙের সুপ্রচুর চুল এবং তা ঈষৎ ঢেউ খেলানো। এ ধরনের চুল একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলে দারুণ সুন্দর লাগে। কিন্তু মিসেস ক্রসবি যে কোন কিছু করার কথা চিন্তা করবে, এটা কল্পনাই করা যায় না। ওর স্বভাব শান্ত, মনোরম। নিজেকে জাহির করার কোনো স্পৃহা ওর মধ্যে নেই। ওর চালচলন মনকে আকর্ষণ করে। কিন্তু ও খুব একটা জনপ্রিয় নয়, তার কারণ ওর অমিশুক স্বভাব। তারও একটা যথেষ্ট বোধগম্য কারণ রয়েছে—বাগিচায় বসবাসকারীদের জীবন খুবই নিঃসঙ্গ। তবে নিজের বাড়িতে পরিচিত মানুষের মধ্যে ওর শান্তশিষ্ট ব্যবহার সত্যিই ভারি চমৎকার! পনেরো দিন ওর কাছে কাটিয়ে এসে মিসেস জয়েস স্বামীকে বলেছিলেন, লেসলি খুবই অতিথিবৎসল। উনি বলেছিলেন, লোকে যা মনে করে ওর মধ্যে তার চাইতে আরও অনেক বেশি গুণ আছে। ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলে, ওর পড়াশুনোর বিস্তৃতি এবং মানুষকে আনন্দ দেবার ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়।

এ ধরনের মহিলা কিছুতেই খুনী হতে পারে না।

যতোটা সম্ভব আশ্বাস দিয়ে রবার্ট ক্রসবিকে বিদায় দিলেন মিঃ জয়েস। তারপর অফিস ঘরে ফের একা হয়ে, আবার মামলাটার নথিপত্রের পৃষ্ঠা ওলটাতে লাগলেন। প্রক্রিয়াটা নেহাতই যান্ত্রিক, কারণ বিষয়টার সমস্ত বিশদ বিবরণ ইতিমধ্যেই তার জানা হয়ে গেছে। মামলাটা রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছে চতুর্দিকে। ক্লাবে, ডিনার টেবিলে, সিঙ্গাপুর থেকে পেনাং পর্যন্ত উপদ্বীপের সর্বত্র—এই নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে। ঘটনার বিবরণে মিসেস ক্রসবির বক্তব্য খুবই সরল। ওর স্বামী কি একটা কাজে সিঙ্গাপুরে যাওয়ায় সেদিন রাত্তিরে ও ছিলো একা। একটু দেরি করে—পৌনে নটার সময় একা একাই রাতের খাওয়া সেরে ও বৈঠকখানা ঘরে বসে লেস বুনছিলো। বৈঠকখানার পরেই খোলা বারান্দা। বাংলোতে তখন আর কেউ নেই, ঠাকুর চাকররা বাংলোর পেছন দিকে নিজেদের ঘরে শুতে চলে গেছে। হঠাৎ বাগানের মোরাম বেছানো পথে পায়ের আওয়াজ শুনে ও অবাক হয়ে যায়। জুতো পরা পায়ের আওয়াজ—অর্থাৎ স্থানীয় লোক নয়, কোনো সাদা চামড়ার মানুষ বলেই মনে হয়—অথচ কোনো গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যায়নি। এতো রাতে কে দেখা করতে আসছে, ভেবে পেলো না লেসলি। আগন্তুক সামান্য সিঁড়ি কটা ভেঙে বাংলোয় উঠলো, তারপর বারান্দা পেরিয়ে বাইরের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। প্রথমে আগন্তুককে চিনতে পারেনি লেসলি। একটা ঢাকনা লাগানো আলোর পাশে বসেছিলো ও, আর আগন্তুকের পেছনটা ছিলো অন্ধকারের দিকে।

'ভেতরে আসতে পারি ?' জিগেস করেছিলো মানুষটা।

লেসলি তার কণ্ঠস্বরও চিনতে পারেনি। চশমা পরে কাজ করছিলো ও। চশমাটা খুলে প্রশ্ন করলো, 'কে ?'

'জেওফ হ্যামণ্ড।'

'এসো, এসো !'

কুর্সি থেকে উঠে মানুষটার সঙ্গে আন্তরিক ভঙ্গিতে করমর্দন করলো লেসলি। একটু অবাকই হয়েছিল ও—কারণ প্রতিবেশী হলেও ইদানীং রবার্ট বা ওর সঙ্গে হ্যামণ্ডের খুব একটা অন্তরঙ্গতা নেই এবং বেশ কয়েক সপ্তাহ হলো ওর সঙ্গে হ্যামণ্ডের দেখাসাক্ষাৎও হয়নি। হ্যামণ্ড যে রবার বাগানের ম্যানেজার, সেটা ওদের বাগান থেকে মাইল আষ্টেক দূরে। এত রাতে লোকটা কেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, ভেবে পাচ্ছিলো না লেসলি।

'রবার্ট এখানে নেই,' ও বললো। 'ওকে সিঙ্গাপুর যেতে হয়েছে। আজ রাতে ফিরবে না।'

হ্যামণ্ড হয়তো ভেবেছিলো, এতো রাতে আসার জন্য তার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার। তাই সে বললো, 'দুঃখিত। আজ রাত্তিরে নিজেকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ বলে মনে হচ্ছিলো। তাই ভাবলাম তোমাদের খবরটাই

বরং নিয়ে আসি।'

'তুমি এলে কি করে? তোমার গাড়ির আওয়াজ পেলাম না তো?'

'গাড়িটা আমি একটু দূরে—রাস্তায়—রেখে এসেছি। ভাবলাম, তোমরা দুটিতে হয়তো এতোক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছো।'

এটা অবিশ্যি খুবই স্বাভাবিক। মজুরদের নাম ডেকে উপস্থিতি নথিভুক্ত করার জন্যে বাগানের ম্যানেজারদের একেবারে কাকডাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হয়। তাই রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি শুতে পাবলেই তারা খুশি হয়। আর সত্যি বলতে কি, হ্যামণ্ডের গাড়িটাও পরদিন ওদের বাংলো থেকে সিকি মাইল দূরেই পাওয়া গিয়েছিলো।

রবার্ট বাড়িতে নেই বলে বাইরের ঘরে হুইস্কি এবং সোডা ছিলো না। চাকরটা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে লেসলি তাকে আর ডাকাডাকি না করে, নিজেই ওসব বয়ে নিয়ে এলো। হ্যামণ্ড এক গ্লাস পানীয় মিশিয়ে, তার পাইপে তামাক ভরলো।

এই অঞ্চলে হ্যামণ্ডের প্রচুর বন্ধুবান্ধব। এখন তার বয়স তিরিশের কোঠার শেষের দিকে, কিন্তু নিতান্ত বালক বয়সেই সে এখানে এসেছিলো। যুদ্ধের শুরুতে যারা প্রথম দিকে স্বেচ্ছায় ফৌজে নাম লিখিয়েছিলো, ও তাদের মধ্যে একজন। উন্নতিও করেছিলো। কিন্তু দুবছর বাদে হাঁটুতে একটা চোট পেয়ে অশক্ত হওয়ায় তাকে ফৌজি বাহিনী ছাড়তে হয়। ফের সে ফেডারেটেড মালয় স্টেটসে ফিরে আসে একজন ডি. এস. ও. এবং এম. সি. হয়ে। গোটা উপনিবেশের মধ্যে ও ছিলো একজন অন্যতম সেরা বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়। ভালো নাচতো, টেনিসটাও ভালোই খেলতো। হাঁটু আড়ষ্ট হওয়ার ফলে ইদানীং আর আগের মতো তেমন নাচতে বা টেনিস খেলতে পারতো না বটে, কিন্তু জনপ্রিয়তা আদায় করে নেবার ব্যাপারে ওর একটা জন্মগত ক্ষমতা ছিলো এবং সকলেই ওকে পছন্দ করতো। হ্যামণ্ডের চেহারাটা ছিলো লম্বা, সুদর্শন, চোখ দুটো নীল এবং আকর্ষণীয়, মাথাভর্তি কালো কোঁকড়ানো চুল। প্রাচীন পন্থীরা বলতেন, ওর একমাত্র দোষ হচ্ছে ওর মেয়ে-ঘেঁষা স্বভাব এবং মারাত্মক সর্বনাশটা হয়ে যাবার পরে তাঁরা মাথা নেড়ে বলেছিলেন যে তাঁরা জানতেন, ওই দোষটাই ওকে বিপদে ফেলবে।

আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে লেসলির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো হ্যামণ্ড। সিঙ্গাপুরের আসন্ন ঘোড়দৌড়, রবারের দাম, ইদানীং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে বাঘটাকে দেখা গেছে সেটাকে ওর মারার সম্ভাব্যতা। লেসলি যে লেসটা বুনছিলো, সেটা ও একটা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে শেষ করার জন্যে উদগ্রীব ছিলো। সেটা ও ওর মায়ের জন্মদিন উপলক্ষে বাড়িতে পাঠাতে চায়। তাই ফের চশমাটা চোখে দিয়ে, বালিশ রাখা ছোট্ট টেবিলটাকে নিজের কুর্সির দিকে টেনে নিলো।

'তুমি ওই মোটা ফ্রেমের চশমাটা না পরলেই ভালো হয়।' হ্যামণ্ড বললো,

'একজন সুন্দরী মহিলা নিজেকে কুৎসিত করে তোলার জন্যে কেন যে এতো আপ্রাণ চেষ্টা করবে, তা আমি বুঝে পাই না।'

মন্তব্যটা শুনে সামান্য অবাক হয় লেসলি। হ্যামণ্ড আগে কখনও এমন সুরে ওর সঙ্গে কথা বলেনি। বিষয়টাকে হালকা করে দেওয়াই সব চাইতে ভালো হবে বলে মনে হলো ওর।

'নিজেকে একটা সাংঘাতিক সুন্দরী মনে করার মতো মিথ্যে অহঙ্কার আমার কোনোদিনই নেই, বুঝেছো? আর তুমি যদি সরাসরি আমাকে জিগেস করো তাহলে আমি বলতে বাধ্য হবো যে, তুমি আমাকে কুৎসিত বলে মনে করো বা না করো—তাতে আমার কিছুই এসে যায় না।'

'আমি তোমাকে কুৎসিত বলে মনে করি না, মনে করি তুমি দারুণ সুন্দরী।'

'তুমি খুব ভালো!' বিদ্রুপের সুরে লেসলি বললো, 'কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমি মনে করবো, তুমি নেহাতই গবেট।'

হ্যামণ্ড মৃদু হাসলো। তারপর নিজের কুর্সি ছেড়ে, লেসলির পাশে অন্য একটা কুর্সিতে গিয়ে বসলো।

'তোমার মতো এতো সুন্দর হাত যে আর কারুর নেই, তা তুমি নিশ্চয়ই অস্বীকার করার চেষ্টা করবে না!' হ্যামণ্ডের ভাব ভঙ্গিতে মনে হলো লেসলির একখানা হাত সে নিজের হাতে তুলে নেবে।

'বোকামো করো না,' মৃদু আঘাতে হ্যামণ্ডের হাতটা সরিয়ে দেয় লেসলি। 'আগে যেখানে বসেছিলে সেখানে গিয়ে বসো, বুঝেসুঝে কথা বলো। নইলে আমি তোমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো।'

অনড় হয়ে বসে থাকে হ্যামণ্ড।

'তুমি কি জানো না, আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি?'

'না, জানি না,' লেসলি শান্ত ভঙ্গিতে বলে। 'কথাটা আমি এক মিনিটের জন্যেও বিশ্বাস করি না। তাছাড়া সেটা যদি সত্যিও হয়, আমি তোমার মুখ থেকে তা শুনতে চাই না।'

কথাটা শুনে লেসলি আরও বেশি অবাক হয়েছিলো এই কারণে যে, গত সাত বছরের পরিচয়ে মানুষটা কোনোদিনই ওর দিকে তেমন করে বিশেষ মনোযোগ দেয়নি। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর ওদের মধ্যে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হতো। একবার, হ্যামণ্ড তখন অসুস্থ, রবার্ট গাড়িতে করে তাকে নিজেদের বাংলোয় নিয়ে এসেছিলো। সেবারে পনেরো দিন সে ওদের কাছে ছিলো। কিন্তু ভিন্ন রুচির মানুষ হওয়ায় ওদের পরিচয় কখনই বন্ধুত্বে পরিণত হতে পারেনি। গত দু-তিন বছরে ওদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ খুব কমই হয়েছে। সে মাঝে মধ্যে টেনিস খেলতে এসেছে, কখনও বা অন্য কোনো বাগানের পার্টিতে দেখা হয়েছে—কিন্তু পুরো একটা মাস তাকে একেবারে দেখাই যায়নি, এমনও প্রায়ই হয়েছে।

ফের একবার হুইস্কি আর সোডা মিশিয়ে নিলো হ্যামণ্ড। এখানে আসার আগেও ও মদ খেয়ে এসেছে কিনা, কে জানে। লোকটার হাবভাব কেমন যেন অন্যরকম এবং তাতেই সামান্য অস্বস্তি বোধ করছিলো লেসলি।

'আমি হলে কিন্তু এখন আর মদ খেতাম না,' স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বললো লেসলি।

গ্লাসটা খালি করে টেবিলে নামিয়ে রাখলো হ্যামণ্ড। তারপর আচমকা বললো, 'তুমি কি ভেবেছো, আমি মাতাল হয়েছি বলে তোমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছি ?'

'সেটাই তো সব চাইতে স্পষ্ট কারণ বলে মনে হয়। তাই নয় কি ?'

'বাজে কথা। প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই আমি তোমাকে ভালোবাসি। যতোদিন পেরেছি, মুখ বন্ধ করে রেখেছি। এখন আর না বলে পারছি না। আমি তোমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি।'

কুর্সি ছেড়ে উঠে বালিশটা সন্তর্পণে এক পাশে সরিয়ে রাখে লেসলি, 'শুভরাত্রি।'

'আমি এখন যাচ্ছি না।'

অবশেষে মেজাজ খারাপ হতে শুরু করে লেসলির।

'তুমি নেহাতই বোকা! তুমি কি জানো না, রবার্টকে ছাড়া আমি আর কাউকে কোনোদিনও ভালোবাসিনি? আর তাকে ভালো না বাসলেও, তোমাকে আমি কোনোদিনই ভালোবাসবো না।'

'তাতে আমার কি এসে যায় ? রবার্ট এখন এখানে নেই।'

'তুমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে না গেলে, আমি চাকরবাকরদের ডাকবো। তারা তোমাকে জোর করে বাড়ি থেকে বের করে দেবে।'

'তোমার ডাক তাদের কানে গিয়ে পৌঁছোবে না।'

এতোক্ষণে ভীষণ রেগে উঠেছে লেসলি। বারান্দায় যাবার জন্যে পা বাড়ায় ও, সেখান থেকে ডাকলে চাকরটা নিশ্চয়ই ওর গলা শুনতে পাবে। কিন্তু হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত চেপে ধরে হ্যামণ্ড।

'ছেড়ে দাও আমাকে,' চিৎকার করে ওঠে লেসলি।

'মোটেই না। এতোদিনে আমি তোমাকে পেয়েছি।'

লেসলি চিৎকার করে চাকরটাকে ডাকে, কিন্তু হ্যামণ্ড তক্ষুনি হাত দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরে। সে কি করতে চলেছে লেসলি তা বোঝার আগেই মানুষটা ওকে দুহাতে জাপটে ধরে চুমু খেতে থাকে তীব্র আবেগে। লেসলি ছটফট করতে থাকে, মানুষটার তপ্ত ঠোঁটের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে নিজের ঠোঁট দুটিকে।

'না, না, না,' চিৎকার করে ওঠে ও। 'ছেড়ে দাও আমাকে!'

এরপর কি ঘটেছিলো, তা সবই ওর কাছে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। এ পর্যন্ত সবই ওর নিখুঁতভাবে মনে আছে, কিন্তু এবারে মানুষটার

কথাগুলো যেন ভীতি আর আতঙ্কের কুয়াশার ভেতর দিকে ওর কানে এসে ঢুকতে থাকে। সম্ভবত সে ওর কাছে প্রেম প্রার্থনা করছিলো, পাগলের মতো নিজের প্রেম নিবেদন করছিলো এবং সর্বক্ষণই ওকে বেঁধে রেখেছিলো বিক্ষুব্ধ এক নিবিড় আলিঙ্গনে। ও তখন অসহায়, কারণ মানুষটা বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী, ওর হাত দুটোকে সে চেপে রেখেছে ওরই শরীরের দুপাশে। ওর প্রচেষ্টায় কোনো ফল হচ্ছিলো না। বুঝতে পারছিলো, ওর শক্তি ফুরিয়ে আসছে। ভয় হচ্ছিলো, বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে। মুখের ওপরে মানুষটার তপ্ত নিঃশ্বাস ওকে অসুস্থ করে তুলছিলো। ওর ঠোঁটে, চোখে, গালে, চুলে সর্বত্র চুমু খাচ্ছিলো সে। তার আলিঙ্গনের চাপে কষ্ট হচ্ছিলো ওর। তারপর ওকে সে কোলে তুলে নেয়। লেসলি তাকে পা দিয়ে ঝটকা মারার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু তার ফলে ওকে সে আরও শক্ত করে চেপে ধরে। এবারে ওকে সে কোলে নিয়ে এগুতে থাকে। এখন সে আর কিছু বলছে না। কিন্তু লেসলি বুঝতে পারছে, এখন মানুষটার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখ দুটো জ্বলে উঠেছে আসঙ্গলিপ্সায়। ওকে সে শোবার ঘরে নিয়ে চলেছে। এখন সে আর সভ্য মানুষ নয়, বর্বর। ছুটতে গিয়ে সামনের একটা টেবিলে হোঁচট খেলো মানুষটা। হাঁটু অশক্ত থাকায় একটু টাল খেলো এবং দুহাতে একটা মানুষের বোঝা থাকায় পড়েই গেলো শেষ পর্যন্ত। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে দূরে সরে গেলো লেসলি, ছুটতে লাগলো সোফাটার চতুর্দিকে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে, ওর দিকে তেড়ে গেলো হ্যামণ্ড। টেবিলের ওপরে একটা রিভলভার রাখা ছিলো। লেসলি ভীতু নয়। কিন্তু রবার্ট রাতে বাড়ি থাকবে না বলে, ও রিভলভারটা নিয়ে শোবে মনে করে ওখানে নামিয়ে রেখেছিলো। ইতিমধ্যে দিশেহারা হয়ে উঠেছে লেসলি, কি করছে না করছে তা ও নিজেই জানে না। একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিলো ও। তারপরেই দেখলো হ্যামণ্ড টলছে, চিৎকার করে উঠলো, কি একটা বললো—কি বললো, তা লেসলি জানে না। হ্যামণ্ড টলতে টলতে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে গেলো। লেসলি তখন উন্মাদ, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। হ্যামণ্ডকে অনুসরণ করে ও-ও বাইরে বেরিয়ে আসে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই—যদিও এসবের কিছুই ওর মনে নেই। অনুসরণ করতে করতে যান্ত্রিকভাবেই গুলি করতে থাকে ও, একটার পর একটা, যতোক্ষণ না ছটা গুলিই শেষ হয়ে যায়। হ্যামণ্ড বারান্দার মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে, পড়ে থাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একটা রক্তাক্ত স্তূপের মতো।

গুলির শব্দে সচকিত হয়ে চাকরবাকরেরা ছুটে এসে দেখতে পায়, হ্যামণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে লেসলি। তখনও রিভলভারটা ওর হাতে ধরা। হ্যামণ্ডের দেহে প্রাণ নেই। মুখ তুলে মুহূর্তের জন্যে একবার ওদের দিকে তাকালো লেসলি, কিছু বললো না। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে চাকরগুলো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো জড়ো হয়ে। হাত থেকে রিভলভারটা

ফেলে দিলো লেসলি, তারপর মুখ ঘুরিয়ে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢুকলো। পরক্ষণেই সবাই দেখলো, শোবার ঘরে গিয়ে দরজার চাবি ঘুরিয়ে দিলো ও। ওরা মৃতদেহটাকে ছুঁতে ভয় পাচ্ছিলো, কিন্তু আতঙ্কিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে নিচু গলায় উত্তেজিত স্বরে একে অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করলো। শেষ অব্দি চাকরদের সর্দারই নিজেকে গুছিয়ে নিলো। লোকটা চীনে, ঠাণ্ডা মাথার মানুষ, অনেক বছর হলো এদের কাছে কাজ করছে। রবার্ট মোটর সাইকেলে চেপে সিঙ্গাপুরে গেছে, তাই তার গাড়িটা গ্যারাজেই রয়েছে। সহিসকে সে গাড়িটা বের করতে বললো, কারণ এক্ষুনি সহকারী জেলা অফিসারের কাছে গিয়ে ঘটনাটা বলা দরকার। রিভলভারটা সে তুলে নিয়ে নিজের পকেটে রাখলো। সহকারী জেলা অফিসারের নাম উইদার্স, থাকেন সব চাইতে কাছের শহরটার শেষ প্রান্তে—এখান থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে। সেখানে পেঁছুতে ওদের দেড় ঘণ্টা সময় লেগে গেলো। সবাই তখন ঘুমোচ্ছে, চাকরগুলোকে ডাকাডাকি করে তুলতে হলো। উইদার্স সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এলেন, ওরা তাঁকে খবরটা জানালো। প্রমাণ হিসেবে চাকরদের সর্দার রিভলভারটাও তাঁকে দেখালো। উনি গাড়ি আনতে বলে, ভেতরে গিয়ে পোশাক পরে নিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই জনশূন্য রাস্তা ধরে ওদের অনুসরণ করতে শুরু করলেন। উনি যখন ক্রসবিদের বাংলোয় গিয়ে পেঁছুলেন তখন সবেমাত্র ভোর হতে শুরু করেছে। একছুটে সিঁড়ি কটা ভেঙে বারান্দায় উঠে, হ্যামণ্ডের লাশটা দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। মুখটা ছুঁয়ে দেখলেন। বেশ ঠাণ্ডা।

'মেম সাহেব কোথায় ?' চাকরদের সর্দারকে জিগেস করলেন উনি।

চীনেটা শোবার ঘরের দিকে আঙুল তুলে দেখালো। উইদার্স গিয়ে দরজায় টোকা দিলেন। কোনো সাড়া নেই।

'মিসেস ক্রসবি,' ফের দরজায় টোকা দিলেন উনি।

'কে ?'

'উইদার্স।'

ফের নীরবতা। তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে গেলো। সামনেই লেসলি। রাতে বিছানায় শোয়নি। যে পোশাক পরে রাতের খাবার খেয়েছিলো, সেটাই পরে রয়েছে। নিশ্চুপ হয়ে এ. ডি. ও-র দিকে তাকিয়ে রইলো ও।

'আপনাদের খাস-চাকর আমাকে নিয়ে এসেছে। হ্যামণ্ড—হ্যামণ্ডকে কি করেছেন আপনি ?'

'ও আমাকে বলাৎকার করার চেষ্টা করেছিলো। আমি ওকে গুলি করেছি।'

'হে ভগবান! বলছিলাম কি, আপনি বরঞ্চ বাইরে আসুন। ঘটনাটা ঠিক কি কি হয়েছিলো, আমাকে খুলে বলুন।'

'এখন নয়। এখন আমি পারবো না। আমাকে একটু সময় দিতে হবে। আপনি আমার স্বামীকে এখানে আসার জন্যে খবর পাঠান।'

উইদার্স বয়সে তরুণ। নিজের অভ্যস্ত কাজকর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এমন একটা জরুরী পরিস্থিতিতে ঠিক কি করা উচিত, তা সে জানতো না। রবার্ট এসে না পৌঁছোনো পর্যন্ত লেসলি কিছুতেই মুখ খুলতে রাজী হয়নি। তারপর রবার্ট এবং উইদার্সকে কাহিনীটা বলেছে। এবং সেই থেকে বহুবার পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হলেও, তার বলা কাহিনীর মধ্যে এতোটুকুও তারতম্য হয়নি।

রবার্টের কাছে মিঃ জয়েস যে প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন, তা হলো গুলি করার ব্যাপারটা। একজন আইনজীবী হিসেবে তাঁর এই ভেবে অস্বস্তি হচ্ছিলো যে, একবার নয়—লেসলি গুলি চালিয়েছে ছ বার এবং মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, চারটে গুলিই শরীরের খুব কাছ থেকে ছোঁড়া হয়েছিলো। যে কেউই ভাবতে পারে, মানুষটা পড়ে যাবার পর লেসলি পাশে দাঁড়িয়ে তার ওপরে রিভলভারের গুলিগুলো খালি করে দিয়েছে। লেসলি স্বীকার করেছে, আগের ঘটনাগুলো নিখুঁতভাবে মনে থাকলেও এখানে এসে ওর স্মৃতি অক্ষম হয়ে পড়েছে। এই জায়গায় ওর মনটা একেবারে শূন্য। এর একমাত্র কারণ হিসেবে নির্দেশ করা যায়, অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ—যা লেসলির মতো একজন শান্ত সংযত মহিলার কাছ থেকে আদৌ আশা করা যায় না। মিঃ জয়েস ওকে বহু বছর ধরে চেনেন এবং চিরদিনই তার ধারণা, লেসলির মধ্যে আবেগের কোনো বালাই নেই। মর্মান্তিক ওই ব্যাপারটা ঘটে যাবার পরবর্তী সপ্তাহগুলোতেও ওর মানসিক স্থৈর্য ছিলো বিস্ময়কর।

দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললেন মিঃ জয়েস। তাঁর মনে হলো, 'আসল কথা হচ্ছে, অতি ভদ্র ও সম্মানিত মহিলাদের মধ্যেও যে কতোটা নৃশংস বর্বরতার সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকতে পারে. তা কেউই বলতে পারে না।'

দরজায় টোকা পড়লো।

'ভেতরে এসো।'

চীনে কেরানীটি ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। বন্ধ করলো আস্তেসুস্থে—যা ইচ্ছেকৃত এবং পরিকল্পিত—তারপর এগিয়ে গেলো মিঃ জয়েসের টেবিলের দিকে।

'কয়েক মিনিটের কিছু ব্যক্তিগত আলোচনার জন্যে আমি কি আপনার একটু অসুবিধে ঘটাতে পারি, স্যার?' জিগেস করলো সে।

লোকটার বিশদ ও নির্ভুল প্রকাশ ভঙ্গিমায় চির দিনই সামান্য কৌতুক অনুভব করেন মিঃ জয়েস। 'কোনো অসুবিধে নেই, চি সেঙ,' মৃদু হাসলেন উনি।

'যে ব্যাপারটা নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি স্যার, তা একটু স্পর্শকাতর এবং গোপনীয়।'

'বলে ফেলো।'

কেরানীপ্রবরের ধূর্ত চোখদুটিতে চোখ পড়লো মিঃ জয়েসের। যথারীতি স্থানীয় কেতা অনুযায়ী চরম সাজগোছ করে এসেছে ওং চি সেঙ। পায়ে খুব চকচকে পেটেণ্ট লেদারের জুতো এবং রঙচঙে সিল্কের মোজা। কালো টাই-তে মুক্তো ও চুনি বসানো টাইপিন। বাঁ হাতের অনামিকায় হীরের আংটি। নিষ্কলঙ্ক সাদা কোটের পকেট থেকে উঁকি মারছে সোনার কলম ও পেন্সিল। মণিবন্ধে সোনার ঘড়ি, নাকে প্রায় অদৃশ্য প্যাঁশনে।

'ব্যাপারটা ক্রসবি মামলার সঙ্গে জড়িত, স্যার,' লোকটা সামান্য কাশলো।

'কি রকম ?'

'একটা জিনিস আমার অবগতিতে এসেছে, স্যার। এবং আমার ধারণা, সেটা পুরো ব্যাপারটাতে একটা অন্য রঙ এনে দেবে।'

'কি জিনিস ?'

'আমি জানতে পেরেছি যে, এ ব্যাপারে এমন একটা চিঠির অস্তিত্ব রয়ে গেছে যেটা আসামী ওই মর্মান্তিক ঘটনায় নিহত হতভাগ্য মানুষটিকে লিখেছিলো।'

'এতে আমি একটুও অবাক হচ্ছি না। গত সাত বছরের মধ্যে মিসেস ক্রসবিকে যে নানান কারণে বহুবারই মিঃ হ্যামণ্ডকে চিঠি লিখতে হয়েছে, এ বিষয়ে আমার মনে কোনোই সন্দেহ নেই।'

নিজের কেরানীটির বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে মিঃ জয়েসের ধারণা খুবই উঁচুতে। তাই নিজের চিন্তাধারাকে লুকিয়ে রাখার জন্যেই তিনি এভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে কথাগুলো বললেন।

'সেটা খুবই স্বাভাবিক, স্যার। যেমন ধরুন একসঙ্গে রাতের খাবার খেতে বা টেনিস খেলতে আমন্ত্রণ জানিয়ে মিসেস ক্রসবি নিশ্চয়ই ওঁকে ঘনঘন চিঠি লিখেছেন। বিষয়টা যখন আমার নজরে আনা হয়, তখন প্রথমটাতে আমিও সে রকমই ভেবেছিলাম। তবে এ চিঠিটা অবিশ্যি লেখা হয়েছিলো মিঃ হ্যামণ্ডের মৃত্যুর দিনে।'

মিঃ জয়েস একবারও চোখের পলক ফেললেন না। সাধারণত তিনি যেভাবে কৌতুকের মৃদু হাসি মুখে নিয়ে ওং চি সেঙের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, তেমনি ভঙ্গিতেই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে।

'এ কথাটা তোমাকে কে বলেছে ?'

'আমার এক বন্ধু বিষয়টা আমার অবগতিতে এনেছে, স্যার।'

মিঃ জয়েস জানেন, পীড়াপীড়ি করে কোনো লাভ হবে না।

'আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে স্যার, মিসেস ক্রসবি ওঁর জবানবন্দিতে বলেছেন যে ওই মারাত্মক রাতটার আগে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই মৃত ব্যক্তির সঙ্গে ওঁর কোনো রকম যোগাযোগ ছিলো না।'

'চিঠিটা তোমার কাছে আছে ?'

'না, স্যার।'

'কি আছে চিঠিতে?'

'আমার বন্ধু চিঠিটার একটা নকল আমাকে দিয়েছে। আপনি কি সেটা পড়ে দেখতে চান, স্যার?'

'পড়া উচিত।'

ভেতরের পকেট থেকে একটা পেটমোটা ব্যাগ বের করলো ওং চি সেঙ। ব্যাগটা অজস্র খুচরো কাগজ, সিঙ্গাপুরী ডলারের নোট আর সিগারেটের কার্ডে বোঝাই। ওই জঞ্জালের ভেতর থেকে চট করে আধখানা পাতলা কাগজের টুকরো বের করে মিঃ জয়েসের টেবিলে রাখলো লোকটা। চিঠিটা এই রকম ঃ

"র—আজ রাতে থাকবে না। আমার সঙ্গে তোমাকে অবশ্যই দেখা করতে হবে। এগারোটার সময় তোমাকে আশা করবো। আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। তুমি যদি না আসো. তাহলে তার ফলাফলের জন্যে আমি কোনো জবাবদিহি দেবো না।—ল।"

বিদেশী স্কুলগুলোতে চীনেদের যেমনভাবে লিখতে শেখানো হয়, চিঠিটা তেমনি টানা হাতে লেখা। বৈশিষ্ট্যহীন ওই হাতের লেখাটার সঙ্গে অলক্ষুণে ওই কথাগুলো একেবারে বিশ্রী রকমের বেমানান।

'চিঠিটা মিসেস ক্রসবির লেখা বলে তুমি মনে করছো কেন?'

'আমার সংবাদদাতার সত্যবাদিতা সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে, স্যার।' ওং চি সেঙ বললো, 'তাছাড়া বিষয়টা সহজেই পরীক্ষা করে নেওয়া যায়। মিসেস ক্রসবিকে জিগেস করলে উনি নিশ্চয়ই তক্ষুনি আপনাকে বলে দিতে পারবেন যে উনি আদপেই এমন কোনো চিঠি লিখেছিলেন কি না।'

কথোপকথনের গোড়া থেকেই মিঃ জয়েস তাঁর কেরানীটির সম্ভ্রান্ত মুখের দিক থেকে দৃষ্টি সরাননি। এবারে তাঁর মনে হলো, সেখানে তিনি যেন একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপের অভিব্যক্তি দেখতে পেলেন।

'মিসেস ক্রসবি এ ধরনের একটা চিঠি লিখবেন বলে চিন্তাই করা যায় না,' মিঃ জয়েস বললেন।

'এটাই যদি আপনার অভিমত হয় স্যার, তাহলে ব্যাপারটা অবিশ্যি এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। আসলে আমার বন্ধু বিষয়টা নিয়ে আমার সঙ্গে শুধু এই কারণেই কথা বলেছে যে তার মনে হয়েছিলো, আমি যখন আপনার অফিসে রয়েছি তখন বিষয়টা নিয়ে সহকারী সরকারী কৌঁসুলির সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে আপনিই হয়তো চিঠিটার অস্তিত্বের খবর জানতে চাইবেন।'

'আসল চিঠিটা কার কাছে?' তীক্ষ্ন সুরে জানতে চাইলেন মিঃ জয়েস।

ওং চি সেঙকে দেখে বোঝা গেলো না, প্রশ্নটার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন সে লক্ষ্য করেছে কি না।

'আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে স্যার, মিঃ হ্যামণ্ডের মৃত্যুর পরে জানা গেছে যে একটি চীনে মহিলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিলো। চিঠিটা এখন সেই মহিলার কাছে রয়েছে।'

এই ব্যাপারটাই বিশেষ করে জনমতকে হ্যামণ্ডের ঘোরতর বিরোধী করে তোলে। জানা গিয়েছিলো, বেশ কয়েক মাস ধরেই নিজের বাড়িতে সে একটি চীনে মহিলাকে নিয়ে বাস করতো।

এক মুহূর্ত দুজনেই নিশ্চুপ। সত্যি কথা বলতে কি, ইতিমধ্যেই যা কিছু বলার তা বলা হয়ে গেছে এবং দুজনেই দুজনের বক্তব্য স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন।

'আমি বাধিত হলাম, চি সেঙ। ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখবো।'

'খুবই ভালো কথা, স্যার। তাহলে আমি কি এ বিষয়ে আমার বন্ধুটির সঙ্গে যোগাযোগ করবো?'

'তুমি তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেই চলবে,' গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন মিঃ জয়েস।

মিঃ জয়েসকে চিন্তাভাবনার কাছে রেখে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো কেরানীটি। যাবার সময় ফের সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিলো দরজাটা। লেসলির চিঠির অনুলিপিটার দিকে তাকালেন জয়েস। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নৈর্ব্যক্তিক হাতের লেখা। অস্পষ্ট কিছু সন্দেহ জয়েসকে অস্বস্তিতে ফেলছিলো। সন্দেহগুলো এতোই অসঙ্গত যে তিনি সেগুলোকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলেন। চিঠিটার ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোনো সহজ সরল যুক্তি আছে এবং লেসলি নিঃসন্দেহে এতোটুকুও সময় না নিয়ে জবাবটা দিতে পারবে। কিন্তু জবাবদিহিটা অবশ্যই জানা দরকার। কুর্সি থেকে উঠে চিঠিটা পকেটে নিয়ে, টুপিটা তুলে নিলেন জয়েস। তিনি যখন বেরিয়ে এলেন, ওং চি সেঙ তখন নিজের টেবিলে লেখার কাজে ব্যস্ত।

'আমি কয়েক মিনিটের জন্যে বেরুচ্ছি, চি সেঙ', মিঃ জয়েস বললেন।

'বারোটার সময় মিঃ জর্জ রিড আসবেন বলে আগে থেকে ঠিক করা আছে, স্যার। আপনি কোথায় গিয়েছেন বলবো?'

মুখে অতি সূক্ষ্ম একটি স্মিত হাসি ফুটিয়ে ওর দিকে তাকালেন মিঃ জয়েস, 'বলতে পারো, সে বিষয়ে তোমার আদৌ কোনো ধারণা নেই।'

কিন্তু তিনি ভালোভাবেই জানেন, তিনি যে কয়েদখানায় যাচ্ছেন, ওং চি সেঙ সে বিষয়ে সচেতন। যদিও ঘটনাটা ঘটেছে বেলান্দায় এবং তার বিচারও হবে বেলান্দা ভারুতে, তবু সেখানকার কয়েদখানায় সাদা চামড়ার মহিলাদের রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই বলে মিসেস ক্রসবিকে সিঙ্গাপুরেই নিয়ে আসা হয়েছে।

মিঃ জয়েস যে ঘরে অপেক্ষা করছিলেন, লেসলিকে সেখানে নিয়ে আসা হলো। তার দিকে নিজের রোগা পাতলা বৈশিষ্ট্যময় হাতখানি এগিয়ে দিয়ে

মিষ্টি করে হাসলো লেসলি। ওর পরনে যথারীতি পরিচ্ছন্ন সাদাসিধে পোশাক, হালকা রঙের অপর্যাপ্ত চুলগুলো সযত্নে গোছানো।

'আজ সকালে আপনি আসবেন, আশা করিনি,' শোভন ভঙ্গিতে বললো ও।

যেন ও নিজের বাড়িতেই রয়েছে এবং মিঃ জয়েসের মনে হলো, এক্ষুনি ও চাকরকে ডেকে তাঁর জন্যে একপাত্র জিন পাহিত আনতে বলবে।

'কেমন আছো?' জিগেস করলেন মিঃ জয়েস।

'শরীর-স্বাস্থ্য ভীষণ ভালো আছে, ধন্যবাদ!' ওর চোখদুটিতে কৌতুকের হাসি ঝিলিক দিয়ে ওঠে, 'বিশ্রাম নিয়ে শরীর সারাবার পক্ষে এটা একটা দারুণ জায়গা।'

যে পরিচারকটি লেসলিকে নিয়ে এসেছিলো, সে এবারে বিদায় নিলো। ঘরে এখন শুধু ওঁরা দুজনে।

'বসুন,' বললো লেসলি।

একটা কুর্সিতে বসলেন মিঃ জয়েস। বুঝতে পারছিলেন না, কিভাবে কথাটা তুলবেন। ও এতোই শীতল ও নিরাবেগ যে মিঃ জয়েসের মনে হলো, তিনি যা বলতে এসেছেন, তা বলা প্রায় অসম্ভব। সুন্দরী না হলেও ওর চেহারার মধ্যে এমন কিছু আছে, যার জন্যে ওকে ভালো লাগে। ওর মধ্যে একটা মার্জিত সুসংস্কৃতির দীপ্তি আছে, যেটা ওর সুশিক্ষার ফল—তার সঙ্গে সমাজের কৃত্রিমতার কোনো সংস্রব নেই। ওর দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায়, ওর পারিপার্শ্বিকতা কেমন ছিলো, ওর সঙ্গে যাদের মেলামেশা ছিলো তারাই বা কেমন মানুষ। কোনো স্থূল ব্যাগারের সঙ্গে ওকে আভাসেও জড়িত করা একেবারে অসম্ভব।

'আজ বিকেলে রবার্টের সঙ্গে দেখা হবে বলে আমি হাঁ করে অপেক্ষা করছি,' খোশ মেজাজে এবং সহজ সুরে বললো লেসলি। (ওর কণ্ঠস্বর এবং উচ্চারণ ভঙ্গিমা এতোই বৈশিষ্ট্যময় যে ওর কথা শুনতে ভারি ভালো লাগে।) 'বেচারা! ওর স্নায়ুর ওপরে একটা বিরাট পরীক্ষা চলছে। ভাগ্য ভালো, আর কদিনের মধ্যেই সবকিছু মিটে যাবে।'

'আর মাত্র পাঁচ দিন।'

'জানি। প্রতি দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি নিজেকে বলি, একটা দিন কমলো।' মৃদু হাসলো লেসলি, 'স্কুলে ছুটির দিনগুলো আসার আগে ঠিক যেমনটি করতাম।'

'ভালো কথা, ওই ঘটনাটার আগে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই হ্যামণ্ডের সঙ্গে তোমার কোনো যোগাযোগ ছিলো না—তাই তো?'

'এ বিষয়ে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ। শেষ বার আমাদের দেখা হয়েছিলো ম্যাকফারেনদের টেনিস পার্টিতে। তখন আমি বোধহয় ওর সঙ্গে দুটোর বেশি কথা বলিনি। ম্যাকফারেনদের দুটো কোর্ট আছে, জানেন তো

—আমরা আলাদা আলাদা কোর্টে ছিলাম।'

'এবং তুমি তাকে কোনো চিঠিও লেখোনি ?'

'না, না।'

'একদম ঠিক তো ?'

'একদম,' মৃদু হেসে জবাব দিলো ও। 'খেতে বলা অথবা টেনিস খেলার জন্যে ডাকা—এ ছাড়া ওকে আমার চিঠি লেখার তো অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে না! বেশ কয়েক মাস হলো তেমন কিছুও করিনি।'

'এক সময় তো তোমাদের মধ্যে বেশ ভালোই ঘনিষ্ঠতা ছিলো। তা পরে হঠাৎ এমন কি হলো যে তুমি ওকে ডেকে পাঠানো বন্ধ করে দিলে ?'

মিসেস ক্রসবি দুকাঁধে ঝাঁকুনি তুললো, 'কখনও কখনও কারুর ওপরে বিরক্তি এসে যায়। ও যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো, তখন অবিশ্যি রবার্ট আর আমি ওর জন্যে যতোদূর করা সম্ভব করেছিলাম। তারপর থেকে গত বছর দুই ওর শরীর বেশ ভালোই ছিলো। তাছাড়া সবাই ওকে খুব ভালোবাসতো। নানান জায়গা থেকে ওর ডাক আসতো। কাজেই ওর ওপরে আরও আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ বর্ষণ করার কোনো দরকার আছে বলে মনে হয়নি।'

'আর কোনোই কারণ ছিলো না ?'

'হ্যাঁ, মানে একটা কথা আপনাকে বোধহয় বলে ফেলাই ভালো,' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মিসেস ক্রসবি বললো, 'আমাদের কানে এসেছিলো, ও একটি চীনে মহিলাকে নিয়ে থাকে। তাই রবার্ট বলেছিলো, ওকে আর বাড়িতে আনবে না। ওই মহিলাকে আমি নিজেও দেখেছি।'

নিজের চিবুক করপুটে রেখে, একটা পিঠ-সোজা হাতলওয়ালা কুর্সি'তে বসে, এক দৃষ্টিতে লেসলির দিকে তাকিয়ে ছিলেন মিঃ জয়েস। কথাটা বলার সময় আচমকা, মুহূর্তের এক ভগ্নাংশের জন্যে, তিনি কি ওর কালো নয়ন-মণি দুটিকে অস্পষ্ট এক রক্তিম আলোয় ভরে যেতে দেখলেন ? না কি তা নেহাতই মনের ভুল ? কিন্তু এর ফলটা হলো চমকপ্রদ। কুর্সি'তে একটু নড়েচড়ে বসলেন মিঃ জয়েস। হাতের দশ আঙুলের প্রান্তগুলোকে একত্রে জড়ো করলেন। তারপর খুবই আস্তেসুস্থে শব্দ বেছে বেছে বললেন, 'আমার মনে হয় তোমাকে আমার বলা উচিত, জিওফ হ্যামণ্ডকে লেখা তোমার একখানা চিঠির অস্তিত্ব রয়ে গেছে।'

লেসলিকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য রাখছিলেন মিঃ জয়েস। ও একটুও নড়াচড়া করলো না বা ওর মুখের রঙও বদলালো না। তবে জবাব দেবার জন্যে ও লক্ষ্য করার মতো অতিরিক্ত সময় নিলো।

'অতীতে এটা সেটা জানতে চেয়ে, কিংবা ও সিঙ্গাপুরে যাচ্ছে জেনে সেখান থেকে আমার জন্যে কিছু আনতে বলে, আমি প্রায়ই ওকে ছোটোখাটো চিঠি পাঠাতাম।'

'এই চিঠিটাতে রবার্ট সিঙ্গাপুরে যাচ্ছে বলে ওকে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে।'

'অসম্ভব! আমি কক্ষনো অমন কিছু লিখিনি।'

'তুমি নিজেই বরং এটা পড়ে দ্যাখো,' পকেট থেকে চিঠিটা বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিলেন মিঃ জয়েস।

এক ঝলক তাকিয়েই, একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে, চিঠিটা ফিরিয়ে দিলো লেসলি, 'ওটা আমার হাতের লেখা নয়।'

'জানি। শুনেছি এটা আসল চিঠির একটা হুবহু নকল।'

এবারে লেখাগুলো পড়লো ও এবং পড়তে পড়তে একটা ভয়ঙ্কর পরিবর্তন এলো ওর মধ্যে। বিবর্ণ মুখখানা এমন ভয়াবহ হয়ে উঠলো যে তাকানো যায় না। একেবারে সবুজ হয়ে উঠলো মুখটা। আচমকা সমস্ত মাংস যেন খসে পড়লো, হাড়ের ওপরে টান টান হয়ে উঠলো মুখের চামড়া! ঠোঁট দুটো সরে গিয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়লো, যেন ভেংচি কাটছে মুখটা। কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকা চোখ নিয়ে মিঃ জয়েসের দিকে তাকালো ও।

'কি অর্থ এর?' ফিসফিসিয়ে জিগেস করলো মিসেস ক্রসবি। মুখটা এতো শুকনো যে একটা ফ্যাঁসফেঁসে আওয়াজ ছাড়া, ওর গলা দিয়ে আর কিছুই বেরুলো না। গলাটা আর মানুষের গলা নেই!

'সেটা তোমার বলার কথা,' জবাব দিলেন জয়েস।

'আমি লিখিনি। শপথ করে বলছি, আমি ওটা লিখিনি।'

'যা বলবে, সাবধানে বলো। আসল চিঠিটাতে যদি তোমার হাতের লেখা থাকে, তা হলে সেটা অস্বীকার করে কোনো লাভ হবে না।'

'লেখাটা জাল হতে পারে!'

'সেটা প্রমাণ করা কঠিন হবে। বরং আসল বলে প্রমাণ করাই সহজ।'

ওর ক্ষীণ শরীরের ভেতর দিয়ে একটা শিহরণ বয়ে যায়। কিন্তু কপালে বড়ো বড়ো ঘামের ফোঁটা জেগে থাকে। ব্যাগ থেকে একটা রুমাল বের করে হাতের পাতা দুটি মুছে নেয় ও। তারপর ফের একবার চিঠিটার দিকে তাকিয়ে, অপাঙ্গে তাকায় মিঃ জয়েসের দিকে।

'চিঠিটাতে কোনো তারিখ লেখা নেই। আমি যদি ওটা লিখেও পুরো-পুরি ভুলে গিয়ে থাকি, তাহলে ওটা হয়তো বেশ কয়েক বছর আগে লেখা। আপনি আমাকে সময় দিলে, আমি মনে করার চেষ্টা করতে পারি—ওটা কবে লেখা হয়েছিলো।'

'তারিখ নেই, তা আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু চিঠিটা বিপক্ষের উকিলদের হাতে পড়লে, তাঁরা চাকরগুলোকে জেরা করে সঙ্গে সঙ্গে বের করে ফেলবে, যেদিন হ্যামণ্ডের মৃত্যু হয় সেদিন তার কাছে কেউ কোনো চিঠি নিয়ে গিয়েছিলো কি না।'

নিজের হাত দুটিকে ভীষণ শক্ত করে চেপে ধরে, কুর্সিতে বসে টলতে

লাগলো মিসেস ক্রসবি—যেন এক্ষুনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

'আমি শপথ করে বলছি, ও চিঠি আমি লিখিনি।'

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইলেন মিঃ জয়েস। মিসেস ক্রসবির খেপাটে মুখের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মেঝের দিকে তাকালেন। উনি চিন্তা করছিলেন।

'তাহলে এই পরিস্থিতিতে আমাদের আর এ ব্যাপারে এগুবার কোনো প্রয়োজন নেই,' অবশেষে নীরবতা ভেঙে আস্তে আস্তে বললেন মিঃ জয়েস। 'তবে চিঠিটা যার হাতে রয়েছে, সে যদি সেটাকে সরকার পক্ষের উকিলের হাতে তুলে দেওয়াটাই সঙ্গত বলে মনে করে, তবে তুমি তার জন্যে প্রস্তুত থেকো।'

কথাগুলো শুনে মনে হবে, লেসলিকে ওঁর আর কিছুই বলার নেই। কিন্তু মিঃ জয়েস স্থানত্যাগের কোনো উদ্যোগও প্রকাশ করেননি। উনি অপেক্ষা করে রইলেন। নিজেরই মনে হচ্ছিলো, তিনি বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন। লেসলির দিকে তাকাননি, কিন্তু বুঝতে পারছিলেন ও খুবই নিস্পন্দ হয়ে বসে রয়েছে। লেসলির দিক থেকে কোনো সাড়া শব্দ নেই। শেষ পর্যন্ত মিঃ জয়েসই বললেন, 'আমাকে তোমার যদি আর কিছু বলার না থাকে, তাহলে আমি এবারে অফিসে ফিরবো।'

'চিঠিটা কেউ পড়লে, কি ভাবতে পারে ?' জিগেস করলো লেসলি।

'ভাববে, তুমি ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলেছো,' তীক্ষ্ন সুরে জবাব দিলেন মিঃ জয়েস।

'কখন ?'

'তুমি নিশ্চিত করে বলেছো, অন্তত তিন মাস যাবৎ হ্যামণ্ডের সঙ্গে তোমার কোনো রকম যোগাযোগ ছিলো না।'

'পুরো ব্যাপারটাই আমার পক্ষে একটা প্রচণ্ড আঘাত। সেই ভয়ঙ্কর রাতটার সমস্ত ঘটনাই যেন একটা দুঃস্বপ্ন। কাজেই তার ছোট্ট একটা অংশ যদি আমার স্মৃতি থেকে মুছে গিয়ে থাকে, তাহলে সেটা খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়!'

'হ্যামণ্ডের সঙ্গে তোমার সেই সাক্ষাতের প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনা তুমি সঠিকভাবে সকলকে বলেছো। অথচ মৃত্যুর রাতে তোমার ইচ্ছেতেই সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে বাংলোতে এসেছিলো, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুমি বেমালুম ভুলে গেলে—এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক হয়ে উঠবে।'

'ভুলিনি। যা ঘটে গেলো, তার পর ওটা বলতে ভয় পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আমার আমন্ত্রণেই হ্যামণ্ড তখন বাংলোয় এসেছিলো—এ কথা স্বীকার করে নিলে, আমার কোনো কথাই আপনারা বিশ্বাস করবেন না। হয়তো এটা বোকামো। কিন্তু আমার মাথার ঠিক ছিলো না। তাছাড়া হ্যামণ্ডের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ ছিলো না—এ কথা একবার বলার পরে, আমার পক্ষে অন্য কিছু বলা সম্ভবও ছিলো না।'

এতোক্ষণে লেসলি ওর প্রশংসনীয় আত্মসংযম ফিরে পেয়েছে। নিপাট সরলতা নিয়ে মিঃ জয়েসের তীক্ষ্ণ চোখ দুটোর দিকে তাকালো ও। ওর সুশীল নম্রতা মনকে সত্যিই বড়ো দুর্বল করে তোলে।

'সেক্ষেত্রে, রবার্ট রাতে না থাকা সত্ত্বেও কেন তুমি হ্যামণ্ডকে এসে দেখা করতে বলেছিলে—তার কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে।'

পূর্ণ দৃষ্টিতে মিঃ জয়েসের দিকে তাকালো লেসলি। ওর চোখ দুটিকে বৈশিষ্ট্যহীন ভেবে ভুল করেছিলেন মিঃ জয়েস। চোখ দুটি সুন্দর এবং মিঃ জয়েসের যদি ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে অশ্রুসজল হয়ে ওঠায় চোখ দুটি এখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কণ্ঠস্বরও ঈষৎ ভাঙা ভাঙা।

'রবার্টকে আমি একটা চমক দেবার ব্যবস্থা করছিলাম। পরের মাসেই ওর জন্মদিন। আমি জানতাম ওর একটা নতুন বন্দুকের খুব শখ। কিন্তু ওসব ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। তাই জিওফের সঙ্গে ওই নিয়ে একটু কথা বলতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আমার হয়ে ওকে সেটা আনার ফরমাশ করতে বলবো।'

'চিঠির ধরনটা তোমার বোধ হয় খুব স্পষ্টভাবে মনে নেই। আর একবার দেখবে?'

'না, দেখতে চাই না,' দ্রুত জবাব দিলো লেসলি।

'তোমার কি মনে হয়, একটা বন্দুক কেনার ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্যে স্বল্প পরিচিত কোনোও পুরুষকে একজন মহিলা এই ধরনের কোনো চিঠি লিখতে পারে?'

'সেক্ষেত্রে চিঠিটা একটু অসংযত আর আবেগময়। কিন্তু আমি ওই ভাবেই নিজেকে প্রকাশ করি। স্বীকার করছি, এটা ভীষণ বোকামো,' লেসলি মৃদু হাসলো। 'তাছাড়া জিওফ ঠিক স্বল্প পরিচিতও নয়। ওর অসুখের সময় আমি মায়ের মতো ওর শুশ্রূষা করেছি। রবার্টের অনুপস্থিতিতে আমি ওকে আসতে বলেছিলাম, কারণ ওকে বাড়িতে আনার ব্যাপারে রবার্টের আপত্তি ছিলো।'

একই ভঙ্গিতে এতোক্ষণ বসে থাকতে থাকতে মিঃ জয়েস ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলেন। এবারে উঠে, ঘরের মধ্যে দু-একবার পায়চারি করতে করতে নিজের বক্তব্যটা মনে মনে গুছিয়ে নিলেন। তারপর যে কুর্সিতে এতোক্ষণ বসেছিলেন, সেটার পিঠেই ভর রেখে সুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে ধীরেসুস্থে বললেন, 'মিসেস ক্রসবি, আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা তোমাকে বলতে চাই। এতোদিন পর্যন্ত মামলাটা মোটামুটি ভালোই এগুচ্ছিলো। শুধু একটা ব্যাপারই আমার কাছে একটু প্রাঞ্জল হওয়া দরকার বলে আমার মনে হয়েছিলো। আমি যতোদূর বুঝেছি, হ্যামণ্ড যখন মেঝেতে পড়ে রয়েছে তখনও তুমি অন্তত চারবার ওকে গুলি করেছিলে। তোমার মতো একজন কোমল, ভীরু, সংযত স্বভাব, শান্ত এবং সুরুচিসম্পন্ন মহিলা যে অমন একটা

সম্পূর্ণ অসংযত সাময়িক উত্তেজনার কাছে এভাবে আত্মসমর্পণ করবে, এটা কিন্তু মেনে নেওয়া কঠিন। তবু সেটা মেনে নেওয়া যায়। যদিও জিওফ্রে হ্যামণ্ডকে অনেকেই পছন্দ করে এবং তার সম্পর্কে অনেকেরই মোটামুটি উঁচু ধারণা, তবু আমি প্রমাণ করতে প্রস্তুত ছিলাম যে নিজের কাজের যৌক্তিকতা বোঝাতে গিয়ে তাকে তুমি যে অপরাধে অভিযুক্ত করেছো, সে তা করতে পারে। তার মৃত্যুর পরে যখন জানা গেলো যে সে একটি চীনে মহিলার সঙ্গে বসবাস করছিলো, তখন তার একটা সুনিশ্চিত পরিচয়ও আমরা পেয়ে গেলাম। তার সম্পর্কে কারুর মনে যদি এতোটুকুও সহানুভূতি থেকে থাকে, এটা জানার ফলে হ্যামণ্ড সেই সহানুভূতি থেকেও বঞ্চিত হলো। সমস্ত সম্ভ্রান্ত মানুষের মনে এর ফলে হ্যামণ্ড সম্পর্কে যে বিরক্তির সৃষ্টি হয়েছিলো, আমরা সেটাকে কাজে লাগাবো বলে মনস্থির করে নিলাম। আজ সকালেই আমি তোমার স্বামীকে বলেছি, তুমি যে বেকসুর খালাস পাবে এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত এবং শুধুমাত্র তাকে সাহস দেবার জন্যেই কথাটা আমি বলিনি। আমার বিশ্বাস, জুরিরা রায়দানে একমত হবার জন্যে আদালত-ঘর ছেড়ে অন্যত্র যেতেন না।'

দুজনের চোখের দিকে দুজনের চোখ। মিসেস ক্রসবি অদ্ভুত নিশ্চল। ঠিক যেন সাপ দেখে অসাড় হয়ে যাওয়া এক পাখি। মিঃ জয়েস সেই একই শান্ত সুরে বলে চললেন, 'কিন্তু এই চিঠি মামলাটার মধ্যে একটা সম্পূর্ণ নতুন রং এনে দিয়েছে। আমি তোমার আইন-উপদেষ্টা। আদালতে আমি তোমার হয়ে দাঁড়াবো। তোমার কাহিনী তুমি যেমনটি বলবে, আমি তা তেমনটিই হয়েছে বলে ধরে নেবো এবং সেই মতোই তোমার পক্ষ সমর্থনের জন্যে তথ্য সাজাবো। তোমার বক্তব্য আমি বিশ্বাসও করতে পারি, আবার তাতে আমার সন্দেহও থাকতে পারে। যে সমস্ত প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তার ওপরে ভিত্তি করে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না—এটা আদালতকে বোঝানোই উকিলের কর্তব্য। এর সঙ্গে মক্কেলের দোষ অথবা নির্দোষিতা সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত মতামতের কোনোই সম্পর্ক নেই।'

লেসলির চোখে মৃদু হাসির ঝিলিক দেখে বিস্মিত হলেন মিঃ জয়েস। তারপর খানিকটা শুকনো গলায় বললেন, 'তাহলে হ্যামণ্ড যে তোমারই জরুরী তলবে—বলা যেতে পারে, উন্মত্ত আহ্বানে—ওই রাত্রে তোমার বাড়িতে গিয়েছিলো, এ কথা তুমি অস্বীকার করতে যাচ্ছো না ?'

এক মুহূর্ত একটু ইতস্তত করে যেন কি চিন্তা করে নিলো মিসেস ক্রসবি।

'আমাদের একটা চাকর ওর বাংলোয় চিঠিটা নিয়ে গিয়েছিলো, এ কথা ওরা প্রমাণ করে দিতে পারবে। সাইকেলে গিয়েছিলো।'

'অন্য সবাই তোমার চাইতে বোকা হবে, এটা আশা কোরো না। চিঠিটা তাদের কাছে অনেক সন্দেহের পথ খুলে দেবে, যা এ যাবৎ কারুরই মাথায় আসেনি। ওটা দেখে ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের কি মনে হয়েছিলো,

তা আমি তোমাকে বলবো না। আর তোমার গলা বাচাবার জন্যে যতোটুকু দরকার, তোমার কাছ থেকে তার চাইতে বেশি কিছু শোনার ইচ্ছেও আমার নেই।'

একটা তীক্ষ্ন চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো মিসেস ক্রসবি। আতঙ্কে মুখখানা সাদা।

'আপনি কি মনে করছেন, ওরা আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে?'

'জুরিরা যদি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে তুমি আত্মরক্ষার খাতিরে হ্যামণ্ডকে হত্যা করোনি, তাহলে তোমাকে অপরাধী বলে রায় দেওয়াটাই তাদের কর্তব্য হবে। অভিযোগটা হত্যার। তখন বিচারকের কর্তব্য হবে, তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া।'

'কিন্তু কি প্রমাণ করতে পারে ওরা?' লেসলি রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলো।

'আমি জানি না, ওরা কি প্রমাণ করতে পারে। তুমি জানো। আমি জানতে চাইও না। কিন্তু ওদের মনে যদি কোনো সন্দেহ জাগে, যদি ওরা তদন্ত করতে শুরু করে, যদি স্থানীয় লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করে—তাহলে কি প্রকাশ হয়ে যেতে পারে বলো তো?'

সহসা যেন কুঁকড়ে গেলো লেসলি। মিঃ জয়েস ধরবার আগেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো ও। অজ্ঞান হয়ে গেলো। একটু জলের জন্যে ঘরের চতুর্দিকে তাকালেন মিঃ জয়েস, কিন্তু কোথাও জল নেই। এই মুহূর্তে কেউ ঘরে এসে ব্যাঘাত ঘটাক, তা-ও উনি চাইছিলেন না। লেসলিকে টানটান করে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে, ওর পাশে হাঁটু মুড়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন মিঃ জয়েস। কিন্তু লেসলি যখন চোখ মেলে তাকালো, ওর চোখে মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর আতঙ্ক দেখে তিনি অপ্রতিভ হয়ে গেলেন।

'আর একটু কাল চুপ করে শুয়ে থাকো,' মিঃ জয়েস বললেন, 'এক্ষুনি ভালো হয়ে উঠবে।'

লেসলি কাঁদতে শুরু করলো। পাগলের মতো কান্না।

'দোহাই তোমার,' মৃদু কন্ঠস্বরে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন মিঃ জয়েস, 'নিজেকে সামলে নাও।'

'এক মিনিট সময় দিন আমাকে।'

ওর সাহস সত্যিই চমকপ্রদ। আত্মনিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার জন্যে ওর প্রচেষ্টা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলেন মিঃ জয়েস। খুব শীগগির ফের নিজের প্রশান্তি ফিরে পেলো ও।

'এবারে আমি উঠবো।'

হাত বাড়িয়ে ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন মিঃ জয়েস। হাত ধরে ওকে কুর্সির দিকে নিয়ে গেলেন। অবসন্নের মতো কুর্সিতে বসে পড়লো ও।

'দু-এক মিনিট আমার সঙ্গে কথা বলবেন না।'

'বেশ।'

অবশেষে লেসলি যা বললো, মিঃ জয়েস তা শুনবেন বলে আদৌ আশা করেননি। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বললো, 'আমি বোধ হয় সবকিছু ভীষণ বিশ্রীভাবে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি।'

মিঃ জয়েস কোনো জবাব দিলেন না। ফের কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর লেসলি জিগেস করলো, 'আচ্ছা, চিঠিটা কি কোনোমতে হাত করা যায় না?'

'যার কাছে চিঠিটা রয়েছে সে ওটা বিক্রি করতে রাজি না থাকলে, আমি ওটার সম্পর্কে কিছু জানতে পারতাম বলে মনে হয় না।'

'ওটা কার কাছে রয়েছে?'

'হ্যামণ্ডের বাড়িতে যে চীনে মহিলাটি থাকতো, তার কাছে।'

মুহূর্তের জন্য লেসলির গাল দুটিতে রক্তিম আভা ফুটে ওঠে, 'সে কি চিঠিটার জন্যে সাংঘাতিক কোনো দাম চাইছে?'

'আমার মনে হয় চিঠিটার দাম সম্পর্কে মহিলার মনে একটা যথার্থ ধারণা আছে। তাই আমার সন্দেহ, খুব বড়োসড়ো একটা অংক ছাড়া সেটা হস্তগত করা সম্ভব হবে না।'

'আপনি আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে দেবেন?'

'তুমি কি মনে করো, একটা অবাঞ্ছিত প্রামাণিক নজিরকে হাত করা খুবই সহজ? একটা সাক্ষীকে ভাঙিয়ে নেওয়ার সঙ্গে এর কোনোই প্রভেদ নেই। আমাকে এ ধরনের ইঙ্গিত দেবার কোনো অধিকার তোমার নেই।'

'তাহলে আমার কি হবে?'

'বিচার নিজের পথে চলবে।'

ভীষণ পাণ্ডুর হয়ে ওঠে লেসলি। মৃদু এক শিহরণ ছুটে যায় ওর সমস্ত শরীর দিয়ে।

'আমি নিজেকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছি। ঠিকই বলেছেন—যা অনুচিত তা আপনাকে করতে বলার কোনো অধিকার আমার নেই।'

লেসলির ওই ঈষৎ ভেঙে আসা কণ্ঠস্বরের ব্যাপারটা মিঃ জয়েসের হিসেবে ছিলো না। আত্মনিয়ন্ত্রণ ওর স্বভাবগত, তাই ওর কণ্ঠস্বরের ওইটুকু বিকৃতিই মনকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে যায়। কাতর, বিনম্র দৃষ্টিতে মিঃ জয়েসের দিকে তাকালো ও। মিঃ জয়েসের মনে হলো, ওর আবেদন অগ্রাহ্য করলে সারাটা জীবন ওর ওই দৃষ্টি তাঁকে তাড়া করে বেড়াবে। আর যাই হোক, বেচারা হ্যামণ্ড আর কোনোমতেই প্রাণ ফিরে পাবে না। মিঃ জয়েস ভাবতে লাগলেন, চিঠিটার আসল তাৎপর্য কি হতে পারে। লেসলি বিনা প্ররোচনাতেই হ্যামণ্ডকে হত্যা করেছে, এমন একটা সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না। হ্যামণ্ড দীর্ঘদিন ধরে পূব গোলার্ধের দেশে বসবাস করেছে এবং তার পেশাগত সততা আর বিশ বছর আগেকার মতো ছিল না। মেঝের

দিকে তাকালেন মিঃ জয়েস। একটা কিছু করার জন্য তিনি মনস্থির করে নিলেন, অথচ তিনি জানেন কাজটা করা অন্যায় এবং এটাই তার গলার কাছে আটকে রইলো। লেসলির প্রতি যেন খানিকটা বিরক্তি বোধ করলেন তিনি এবং কথা বলতে গিয়ে সামান্য কুণ্ঠা অনুভব করলেন।

'তোমার স্বামীর আর্থিক অবস্থা কেমন, তা আমি সঠিক জানি না।'

গোলাপের মতো লাল হয়ে উঠে চকিতে মিঃ জয়েসের দিকে এক ঝলক তাকালো লেসলি।

'টিন কোম্পানিতে ওর বেশ কিছু শেয়ার আছে। আর দু-তিনটে রবার বাগিচার শেয়ারও আছে সামান্য কিছু। আমার মনে হয় টাকাটা ও যোগাড় করতে পারবে।'

'টাকাটা কি জন্যে লাগবে তা ওকে বলতে হবে।'

একমুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে রইলো লেসলি। যেন চিন্তা করে নিলো কিছু।

'ও এখনও আমাকে ভালোবাসে। আমাকে বাঁচাবার জন্যে ও যে কোনো ত্যাগই স্বীকার করে নেবে। কিন্তু চিঠিটা ওকে দেখাবার কোনো প্রয়োজন আছে কি?'

মিঃ জয়েস ঈষৎ ভুরু কোঁচকালেন এবং দ্রুত তা লক্ষ্য করে লেসলি ফের বললো, 'রবার্ট আপনার একজন পুরনো বন্ধু। আমি নিজের জন্যে বলছি না। কিন্তু একটা সহজ সরল দয়ালু মানুষ, যে কোনোদিন আপনার কোনো ক্ষতি করেনি—তাকে একটা চরম যন্ত্রণা থেকে বাঁচাবার জন্যেই আপনাকে এ কথা বলছি।'

মিঃ জয়েস কোনো জবাব না দিয়ে মিসেস ক্রসবির দিকে এগিয়ে গেলেন। নিজের স্বভাবগত মাধুর্য নিয়ে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো মিসেস ক্রসবি। ঘটনাটা ওকে ভীষণ ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে, তবু আপ্রাণ চেষ্টা করছে সৌজন্য সহকারে মিঃ জয়েসকে বিদায় দিতে।

'আমার জন্যে আপনাকে অনেক ঝামেলা বইতে হচ্ছে। এজন্যে আমি যে কতোটা কৃতজ্ঞ তা বলে বোঝাতে পারবো না।'

অফিসে ফিরে নিজের ঘরে চুপ করে বসে রইলেন মিঃ জয়েস। কোনো কাজ করার চেষ্টা না করে চিন্তা করতে লাগলেন এক মনে। কল্পনায় নানান অদ্ভুত সম্ভাবনার কথা মনে হতে লাগলো তাঁর। সামান্য শিউরে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত দরজায় তাঁর প্রত্যাশিত সেই সন্তর্পণে টোকা দেবার শব্দটি শোনা গেলো। ওং চি সেঙ ঘরে এসে ঢুকলো।

'আমি এক্ষুনি টিফিন করার জন্যে বাইরে যাচ্ছিলাম, স্যার।' বললো সে।

'ঠিক আছে।'

'যাবার আগে ভাবলাম, আপনার যদি কোনো দরকার থাকে!'

'তেমন কিছু নেই বোধ হয়। মিঃ রিডকে দেখা করার জন্যে ফের কোনো সময় দিয়েছো নাকি?'

'হ্যাঁ স্যার, উনি তিনটের সময় আসবেন।'

'বেশ।'

ওং চি সেঙ মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো, দরজার হাতলে তার লম্বা লম্বা সরু আঙুলগুলোকে রাখলো, তারপর—যেন হঠাৎ কি মনে হওয়াতে—ফের ঘুরে দাঁড়ালো।

'তাহলে স্যার, আমি কি আমার ফ্লেন্ডকে কিছু বলবো ?'

যদিও ওং চি সেঙ দিব্যি চমৎকার ইংরেজি বলে, তবু এখনও 'র' অক্ষরটা উচ্চারণ করতে তার একটু অসুবিধে হয়। তাই বন্ধুর প্রতিশব্দ ফ্রেণ্ডকে সে ফ্লেণ্ড বললো।

'কোন বন্ধু ?'

'আমি মৃত হ্যামণ্ডকে লেখা মিসেস ক্রসবির সেই চিঠিটার কথা বলছিলাম, স্যার।'

'ওহো! সেটার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, মিসেস ক্রসবির কাছে আমি চিঠিটার কথা উল্লেখ করেছিলাম। উনি তেমন কিছু লেখার কথা অস্বীকার করলেন। বোঝাই যাচ্ছে ওটা জাল।'

মিঃ জয়েস পকেট থেকে চিঠির প্রতিলিপিটা বের করে ওং চি সেঙের হাতে তুলে দিলেন। ওঁর উপেক্ষার ভঙ্গিটা অগ্রাহ্য করলো ওং চি সেঙ।

'আমার মনে হয়, সেক্ষেত্রে আমার ফ্লেন্ড ওটাকে সহকারী সরকারী উকিলকে দিয়ে দিলে আপত্তি করার কোনো কারণ থাকবে না।'

'বিন্দুমাত্র না। তবে তাতে তোমার বন্ধুটির কি সুবিধে হবে, তা আমি বুঝতে পারছি না।'

'আমার বন্ধু মনে করে, সুবিচারের স্বার্থে এটা তার করা কর্তব্য।'

'কারুর কর্তব্যে বাধা দেবার মতো মানুষ আমি মোটেই নই, চি সেঙ।'

আইনবিদ এবং তাঁর চীনে কেরানীটির দৃষ্টি মিলিত হলো। কারুর ঠোঁটেই বিন্দুমাত্র হাসির আভাস নেই, কিন্তু দুজনই দুজনকে বুঝতে পেরেছেন স্পষ্ট।

'তা আমি বেশ বুঝতে পারি, স্যার। কিন্তু মামলাটার নথিপত্র পড়ে আমার মনে হচ্ছে, ওই ধরনের একটা চিঠি আদালতে পেশ করা হলে, তা আমাদের মক্কেলের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।'

'তোমার আইনজ্ঞান সম্পর্কে আমার ধারণা চিরদিনই খুব উঁচুতে, চি সেঙ।'

'স্যার, আমার মনে হচ্ছে, আমি যদি আমার বন্ধুটিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওই চীনে মহিলার কাছ থেকে চিঠিটা হাত করতে পারি, তাহলে আমাদের অনেক ঝামেলা বেঁচে যাবে।'

মিঃ জয়েস অলস ভঙ্গিতে চোষ কাগজের ওপরে মুখ আঁকতে লাগলেন।

'আমার ধারণা, তোমার বন্ধু ব্যবসাদার মানুষ। কি শর্তে সে ওই

চিঠিটা হাতছাড়া করতে রাজি হবে বলে তোমার মনে হয় ?'

'চিঠিটা তার কাছে নেই। ওই চীনে মহিলার কাছে আছে ! সে ওই মহিলার আত্মীয়। মহিলা নেহাতই বোকাসোকা মানুষ। আমার বন্ধুটি তাকে বলার আগে, সে ওই চিঠিটার দাম সম্পর্কে কিছুই জানতো না।'

'চিঠিটার দাম সে কতো ধরেছে ?'

'দশ হাজার ডলার, স্যার।'

'হে ভগবান ! মিসেস ক্রসবি কি করে দশ হাজার ডলার যোগাড় করবে ! আমি তোমাকে বলছি, ওটা একটা জাল চিঠি।'

কথা বলতে বলতে মুখ তুলে ওং চি সেঙের দিকে তাকালেন মিঃ জয়েস। তাঁর ওই আবেগময় বিস্ফোরণের পরেও মানুষটা সম্পূর্ণ অবিচলিত। ভদ্র, শান্ত ও সজাগ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে টেবিলের কাছে।

'মিঃ ক্রসবি বেতং রাবার এস্টেটের অষ্টমাংশ এবং সেলানতান রিভার রাবার এস্টেটের ষষ্ঠাংশ শেয়ারের মালিক। আমার এক বন্ধু ওই সম্পত্তি বাঁধা রেখে টাকাটা তাকে ধার দিতে পারবে।'

'তোমার পরিচিত ব্যক্তির বৃত্তটা তাহলে বেশ বড়ো !'

'হ্যাঁ স্যার।'

'বেশ। তা তুমি তাদের সবাইকে জাহান্নামে যেতে বলতে পারো। যে চিঠির কৈফিয়ৎ খুব সহজেই দেওয়া যায়, তার জন্যে আমি মিঃ ক্রসবিকে কিছুতেই পাঁচ হাজারের বেশি একটি পেনিও খরচ করার উপদেশ দেবো না।'

'চীনে মহিলাটি চিঠিটা বিক্রির করতে চায় না, স্যার। আমার বন্ধু অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে রাজি করিয়েছে। যে টাকাটার কথা আপনাকে বললাম, তার চাইতে কম দিতে চাইলে কোনো লাভ হবে না।'

অন্তত তিনটে মিনিট ওং চি সেঙের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিঃ জয়েস। এতোটুকুও বিব্রত না হয়ে তাঁর ওই সন্ধানী দৃষ্টি সহ্য করে রইলো কেরানীটি। ভাবভঙ্গিতে সম্ভ্রমের প্রকাশ, দৃষ্টি আনত। মিঃ জয়েস তাঁর কর্মচারীটিকে বিলক্ষণ চেনেন। ধরিবাজ লোক। এর থেকে লোকটা কতোটা দস্তুরি নেবে, কে জানে।

'দশ হাজার ডলারটা খুবই বিরাট অঙ্ক।'

'স্ত্রীকে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখার বদলে মিঃ ক্রসবি বরঞ্চ টাকাটা নিশ্চয়ই দেবেন।'

ফের নিশ্চুপ হলেন মিঃ জয়েস। চি সেঙ যতোটা বলেছে, তার চাইতে আর কতোটা বেশি সে জানে ? দরাদরি করতে ওর যখন স্পস্টই এমন অনীহা, তখন নিজের জায়গা সম্পর্কেও ও নিশ্চয়ই যথেণ্ট সচেতন। টাকার ওই অঙ্কটাই স্থির করা হয়েছে—কারণ এই ব্যাপারটার ব্যবস্থাপনায় যে-ই থাকুক না কেন সে জানে, খুব বেশি হলে ওই টাকাটাই রবার্ট ক্রসবি সংগ্রহ করতে পারবে।

'চীনে মহিলাটি এখন কোথায় আছে ?' জিগেস করলেন মিঃ জয়েস।

'আমার বন্ধুর বাড়িতে রয়েছে, স্যার।'

'সে কি এখানে আসবে ?'

'আমার মনে হয়, আপনিই ওর কাছে গেলে ভালো হয়, স্যার। আজ রাতে আমি আপনাকে ওই বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি। সেখানে ও আপনাকে চিঠিটা দিয়ে দেবে। খুবই মূর্খ মেয়েমানুষ স্যার, চেকটেক বোঝে না।'

'চেক দেবার কথা ভাবিনি। নগদ টাকাই নিয়ে আসবো।'

'দশ হাজার ডলারের কম আনলে শুধু শুধু মূল্যবান সময়ের অপব্যবহার করা হবে, স্যার।'

'পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি।'

'তাহলে স্যার, আমি টিফিন খেয়ে বন্ধুকে কথাটা বলতে যাবো।'

'বেশ। তুমি তাহলে বরঞ্চ রাত দশটার সময় ক্লাবের বাইরে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।'

'ঠিক আছে স্যার।'

সামান্য আনত ভঙ্গিতে মিঃ জয়েসকে অভিবাদন জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো ওং চি সেঙ। মিঃ জয়েসও দুপুরের খানা খেতে বেরিয়ে পড়লেন। ক্লাবে যেতেই, সেখানে প্রত্যাশিত ভাবে রবার্ট ক্রসবির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেলো। একটা ভিড়াক্রান্ত টেবিলের কাছে বসেছিলো রবার্ট। নিজের জন্যে জায়গা খুঁজতে খুঁজতে কাছ দিয়ে যাবার সময় মিঃ জয়েস তার কাঁধে একটু হাত ছোঁয়ালেন।

'তোমাকে আমি দু-একটা কথা বলতে চাই। এখান থেকে যাবার আগে শুনে যেও।'

'ঠিক আছে।' রবার্ট বললো, 'আপনার খাওয়া হয়ে গেলে, বলবেন।'

রবার্টকে কিভাবে বশে আনবেন, সে বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছিলেন মিঃ জয়েস। ক্লাব ঘরটা যাতে ফাঁকা হয়ে যায়, তাই খাওয়াদাওয়ার পরে তিনি এক বাজি ব্রিজ খেললেন। এই বিশেষ ব্যাপারটার জন্যে তিনি রবার্টের অফিসে গিয়ে দেখা করতে চাননি। কিছুক্ষণের মধ্যেই রবার্ট তাস-ঘরে এসে ঢুকলো এবং খেলাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলো। অন্য খেলোয়াড়রা বিভিন্ন কাজে বেরিয়ে যাবার পর, ঘরে শুধু তাঁরা দুজনে রইলেন।

'একটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার ঘটে গেছে হে!' যথাসম্ভব হালকা সুরে মিঃ জয়েস বললেন, 'দেখা যাচ্ছে, যেদিন রাতে হ্যামণ্ড খুন হয়, সেদিন তাকে বাংলোয় আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমার স্ত্রী তাকে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলো।'

'অসম্ভব!' চিৎকার করে উঠলো ক্রসবি। 'ও বরাবরই বলে এসেছে যে হ্যামণ্ডের সঙ্গে ওর কোনো রকম যোগাযোগ ছিলো না। আমি নিজেও জানি,

বেশ কয়েক মাস হলো হ্যামণ্ডকে ও চোখেও দেখেনি।'

'কিন্তু বাস্তব ঘটনা হলো, তেমন একটা চিঠির অস্তিত্ব কিন্তু রয়েছে। হ্যামণ্ড যে চীনে মহিলাটির সঙ্গে থাকতো, চিঠিটা রয়েছে তার কাছে। তোমার স্ত্রী জন্মদিনে তোমাকে একটা উপহার দেবে বলে হ্যামণ্ডের সাহায্য চেয়েছিলো। কিন্তু ওই মর্মান্তিক ঘটনাটার পরে, আবেগপ্রসূত উত্তেজনায়, চিঠির ব্যাপারটা ও পুরোপুরি ভুলে গিয়েছিলো। এবং হ্যামণ্ডের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ থাকার কথা একবার অস্বীকার করার পর, সেটাকে পরে ভুল বলে স্বীকার করতেও ও ভয় পেয়েছিলো। ব্যাপারটা অবিশ্যি খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তবে আমি মনে করি, এটা কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

ক্রসবি কিছু বললো না। তার বিশাল লাল মুখটাতে একেবারে বিমূঢ় হয়ে যাবার মতো অভিব্যক্তি। লোকটার উপলব্ধি কবার অক্ষমতায় একই সঙ্গে বিরক্তি এবং স্বস্তি অনুভব করলেন মিঃ জয়েস। লোকটা একেবারেই বোকা এবং বোকাদের জন্যে তাঁর একটুও ধৈর্য নেই। কিন্তু এই চরম বিপর্যয়ের পর থেকে লোকটার দুর্দশা তাঁর মনের একটা নরম জায়গা স্পর্শ করে গেছে। তাই মিসেস ক্রসবি যখন তাঁর সাহায্য চেয়েছিলো—নিজের জন্যে নয়, তার স্বামীর জন্যে—যখন সে একেবারে সঠিক স্বরতন্ত্রীতেই আঘাত করেছিলো।

'এই চিঠি সরকারী উকিলদের হাতে চলে গেলে পরিস্থিতি যে খুবই জটিল হয়ে উঠবে, এ তোমাকে বলার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তোমার স্ত্রী মিথ্যে কথা বলেছে এবং ওকে তার জবাবদিহি দিতে বলা হবে। হ্যামণ্ড যদি অনধিকার প্রবেশকারী বা অবাঞ্ছিত অতিথি না হয়ে, একজন আমন্ত্রিত হিসেবে তোমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকে—তাহলে ব্যাপারটা একটুখানি বদলে যায়। তাতে সহজেই জুরিদের মনে কিছু দ্বিধা জেগে উঠবে।'

মিঃ জয়েস ইতস্তত করছিলেন। এখন তিনি নিজের সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। রসিকতা করার সময় হলে এখন তিনি এই ভেবে হাসতেন যে, তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছেন—অথচ যার জন্যে তা নিতে চলেছেন, সেটা যে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে তার সামান্যতম ধারণাও নেই। বিষয়টা একটু চিন্তা করলে সে হয়তো মনে করতো, সব উকিলই কাজের খাতিরে স্বাভাবিকভাবে যা করে, মিঃ জয়েসও ঠিক তা-ই করছেন।

'দ্যাখো রবার্ট, তুমি শুধু আমার মক্কেল নও, বন্ধুও বটে। আমার মনে হয়, চিঠিটা আমাদের হাতে পাওয়া দরকার। তার জন্যে বেশ কিছু দাম দিতে হবে। তা না হলে, আমি এ ব্যাপারে তোমাকে কিছু না বলাটাই সঙ্গত বলে মনে করতাম।'

'কতো?'

'দশ হাজার ডলার।'

'সে তো অনেক টাকা! বাজারের মন্দা আর এটা সেটা মিলিয়ে আমার সবশুদ্ধু মোটামুটি ওই রকমই আছে।'

'এক্ষুনি নিয়ে আসতে পারবে?'

'হয়তো পারবো। টিন আর দুটো রাবার বাগানের যে শেয়ারগুলো আমার রয়েছে, তার বদলে বুড়ো চার্লি মেডোজ ওই টাকাটা আমাকে দেবে।'

'তাহলে তুমি কি টাকাটা আনবে?'

'সেটা আনা কি খুবই জরুরি?'

'যদি তুমি তোমার স্ত্রীর মুক্তি চাও।'

ক্রসবি প্রচণ্ড লাল হয়ে উঠলো। মুখটা ঝুলে পড়লো অদ্ভুতভাবে।

'কিন্তু · ' কথা খুঁজে পাচ্ছিলো না ক্রসবি। মুখটা এখন লালচে বেগনি হয়ে উঠেছে। 'কিন্তু আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। ও তো চিঠির ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়েও দিতে পারে! আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন না যে ওঁরা ওকে দোষী বলে সাব্যস্ত করবে। একটা ক্ষতিকর দুষ্ট কীটকে সরিয়ে ফেলার জন্যে ওকে ওঁরা ফাঁসি দিতে পারে না!'

'ফাঁসি নিশ্চয়ই দেবে না। হয়তো নরহত্যার জন্যে দোষী বলে সাব্যস্ত করবে। আর মিসেস ক্রসবিও হয়তো দু-তিন বছরের সাজা নিয়ে পাড় পেয়ে যাবে।'

এক লাফে উঠে দাঁড়ালো ক্রসবি, আতঙ্কে খেপাটে হয়ে উঠলো তার লাল মুখখানা।

'তিন বছর!

তারপর তার শ্লথ চৈতন্যে যেন আলোর স্পর্শ লাগলো। তার মন ছিলো অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আচমকা তাতে যেন এক টুকরো বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো। তারপর সবকিছু আবার প্রগাঢ় অন্ধকারে তলিয়ে গেলেও, যা সে ঠিক দেখেনি কিন্তু হয়তো বা অনুভব করেছে অস্পষ্ট ভাবে, তারই স্মৃতি রয়ে গেলো কিছুটা। মিঃ জয়েস লক্ষ্য করলেন, নানা ধরনের কাজে রুক্ষ আর শক্ত হয়ে ওঠা ক্রসবির বড়ো বড়ো লাল হাতগুলো থরথর করে কাঁপছে।

'ও আমাকে কি উপহার দিতে চেয়েছিলো?'

'বলেছে, তোমাকে একটা নতুন বন্দুক দিতে চেয়েছিলো।'

ফের একবার ক্রসবির বিশাল লাল মুখটা আরও বেশি লাল হয়ে উঠলো।

'টাকাটা আপনার কখন চাই?'

ক্রসবির কণ্ঠস্বর কেমন যেন অদ্ভুত শোনালো। মনে হলো যেন দুটো অদৃশ্য হাত মানুষটার গলা চেপে রেখেছে।

'আজ রাত দশটায়। তুমি বরং ছটা নাগাদ ওটা নিয়ে আমার অফিসে এসো।'

'ওই মহিলাটি কি আপনার কাছে আসছে ?'

'না, আমিই তার কাছে যাচ্ছি।'

'টাকা আমি আনবো। আপনার সঙ্গেও যাবো।'

মিঃ জয়েস তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে রবার্ট ক্রসবির দিকে তাকালেন।

'তুমি কি মনে করো, তার কোনো প্রয়োজন আছে ? আমার তো মনে হয়, ব্যাপারটা তুমি আমার ওপরে ছেড়ে দিলেই ভালো করবে।'

'টাকাটা আমার. তাই নয় কি ? কাজেই আমি যাবো।'

মিঃ জয়েস দু কাঁধে ঝাকুনি তুললেন। কুর্সি ছেড়ে উঠে, ওঁরা পরস্পরের হাতে হাত মেলালেন। মিঃ জয়েস উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন রবার্ট ক্রসবির দিকে।

রাত দশটার সময় শূন্য ক্লাবে ওঁরা ফের মিলিত হলেন।

'সব কিছু ঠিক আছে তো ?' জিগেস করলেন মিঃ জয়েস।

'হ্যাঁ। টাকাটা আমার পকেটেই রয়েছে।'

'তাহলে চলো, যাওয়া যাক।'

ওঁরা সিঁড়ি দিয়ে নামলেন। নিচের চত্বরে মিঃ জয়েসের গাড়িটা অপেক্ষা করছিলো। এতো রাতে চত্বরটা একেবারে নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে। ওঁরা গাড়ির কাছে যেতেই একটা বাড়ির ছায়ার ভেতর থেকে ওং চি সেঙ বেরিয়ে এলো। চালকের পাশে বসে, সে পথের নির্দেশ দিলো। ওতেল দি য়লেরোপ পেরিয়ে সেইলরস হোমের কাছে মোড় ঘুরে গাড়ি ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে গিয়ে ঢুকলো। এখানকার চীনে দোকানগুলো এখনও খোলা। অকেজো লোকেরা উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে ঘোরাঘুরি করে অলস সময় কাটাচ্ছে। রিকশা, মোটর-গাড়ি ও ঘোড়ার গাড়ির আনাগোনায় সমস্ত রাস্তা জুড়ে ব্যস্ততার দৃশ্য। হঠাৎ গাড়িটা থামলো। চি সেঙ পেছনে মুখ ঘুরিয়ে বললো, 'আমার মনে হয় স্যার, এখান থেকে আমাদের হেঁটে যাওয়াই ভালো।'

গাড়ি থেকে নেমে চি সেঙ এগুতে লাগলো, তার দু-এক পা পেছনে ওঁরা দুজন। তারপর চি সেঙ ওঁদের থামতে বললো, 'আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন, স্যার। আমি ভেতরে গিয়ে আমার ফ্রেণ্ডের সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।'

রাস্তার ওপরে একটা খোলা দোকানে গিয়ে ঢুকলো লোকটা। দোকানের কাউণ্টারের ওধারে তিন-চারজন চীনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা সেই ধরনের একটা অদ্ভুত দোকান, যেখানে কিছুই চোখের সামনে সাজানো থাকে না, বোঝাই যায় না ওরা কি বিক্কিরি করে। মোটা কাপড়ের স্যুট পরা, বুকে সোনার চেন ঝোলানো একটা শক্ত সমর্থ লোককে কি যেন বললো চি সেঙ। লোকটা বাইরের দিকে চকিতে এক ঝলক তাকিয়ে, চি সেঙকে একটা চাবি দিলো। চাবি নিয়ে বেরিয়ে এলো চি সেঙ। তারপর অপেক্ষারত ওঁদের দুজনকে ইঙ্গিতে ডেকে, দোকানের পাশের দিকের একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে

পড়লো। চি সেঙকে অনুসরণ করে ওঁরা দুজনে এক সারি সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে হাজির হলেন।

'আপনারা এক মিনিট একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটা দেশলাই জ্বালি।' উপায় উদ্ভাবনে সদা তৎপর চি সেঙ একটা জাপানী দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে বললো, 'ওপরে আসুন।'

দেশলাইয়ের আলোয় অন্ধকার প্রায় কিছুই কাটেনি। হাতড়ে হাতড়ে ওঁরা চি সেঙের পেছন পেছন এগুলেন। দোতলায় উঠে চি সেঙ একটা দরজার তালা খুললো, তারপর ভেতরে ঢুকে গ্যাসের বাতি জ্বাললো।

'ভেতরে আসুন,' বললো চি সেঙ।

ঘরটা চৌকো, একটা জানলা। একমাত্র আসবাব, মাদুর বেছানো নিচু দুটো চীনে তক্তোপোশ। এক কোণে বিশাল একটা দেরাজ, তাতে পুরনো যুগের বড়োসড়ো তালা। দেরাজের মাথায় একটা বিবর্ণ ট্রে, তাতে একটা আফিমের পাইপ আর একটা লম্ফ। ঘরের মধ্যে আফিমের মৃদু একটা কটু গন্ধ। ওঁরা বসতেই ওং চি সেঙ ওদের দিকে সিগারেট এগিয়ে দিলো। একটু পরে কাউণ্টারের সেই মোটা চীনেটা দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকলো। চোস্ত ইংরেজিতে ওঁদের শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে, লোকটা তার জাত ভাইয়ের পাশে গিয়ে বসলো।

'চীনে মহিলাটি এক্ষুনি আসবে,' চি সেঙ বললো।

দোকানের একটা বাচ্চা চাকর ট্রেতে করে চায়ের পট আর কাপ নিয়ে এলো। চীনেটি ওদের চা দিলো। ক্রসবি নিলো না। চীনে দুজন চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলো, কিন্তু ক্রসবি আর মিঃ জয়েস নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। অবশেষে দরজার বাইরে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। কে যেন নিচু গলায় কাকে ডাকছে। চীনেটি উঠে গিয়ে দরজা খুললো, দু-একটা কথা বললো, তারপর এক মহিলাকে ভেতরে নিয়ে এলো। মিঃ জয়েস মহিলার দিকে তাকালেন। হ্যামণ্ডের মৃত্যুর পর থেকে এর কথা তিনি অনেক শুনেছেন, কিন্তু কখনও দেখেননি। মহিলাটির শক্ত সমর্থ চেহারা। খুব একটা অল্প-বয়সী নয়। চওড়া নিরুৎসাহী মুখে পাউডার ও রুজের প্রলেপ। ভুরু বলতে সরু একটা কালো রেখা। কিন্তু দেখে মনে হয় ব্যক্তিত্বময়ী। পরনে হালকা নীল রঙের জ্যাকেট আর সাদা স্কার্ট। পোশাকটা পুরোপুরি ইউরোপীয় নয়, আবার ঠিক চৈনিকও নয়। অথচ পায়ে চীনে রেশমের ছোটো ছোটো চটি। গলায় সোনার মোটা হার, হাতে সোনার বালা, কানে সোনার দুল, কালো চুলে সোনার বাহারি কাঁটা। ধীর, আত্মসচেতন ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে তক্তোপোশে ওং চি সেঙের পাশে গিয়ে বসলো মহিলা। চি সেঙ যেন কি একটা বললো, ঘাড় নেড়ে কৌতূহলহীন চোখে শ্বেতাঙ্গ দুজনের দিকে তাকালো মহিলা।

'চিঠিটা কি ওঁর সঙ্গে আছে?' জিগেস করলেন মিঃ জয়েস।

'হ্যাঁ, স্যার।'

কিছু না বলে, পাঁচশো ডলারের একতাড়া নোট বের করলো ক্রসবি। তারপর কুড়িটা নোট গুনে গুনে বের করে চি সেঙের হাতে তুলে দিলো।

'গুনে দেখুন, ঠিক আছে কিনা।'

চি সেঙ নোটগুলো গুনে, মোটা চীনেটার দিকে এগিয়ে দিলো।

'একদম ঠিক আছে, স্যার।'

মোটা চীনেটা ফের গুনে, সেগুলোকে পকেটে গুঁজলো। তারপর মহিলাকে কিছু বললো। মহিলা বুকের ভেতর থেকে একটা চিঠি বের করে চি সেঙকে দিলো।

'এটাই আসল জিনিস, স্যার,' চিঠিটাতে চোখ বুলিয়ে বললো চি সেঙ। সে ওটা মিঃ জয়েসকে দিতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার আগেই ক্রসবি চিঠিটা নিয়ে নিলো।

'আমাকে এটা দেখতে দিন,' বললো ক্রসবি।

চিঠিটা পড়ার সময় ক্রসবিকে লক্ষ্য করতে লাগলেন মিঃ জয়েস। তারপর হাত বাড়িয়ে বললেন, 'ওটা তুমি বরং আমাকেই দাও।'

ধীরেসুস্থে চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে রাখলো ক্রসবি, 'না, এটা আমিই রাখছি। এটা আমাকে অনেক দাম দিয়ে কিনতে হয়েছে।'

মিঃ জয়েস আর কথা বাড়ালেন না। তিন চীনে এই ছোট্ট ঘটনাটা দেখলো। কিন্তু দেখে তারা কি ভাবলো, কিংবা আদৌ কিছু ভাবলো কিনা—তা তাদের ভাবলেশহীন মুখ দেখে বোঝা অসম্ভব। মিঃ জয়েস উঠে দাঁড়ালেন।

'আজ রাতে কি আমাকে আপনার আর দরকার হবে, স্যার?' জিগেস করলো চি সেঙ।

'না,' মিঃ জয়েস বললেন। তিনি জানেন, টাকার প্রতিশ্রুত অংশটা নেবার জন্যে চি সেঙ এখন এখানেই থেকে যেতে চায়। তাই ক্রসবির দিকে ফিরে জিগেস করলেন, 'কি, তুমি এখন যাবার জন্য তৈরি তো?'

ক্রসবি কোনো জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। চীনেটা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। সিঁড়িতে আলো দেখাবার জন্যে চি সেঙ কোত্থেকে যেন এক টুকরো মোমবাতি নিয়ে এসে, সেটাকে ধরিয়ে নিলো। মহিলা তখন তক্তোপোশে বসে ধূমপান করছে। চীনে দুজন ওঁদের নিয়ে নিচে নামলো এবং ওঁদের রাস্তা অব্দি পেঁছে দিয়ে, ফের ওপরে উঠে গেলো।

'চিঠিটা নিয়ে তুমি কি করবে?' জিগেস করলেন মিঃ জয়েস।

'রেখে দেবো।'

গাড়িটা যেখানে অপেক্ষা করছিলো, সেই অব্দি হেঁটে গেলেন ওঁরা। বন্ধুকে নিজের গাড়িতে করে পেঁছে দিতে চাইলেন মিঃ জয়েস।

'আমি হেঁটে যাবো,' ঘাড় নেড়ে বললো ক্রসবি। একটু ইতস্তত করলো মানুষটা, পায়ে পা ঘষলো, তারপর বললো, 'যে রাত্রে হ্যামণ্ড মারা যায়, সেই রাত্রে আমার সিঙ্গাপুরে যাবার একটা অন্যতম কারণ ছিলো, একটা নতুন

বন্দুক কেনা—আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক তাঁর বন্দুকটা বিক্রি করবেন বলে শুনেছিলাম। আচ্ছা, শুভরাত্রি।'

অন্ধকারের মধ্যে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলো মানুষটা।

বিচার সম্পর্কে মিঃ জয়েসের ধারণাই সম্পূর্ণ সঠিক ছিলো। মিসেস ক্রসবিকে মুক্তি দেবার ব্যাপারে একেবারে স্থির সংকল্প নিয়েই জুরিরা আদালতে গিয়েছিলেন। মিসেস ক্রসবি নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিলো। বিনা ভনিতায় সরলভাবে নিজের কাহিনী শোনালো। সরকারী কৌঁসুলি মানুষটি দয়ালু—নিজের এ কাজটা তার কাছে যে খুব একটা আনন্দের বিষয় নয়, তা সহজেই বোঝা যাচ্ছিলো। অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে উনি প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলো জিগেস করলেন। সরকারের তরফে তাঁর বক্তব্য,আসামী পক্ষের বক্তব্য হিসেবেও পেশ করা যেতে পারতো। একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে জুরিরা পাঁচ মিনিটেরও কম সময় নিলেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত শুনে পরিপূর্ণ আদালত কক্ষ আনন্দে ফেটে পড়লো। বিচারক মিসেস ক্রসবিকে অভিনন্দন জানালেন—সে এখন মুক্ত।

মিসেস জয়েসের মতো অমন তীব্র ভাষায় কেউই হ্যামণ্ডের আচরণ সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করেননি। সর্বদাই উনি বন্ধুবৎসল। এ মামলার ফলাফল সম্পর্কে অন্যদের মতো ওঁর মনেও কোনোরকম সন্দেহ ছিলো না। উনি বারবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন, এখান থেকে যাবার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ক্রসবিরা যেন ওঁদের বাড়িতেই থাকে। যেখানে অমন একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে, সেই বাংলোতেই বেচারী লেসলির ফিরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সাড়ে বারোটার মধ্যে বিচার শেষ হয়ে গিয়েছিলো। সকলে যখন জয়েসদের বাড়িতে পৌঁছলেন, তখন সেখানে তাঁদের জন্য এক বিশাল ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। ককটেল তৈরি। মিসেস জয়েসের তৈরি দুর্দান্ত ককটেল দিয়েই সাবা মালয়ে উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। উনি লেসলির স্বাস্থ্য পান করলেন। ভদ্রমহিলা বাকপটু, ভারি প্রাণবন্ত এবং এখন খুশিতে ভীষণ উচ্ছল। ভাগ্যিস, অন্যদের মুখে এখন কথাবার্তা নেই। কিন্তু তা নিয়ে মিসেস জয়েসের মনে কোনো ভাবনাও নেই। কারণ ওঁর স্বামী কোনোদিনই বেশি কথা বলেন না। বাকি দুজনের ওপর দিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে যে ধকল গেছে, তাতে ওরা স্বাভাবিক কারণেই খুব ক্লান্ত। খাওয়ার সময়টা মিসেস জয়েস একাই কথাবার্তায় টেবিল মাতিয়ে রাখলেন। তারপর কফি দেওয়া হলো।

'শোনো বাছারা', নিজস্ব খুশিয়াল ব্যস্ত ভঙ্গিমায় মিসেস জয়েস বললেন, 'এখন তোমরা একটু বিশ্রাম নেবে। চায়ের পর আমি তোমাদের দুজনকে গাড়িতে করে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে নিয়ে যাবো।'

নেহাত ব্যতিক্রম হিসেবেই মিঃ জয়েস আজ দুপুরে বাড়িতে খেতে এসে-ছিলেন, এখন তাঁকে আবার যথারীতি অফিসে ফেরত যেতে হবে।

'আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারবো না, মিসেস জয়েস।' ক্রসবি বললো, 'আমাকে এক্ষুনি বাগানে ফিরে যেতে হবে।'

'আজ তুমি মোটেই যাবে না!' মিসেস জয়েস চিৎকার করে উঠলেন।

'হ্যাঁ, এখুনি। অনেক দিন কাজে অবহেলা করেছি। এখন একটা জরুরি দরকারও আছে। তবে যদ্দিন আমরা কি করবো ঠিক না করছি, তদ্দিন লেসলিকে আপনি যদি নিজের কাছে রাখেন, তাহলে আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ হবো।'

মিসেস জয়েস যুক্তি দেখাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ওঁর স্বামী ওঁকে বাধা দিলেন।

'নেহাতই যদি যেতে হয়, তাহলে ও নিশ্চয়ই যাবে। ব্যস, এ বিষয়ে আর কোনো কথা থাকতে পারে না।'

মিঃ জয়েসের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিলো যাতে মিসেস জয়েস একবার চকিতে স্বামীর দিকে তাকালেন। নিজের মুখও বন্ধ করে রাখলেন। এক মুহূর্ত সকলেই নিশ্চুপ। তারপর ক্রসবি আবার বললো, 'আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আমি এক্ষুনি রওনা হবো—যাতে অন্ধকার হওয়ার আগেই পৌঁছুতে পারি।' টেবিলের কাছ থেকে উঠে দাঁড়ালো ক্রসবি, 'লেসলি, তুমি কি আমাকে একটু এগিয়ে দেবে?'

'নিশ্চয়ই!'

ওরা একসঙ্গে খাওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

'রবার্ট কিন্তু এটা অবিবেচকের মতো কাজ করলো।' মিসেস জয়েস বললেন, 'ওর বোঝা উচিত, লেসলি এই মুহূর্তে ওর সঙ্গেই থাকতে চাইবে।'

'আমি নিশ্চিত, নেহাত দরকার না থাকলে ও যেতো না।'

'যাকগে, আমি গিয়ে দেখি লেসলির ঘরটা ঠিকঠাক করা হলো কিনা। ওর আগে দরকার সম্পূর্ণ বিশ্রাম, তারপর আমোদ-ফুর্তি।'

মিসেস ক্রসবি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই জয়েস ফের বসে পড়লেন। একটু পরেই ক্রসবির মোটর-সাইকেলের এঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দ শোনা গেলো। তারপরেই বাগানের মোড়াম বেছানো রাস্তা ধরে চিৎকৃত আওয়াজ তুলে ছুটে গেলো গাড়িটা। কুর্সি থেকে উঠে বৈঠকখানা ঘরে গেলেন জয়েস। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিসেস ক্রসবি, দৃষ্টি শূন্যের দিকে, হাতে একটা খোলা চিঠি। চিঠিটা চিনতে পারলেন মিঃ জয়েস। তাঁর দিকে একবার তাকালো মিসেস ক্রসবি। মিঃ জয়েস দেখলেন, ওর মুখটা মৃতের মতো পাণ্ডুর।

'ও জানে', ফিসফিসিয়ে বললো মিসেস ক্রসবি।

মিঃ জয়েস এগিয়ে গিয়ে ওর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে নিলেন। তারপর দেশলাই জেবলে সেটাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। চিঠিটার পুড়ে যাওয়ার দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইলো লেসলি। যখন আর ধরে রাখা যাচ্ছে না, তখন

কাগজটাকে মেঝের টালিতে ফেলে দিলেন মিঃ জয়েস। দুজনে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, কাগজটা কুঁকড়ে কালো হয়ে যাচ্ছে। তারপর জয়েস সেটাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ছাই করে দিলেন।

'কি জানে ও?' জিগেস করলেন মিঃ জয়েস।

অনেকক্ষণ—বহুক্ষণ ধরে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো লেসলি। এক বিচিত্র দৃষ্টি ঘনিয়ে এলো ওর চোখ দুটিতে। দৃষ্টিটা অবজ্ঞার, না কি হতাশার? মিঃ জয়েস তা বুঝতে পারলেন না।

মিঃ জয়েস একটুও নড়াচড়া করেননি, একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি।

'বহুদিন ধরেই ও আমার প্রেমিক ছিলো। বলতে গেলে, ও যুদ্ধ থেকে ফেরার পর থেকেই। আমরা জানতাম, কতোটা সাবধানে আমাদের চলতে হবে। যখন আমরা প্রেমে পড়লাম তখন এমন একটা ভাব দেখাতাম, যেন ওর ওপরে আমার বিরক্তি এসে গেছে। রবার্ট থাকলে, ও আমাদের বাড়িতে খুব কমই আসতো। তখন সপ্তাহে দু-তিন দিন আমি গাড়ি চালিয়ে আমাদের পরিচিত একটা জায়গায় চলে যেতাম, সেখানে আমাদের দেখা হতো। রবার্ট সিঙ্গাপুরে গেলে, অনেক রাতে—চাকরগুলো শুতে যাবার পর—ও আমাদের বাংলোয় আসতো। আমরা অনবরত—সর্বদাই—পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতাম। কিন্তু কেউই এ ব্যাপারে এতোটুকুও সন্দেহ করতে পারেনি। তবে ইদানীং, বছর খানেক আগে, ও বদলে যেতে শুরু করে। আমি বুঝতে পারছিলাম না, কি এমন হলো। ও আমাকে আর ভালোবাসে না, এটা আমার বিশ্বাস হতো না। ও-ও সর্বদা তা অস্বীকার করতো। কিন্তু আমি প্রায় পাগল হয়ে গেলাম। ভীষণ ঝগড়াঝাঁটি কান্নাকাটি করতাম। মাঝে মাঝে মনে হতো, ও আমাকে ঘেন্না করে। ওঃ, তখন যে কি ভীষণ মানসিক যন্ত্রণা আমি সহ্য করেছি, তা যদি আপনি জানতেন! বুঝতাম, ও আর আমাকে চায় না—কিন্তু আমিও ওকে ছাড়বো না। কি কষ্ট, কি কষ্ট! আমি ওকে ভালোবাসি, ওকে আমার সর্বস্ব দিয়েছি, ও আমার প্রাণ! আর তখন কিনা শুনলাম, ও একটা চীনে মেয়েছেলের সঙ্গে থাকে! কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু শেষ অব্দি তাকে নিজেই দেখলাম—নিজের চোখে দেখলাম—গ্রামের মধ্যে হেঁটে যাচ্ছে। হাতে সোনার বালা, গলায় সোনার হার—একটা বুড়ি, মোটা চীনে মেয়েছেলে। আমার চাইতে বয়সে বড়ো। ওঃ, কি ভয়ঙ্কর! ক্যামপঙে সবাই জানে, ও হ্যামণ্ডের রক্ষিতা। আমি পাশ দিয়ে যাবার সময় ও আমার দিকে তাকালো। বুঝলাম, ও-ও জানে যে আমিও হ্যামণ্ডের রক্ষিতা। আমি হ্যামণ্ডকে ডেকে পাঠালাম। বললাম যে আমাকে ওর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। আপনি তো চিঠিটা পড়েছেন। পাগলের মতো চিঠিটা লিখেছিলাম। বুঝতে পারিনি, কি করছি। কোনো পরোয়া করিনি। দশ দিন ওকে দেখিনি। যেন এক জীবন। শেষবারে বিদায় নেবার সময় ও আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিলো—বলেছিলো,

কোনো দুশ্চিন্তা না করতে। আর আমার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে ও সোজা চলে গিয়েছিলো ওই মেয়েছেলেটার আলিঙ্গনে।'

এতোক্ষণ নিচু গলায়, কিন্তু খুবই উদ্দীপ্ত ভঙ্গিতে, কথা বলছিলো লেসলি। এবারে কথা থামিয়ে নিজের হাতদুটিকে মোচড়াতে থাকে।

'ওই হতচ্ছাড়া চিঠিটা! সর্বদা আমরা এতো সাবধানে থাকতাম! আমি ওকে কিছু লিখলে, ও পড়া হয়ে গেলেই সেটাকে ছিঁড়ে ফেলতো। ওই চিঠিটা যে ও রেখে দেবে, তা আমি কি করে জানবো? ও এলো। আমি ওকে বললাম, ওই চীনে মেয়েমানুষটার কথা আমি জানি। ও অস্বীকার করলো। বললো, ওটা স্রেফ একটা বাজে কেচ্ছা কাহিনী। আমি তখন আর আমাতে নেই। কি বলেছিলাম, জানি না। আমি তখন ওকে ঘৃণা করছি. ওর প্রতিটা অঙ্গ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছি। আঘাত করতে পারে, এমন সব কিছুই বলেছি। অপমান করেছি। বোধ হয় মুখে থুথুও দিতে পারতাম। কিন্তু শেষ অব্দি ও রুখে দাঁড়ালো। বললো, আমার ওপরে ওর প্রচণ্ড বিরক্তি এসে গেছে। ওই চীনে মহিলার ব্যাপারটাও সত্যি বলে স্বীকার করলো। বললো, বেশ কয়েক বছর ধরে—যুদ্ধের আগে থেকেই—সে ওকে চেনে এবং ও-ই একমাত্র মহিলা যাকে সে ভালোবাসে। অন্যেরা সবাই তার বিনোদনের সঙ্গী। বললো, ওই মহিলার ব্যাপারটা আমি জেনেছি বলে সে খুশিই হয়েছে, কারণ এবারে অন্তত আমি ওকে ছেড়ে দেবো। তারপর কি হয়েছিলো আমি জানি না, আমার মাথার ঠিক ছিলো না, আমি রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিলাম। রিভলভারটা তুলে নিয়ে আমি গুলি করলাম। ও চিৎকার করে উঠলো, দেখলাম গুলিটা ওর গায়ে লেগেছে। ও টলতে টলতে বারান্দার দিকে ছুটে গেলো। আমি ওর পেছন পেছন ছুটে গিয়ে ফের গুলি করলাম। ও পড়ে গেলো, আমি পাশে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা গুলি চালিয়ে গেলাম—যতোক্ষণ না রিভলভারে ক্লিক ক্লিক শব্দ হলো। শব্দটা শুনে বুঝলাম, গুলি ফুরিয়ে গেছে।'

অবশেষে হাঁফাতে হাঁফাতে থামলো লেসলি। ওর মুখটা এখন আর মানুষের মুখ নেই। নিষ্ঠুরতায়, রাগে আর যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখটা। এমন একটি শান্ত, সুরুচিসম্পন্ন মহিলা যে এ ধরনের দানবীয় রোষের বশবর্তী হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। মিঃ জয়েস এক পা পেছিয়ে গেলেন। লেসলিকে দেখে হতবিহ্বল হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর মনে হচ্ছিলো, ওটা লেসলির মুখ নয়—অর্থহীন অসংলগ্ন বাক্যবিস্তার করে চলা একটা বীভৎস মুখোশ। তারপরেই অন্য ঘর থেকে উঁচু গলায় বন্ধুত্বভরা উৎফুল্ল সুরে অন্য একটা কণ্ঠস্বরের ডাক শুনতে পেলেন ওঁরা। মিসেস জয়েস তখন চিৎকার করে বলছিলেন, 'লেসলি, এসো লক্ষ্মীটি! তোমার ঘর তৈরি হয়ে গেছে। তুমি তো এতোক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমে ঢুলছো!'

মিসেস ক্রসবির চোখমুখ ক্রমশ একটু একটু করে শান্ত হয়ে উঠলো। এক টুকরো দোমড়ানো কাগজকে যেভাবে হাত বুলিয়ে মসৃণ করা হয়, তেমনি করেই ওর মুখে ফুটে ওঠা তীব্র আবেগের সুস্পষ্ট রেখাগুলিও মুছে গেলো একটু একটু করে। মিনিট খানেকের মধ্যেই মুখখানা হয়ে উঠলো উত্তেজনা-হীন, প্রশান্ত ও রেখাহীন। হয়তো সে মুখ ঈষৎ পাণ্ডুর, কিন্তু ওর ঈষৎ উন্মুক্ত ঠোঁট দুটিতে এখন মনোরম এক অমায়িক হাসি। এখন ও ফের সেই সুমার্জিত—এমন কি বলা যেতে পারে—এক বিশিষ্ট মহিলা।

'আসছি, ভাই ডরোথি। সত্যি আমি দুঃখিত—তোমাদের যে কি ঝামেলায় ফেলেছি!'